"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

আদি-ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশ।

বন্ধুগণ! আমরা অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি। ব্রহ্মের উপাসনা আমাদের ব্রত। আমরা অদ্য এই সমাজ-মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনায় সম্মিলিত হইয়াছি। আজ আমার বিদায়ের দিন, এই অবসরে আপনাদিগকে দু চার কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, দুই দণ্ডকাল মন্ত্রোচ্চারণেই কি আমাদের উপাসনার সার্থকতা হয়? আমাদের লক্ষ্য কি? চরম উদ্দেশ্য কি একবার আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—ব্রহ্ম-প্রাপ্তি, ব্রহ্মকে লাভ করা। ইহা শুধু আমাদের নহে—সকল ধর্ম্মেরই সাধারণ উদ্দেশ্য। উপায় ভিন্ন হইতে পারে—লক্ষ্য আসলে এক। শত পথ আছে কিন্তু গম্যস্থান একই। ব্রহ্মকে পাওয়া যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তা'হলে তাহা সিদ্ধির নিমিত্তে প্রথম প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞান। যাঁকে পেতে চাই তাঁকে সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। সেই সত্যস্বরূপকে জ্ঞানদ্বারা জানিতে হইবে। এই ব্রহ্মজ্ঞান কিসে লাভ করা যায়, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় অনেকস্থলে সে জ্ঞানাগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত, তাহা উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত করাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন দুই সূত্রে এই ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করি।

এক বিশ্ব-প্রকৃতি, আর এক বিজ্ঞানাত্মা। বিজ্ঞান-বীক্ষণে আমরা জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা আশ্চর্য্য কৌশলের ভূরি ভূরি নিদর্শন দর্শন করি এবং তাহা হইতে সেই বিশ্বনিয়ন্তার জ্ঞান ও শক্তি উপলব্ধি করি। আমাদের জ্ঞান যত প্রস্ফুটিত হয় আমরা সেই পরিমাণে দেখিতে পাই যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক পরমাশ্চর্য্য যোগসূত্রে গ্রথিত, এক উপাদানে গঠিত, এক অখণ্ডনীয় নিয়মে নিয়মিত। দেখি যে এই অসীম বৈচিত্রের মূলে একতা বিরাজ করিতেছে। ক্রমে আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি যে যাঁহার জ্ঞান ও শক্তি সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে—

তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং।" মানব সমাজের শৈশবস্থায় মানুষ বহুরূপী প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া বহু দেবতার কল্পনা করিয়া পূজা করে। বৈদিক কালের আভাস আমরা বেদের মধ্যে যাহা কিছু দেখি তাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন ঋষিগণ সেই এক ঈশ্বরকে পৃথক পৃথক দেবতারূপে অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহাদের নবীন নেত্রে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু সকলি দেবতাত্মক জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইত। এই সকল ভৌতিক পদার্থে দৈবশক্তি আরোপ করা মনুষ্য সমাজের আদিমকালের লোকদের পক্ষে স্বাভাবিক। ক্রমে জ্ঞানোন্নতি সহকারে আমরা এই আপাতপ্রতীয়মান বৈষম্যের মধ্যে সাম্য—বৈচিত্রের মধ্যে একতা নিরীক্ষণ করি। বৈদিক ঋষিরাও যে সময়ে সময়ে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে একের ঐশীশক্তি অনুভব করিতেন তাহার নিদর্শন বৈদিক-সূক্তের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়; তাঁহারাই বলিয়া গিয়াছেন

একং সদ্বিপ্রাবহুধা বদন্তি
ইন্দ্রং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ

যিনি এক সৎস্বরূপ তাঁহাকে বিপ্রেরা ইন্দ্র যম বায়ু-প্রভৃতি বহুরূপ বর্ণনা করেন। এইরূপ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং, একমেবাদ্বিতীয়ং' পরব্রহ্মে গিয়া উপনীত হই।

দ্বিতীয়তঃ আত্মজ্ঞান।

বহির্জগতে যেরূপ, আধ্যাত্মিক জগতেও এই একতা আরো স্পষ্টরূপ উপলব্ধি করা যায়। আত্মা এক অখণ্ড। নানা চিন্তা, নানা ভাব, নানা প্রবৃত্তির মধ্যে আত্মা সেই একই। আমার আমিত্বসূত্রে আমার সমুদয় জীবন গ্রথিত। এই আত্মার জ্ঞান আছে, স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি আছে, ন্যায় অন্যায় বিবেকবুদ্ধি আছে,—ইহা হইতে আমরা চৈতন্যময়, প্রেমময়, ন্যায় ও করুণার আধার যিনি, এমন পুরুষের পরিচয় পাই। আত্মার কর্ত্তব্যবোধ আছে, সেই কর্ত্তব্যের আদেশ রাজাজ্ঞা হইতেও বলবত্তর। এই আদেশে প্রবৃত্তি সকলকে ঠিক পথে পরিচালন করিবার শক্তিও আমার আছে—তাহাই আমার কর্ত্তৃত্বশক্তি—এই কর্ত্তৃত্ব শক্তির প্রয়োগে আমি আপনাকে স্বাধীন পুরুষরূপে বুঝিতে পারি। কিন্তু আমার সে স্বাধীনতা পরিমিত, এক উচ্চতর শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও পদে পদে প্রতীয়মান হয়। এই নির্ভরের ভাব হইতে ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার নিকট-সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়। একদিকে যেমন বহিঃপ্রকৃতি হইতে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পাই, অন্যদিকে তেমনি অন্তর হইতে আত্মার আশ্রয়স্থান পরমাত্মাকে জানিতে পারি, এইরূপে দুইদিক দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান আত্মার আয়ত্তাধীন হয়।

জ্ঞানদ্বারা যাঁহাকে পাইলাম তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং, তাঁহার সহিত জীবাত্মার অতিনিকট সম্বন্ধ। যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। কিন্তু বাক্য মনের অগোচর সেই অনন্ত স্বরূপের উপাসনা কিরূপে সম্ভব? সেই অনন্ত স্বরূপকে সমীপস্থ—আত্মস্থ করিয়া না দেখিলে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা হয় না। যখন তাঁহাকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দেখি তখন তিনি দূরে। যখন তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখি তখনই বলিতে পারি

সনো বন্ধু র্জনিতা।

তিনি আমার পিতা, আমার সখা। উপাসনার আগে তাঁহাকে আপনার করিয়া দেখা চাই, নহিলে উপাসনা হয় না।

ব্রহ্মের উপাসনা কি প্রকার তাহা

ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে সংক্ষেপে অতি সুন্দর রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"—

তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁর উপাসনা।

তাঁহাকে যখন পিতা ও সখা বলিয়া জানি, যখন দেখিতে পাই আমরা আজীবন তাঁহার করুণায় লালিত পালিত হইতেছি, তখন প্রীতি সহজেই তাঁহার প্রতি ধাবিত হয় এবং সেই প্রীতি সংসারে প্রবাহিত হইয়া সকল স্থানকে মধুময় করে। এই প্রীতি তখন মৈত্রীরূপ ধারণ করে। এখানে আমি একাকী নহি—একাকী একপদ চলিতে অক্ষম। আমার পরিবারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, আমার অকাট্য বন্ধন। শুধু তাহা নহে, সমুদয় জগতের সঙ্গে আমার যোগ। সকল জগতবাসী আমার ভ্রাতা। বসুধৈব কুটুম্বকং এ বাক্য শুধু কবির কল্পনা নহে। আমরা মৈত্রী-বন্ধনে স্বদেশ বিদেশকে যুক্ত করিয়া লই। এই মৈত্রীর নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্র, আর্য্য ম্লেচ্ছ জাতি বিচার নাই; অহঙ্কার আত্মাভিমান ঘৃণা বিদ্বেষ অপসারিত হয়; সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বিশ্বব্যাপী ঔদার্য্যে বিলীন হয়।

ঈশ্বরের পিতৃভাবের প্রতি লক্ষ্য কর, মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঈশ্বর আমার পিতা, মনুষ্য মাত্রেই আমার ভ্রাতা, কি সহজ, কি উদার ভাব! হায়! কতদিনে এই স্বাভাবিক সৌভ্রাত্র উদিত হইয়া জগৎকে অনুরঞ্জিত ও পবিত্র করিবে। যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইবে, শান্তি ও সদ্ভাবে সকল জনস্থান প্লাবিত হইবে। এই উদার মহান্ ভাব আমরা সকল সময়ে মনে ধারণ করিতে পারি না—যদিও মুখে প্রচার করি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। তাই চারিদিকে এত অশান্তি—তাই আমাদের পারিবারিক, আমাদের সামাজিক অবস্থা এরূপ শোচনীয়। এই ভ্রাতৃভাবের অভাব আমাদের মধ্যে পদে পদে প্রতীয়মান হয়। আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর গাঁথিয়া পরস্পর পার্থক্য স্থাপন করি। তিল প্রমাণ সামান্য মতভেদকে তালপ্রমাণ করিয়া তুলি। আমরা দেশাচারের কঠোর শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আসল মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যাই। মৈত্রী বন্ধনের যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের চিরাভ্যস্ত আচার বিচার, সামাজিক রীতি নীতি আমাদিগকে আটে ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, চিরন্তন প্রথা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে এক পদ অগ্রসর হইতে পারি না। মনুষ্যের যে সমস্ত উচ্চ অধিকার, ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মনুষ্য মাত্রেরই যে দাবী আছে তাহা আমরা মনে স্থান দিই না। যে আলোকে এই অধিকার ফুটিয়া উঠে সে আলোক আমাদের নাই। সে আলোক প্রজ্বলিত হইলে আমাদের সমক্ষে কি অভাবনীয় নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হইয়া উঠে। আমরা এক পিতার পুত্র, এক মায়ের সন্তান, আমরা সকলেই অমৃতধনের অধিকারী এই বিশ্বাস যদি আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তবে কোন্ দানবশক্তি ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে? এ আদর্শ গ্রহণ করিলে সমুদয় জগৎ এক নবতর, কল্যাণতর মূর্ত্তি ধারণ করে। নূতন ধরায় নূতন ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যই আমরা এক পিতার পুত্র, এক ঈশ্বরের উপাসক, এই বিশ্বমন্দির আমাদের সাধারণ পূজার মন্দির; এই সত্য আমাদের মুমূর্ষু

জাতিকে নবজীবন দান করিবে। যে পর্য্যন্ত এই মহান্ ভাবকে আমরা জীবনের কাণ্ডারী করিতে না পারি সে পর্য্যন্ত আমরা দীন হীন মুহ্যমান হইয়া থাকিব। যেমনই রাজ-নিয়ম, যেমনই সামাজিক নিয়ম বন্ধন কর, সকলি নিষ্ফল, সকলি ব্যর্থ। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিচ্ছেদ, আপনার মধ্যে মান অভিমান দম্ভ অহংঙ্কার এই সকল হীনতার মধ্যে থাকিয়া আমরা অধঃপাতে যাইব। কিন্তু দেখ ভ্রাতৃগণ! আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। ঐ দেখ সুদিন আসিতেছে। উন্নত পবিত্র ধর্ম্মের প্রভাবে দেশ উন্নত ও পবিত্র হইবে। ব্রহ্মই আমাদের ঐক্য স্থল। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের উপাসক হইয়া আমরা সকলে এক হইব। আমরা সকল ভ্রাতা মিলিয়া মাতৃসেবায় নিযুক্ত থাকিব। এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া হে ব্রাহ্মগণ! আমি তোমাদের ডাকিতেছি। উঠ! জাগো! এসো আমরা একত্র হই, মিলিত হই। ব্রহ্মের বিজয় নিশান হস্তে করিয়া দেশে দেশে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করি। ব্রাহ্মগণ, তোমাদের জীবন সত্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হউক, সেই দীপ নির্ব্বান হইতে দিও না। সেই স্বর্গীয় দীপালোক জ্বলিতে থাকিলে সকলি উজ্বল সকলি পবিত্র হইবে। ব্রাহ্মগণ! এসো আমরা মিলিত হই—একত্র হই। সেই একমন্ত্রে শিক্ষিত, সেই একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অসত্য অনাচার উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াই। আমরা সমুদয় দেশকে এক করিতে চাই আর আমাদের এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর ভিতরে বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ দলাদলি? এই সকল ক্ষুদ্রভাব ভুলিয়া গিয়া পিতার আহ্বান শ্রবণ কর, তাঁর চরণে আসিয়া মিলিত হও—

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি রেখনারে ব্যবধান।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবেনা,
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবেনা।
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া
প্রেমের অমৃতবারি
পিতার অসীম ধন রতনের
সকলেই অধিকারী।

ঈশ্বর প্রীতি হইতে মৈত্রী প্রসূত; মৈত্রী হইতে সেবাধর্ম্মের উৎপত্তি। প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ফল, সেবা। আমি যাহাকে ভাল বাসি তাহার সেবা শুশ্রূষা ও আমার ভাল লাগে। যিনি ঈশ্বরকে ভাল বাসেন, তিনি ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া মানুষকেও অবশ্য ভাল বাসেন এবং মানুষকে ভাল বাসিলে অবশ্য তিনি লোক সেবায় অনুরক্ত হন। এই লোক-সেবাই দেব সেবা—ইহাই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। আমরা আপনার আপনার বলিয়া কার্য্য করিলে প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্য হয় না। ঈশ্বর উদ্দেশে তাঁহার কার্য্য বলিয়া যে কর্ম্ম করি তাহাই তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়।

আমরা কর্ম্ম বিনা ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারি না। যখন আমরা নিশ্চেষ্ট ও অচেতন হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত থাকি তখনো আমাদের প্রাণের ক্রিয়া অজ্ঞাতসারে চলিতে থাকে। দেখ ঈশ্বর স্বয়ং কেমন কর্ম্মশীল, তাঁহার কর্ম্মের বিরাম নাই। গীতায় একস্থানে ভগবান বলিতেছেন, আমি যদি মুহূর্ত্তেকের জন্য কর্ম্ম হইতে বিরত হই তাহা হইলে জগৎ সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া ছারখার হইয়া যায়। আমরা যখন গভীর নিশীথে, নিদ্রায় অভিভূত থাকি তখনো তিনি জাগ্রত থাকিয়া আমাদের অশেষ কাম্যবস্তু বিধান করেন। ঈশ্বরের অধীনে কর্ম্ম করিয়া তাঁহার সহযোগী হওয়া অপেক্ষা আমাদের গৌরব কি হইতে

পারে। আমরা যখন আপনাকে ভুলিয়া লোক হিতকর কার্য্যে রত থাকি—পতিতের উদ্ধার, দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, রোগীকে ঔষধ পথ্য প্রদান এই সমস্ত মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠান করি, তখন আমরা ঈশ্বরের সহকর্ম্মী। এই সকল কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য—ইহাই তাঁহার যথার্থ উপাসনা।

উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শ প্রদর্শিত হইল তাহা আমাদের প্রচলিত লৌকিক ধর্ম্মের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকগুলি বিধান নব-বিধান বলিয়া উল্লেখ করা অসঙ্গত নয়। ব্রাহ্ম সমাজের এক শাখার নামকরণ হইয়াছে—'নববিধান'। এই নববিধানের অর্থ কি ? কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন ইহার অর্থ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। কিন্তু ইহা ত পুরাণো কথা, ইহাতে নূতনত্ব কোথায় ? যাহা খাঁটি সত্য তাহা সকল ধর্ম্মেই পাওয়া যায়, প্রধান প্রধান ধর্ম্মতত্ত্বে সকল ধর্ম্মের ঐক্য আছে ইহা কে না স্বীকার করিবে ? দেখা যাক আমাদের ধর্ম্মের নব-বিধান কি। আমার মনে হয় এ ধর্ম্মের দুইটি বিধানকে নববিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম, আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের ব্যবস্থা নির্জ্জনে ধর্ম্ম-সাধন। আপন আপন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনই ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য। তাই আমাদের বর্ণাশ্রমের শেষ ভাগে বাণপ্রস্থ ও সন্যাসের ব্যবস্থা আছে। এবং আমরা কথায় বলি যে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।" কিন্তু সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা আমাদের একালের নিয়ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। 'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ' গৃহে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। পিতা মাতার সেবা, স্ত্রী পুত্র পালন—অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, বিপন্নকে আশ্রয়দান—এ সমস্ত আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। কেবল মাত্র আত্মোন্নতি নহে, কিন্তু যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি আপনার সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজকে উন্নত করা আমাদের লক্ষ্য। আমাদের সম্মুখে শাসন তন্ত্রের নূতন আদর্শ, সমাজ সংস্কারের নূতন নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। মনুষ্য সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষে উদর নির্ব্বাহের জন্য একাকী অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করে। ক্রমে আমাদের মমতা জনসমাজে বিস্তারিত হইয়া পড়ে—তখন প্রত্যেক মনুষ্য সমাজের অন্তরঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্মও এই সামাজিক ভাব ধারণ করে। ঈশ্বরের উপাসনা কেবল নির্জ্জনে নহে—কিন্তু ভায়ে ভায়ে মিলিয়া একস্বরে একমনে ঈশ্বরের পূজায় আমাদের আনন্দ।

দ্বিতীয়—অধিকার ভেদ।

আমাদের শাস্ত্রে অধিকার ভেদে ধর্ম্ম স্তরে স্তরে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মোপাসনায় জ্ঞানীদের অধিকার, অজ্ঞান সাধারণের জন্য পৌত্তলিক পূজা। যখন বৈদিককালের শেষভাগে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তখন তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ঋষিগণ সেই আড়ম্বর পূর্ণ জনসমাজ ছাড়িয়া অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মানুশীলন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সত্য লাভ করিয়া আপনারাই তৃপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে ব্রহ্মজ্ঞান এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরেই প্রচ্ছন্ন রহিল, সাধারণ জন সমাজে প্রচারিত হইল না। সাধারণ লোকেরা যে সেই রহিয়া গেল, যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপ পরিমিত দেবতার উপাসনা দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। আমরা বলি এ নিয়ম ঠিক নহে। যাহা সত্য তাহার প্রতি

উন্নত হইতে হইবে, সত্যকে নিম্নস্তরে আনিয়া আপনার সমকক্ষ করা ভুল। এই নিয়মে অসত্য সত্যের বেশ ধারণ করিয়া সমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়। আমরা বুদ্ধদেবের উদার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বহুকালব্যাপী গভীর অন্ধকারের মধ্যে সেই উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান সমগ্র লোকসমাজে প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছি।

অধিকার-ভেদ আবার কি? ব্রহ্মেতে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার—মনুষ্য মাত্রেই অমৃতের পুত্র, অমৃতধনের অধিকারী। যদি অজ্ঞান বশত আমার ভ্রাতা আপনার উচ্চ অধিকার বুঝিতে অপারক হয়, তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিব, কিন্তু তাহাকে হীনতর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার অধঃপাতের কারণ হওয়া কি অন্যায় নহে? ভ্রাতৃগণ এসো—আমরা যে ধন পাইয়াছি তাহা সকল ভ্রাতার মধ্যে বাঁটিয়া একত্রে সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে ঈশ্বরের উপাসনা কি, তাহা এক প্রকার সূচিত হইয়াছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্ম, ধর্ম্মের এই তিন অবয়ব। এই তিনের মিলনে ঈশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনা হয়। কিন্তু এই ত্রিবেণী সঙ্গম দুর্লভ। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম হইয়াছে তাহাতে ধর্ম্মের এক একটি ভাগের বিশেষ প্রাধান্য উপলক্ষিত হয়। কোন ধর্ম্ম জ্ঞান-প্রধান—যেমন উপনিষদ। উপনিষদের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং— ব্রহ্মজ্ঞানী পরব্রহ্মকে লাভ করেন—বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং, জ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়। কোন ধর্ম্ম ভাব-প্রধান, যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্ম; প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব যে ধর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক। কোনটি খৃষ্টধর্ম্ম সদৃশ কর্ম্ম-প্রধান ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের প্রভাবে কতশত মহাচেতা কর্ম্মবীর উদয় হইয়া লোকহিতব্রতে জীবন ক্ষেপন করিতেছেন। জ্ঞান, প্রেম কর্ম্ম এই তিন অবয়ব মিলিত হইলেই ধর্ম্ম সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হয়। যে ধর্ম্মে জ্ঞানের প্রাধান্য কিন্তু যেখানে ভক্তি নাই তাহা অসম্পূর্ণ। যে ধর্ম্মে ভক্তিই আছে অথচ জ্ঞান নাই তাহা আংশিক মাত্র। যে ধর্ম্ম প্রধানতঃ কর্ম্মাত্মক, যেখানে ভক্তির নদী প্রবাহিত হয় না, তাহা মরুভূমি তুল্য শুষ্ক। যে ধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম সমন্বিত তাহাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। সেই পুরুষই শ্রেষ্ঠ, যাহার আত্মা এই ত্রিরত্ন প্রভায় সমুজ্জ্বল এবং সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাহাতে এই ত্রিবিধ রত্নের কোনটিরই অভাব থাকে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মন্ত্র এই যে

বুদ্ধংশরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

আমরাও সেইরূপ ত্রিত্বের শরণ গ্রহণ করিব। সত্যের শরণ লইব—মঙ্গলের শরণ লইব এবং সত্য মঙ্গলের আয়তন ব্রহ্মের শরণ লইয়া আনন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যেরি জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য
খুঁজিব সত্যধন!
জয় জয় সত্যের জয়!

মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ
আজি করিব সকলে দান
জয় জয় মঙ্গলময়!

মোরা লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্যে
গাহিব পুণ্য গান।
জয় জয় মঙ্গলময়!

সেই অভয় ব্রহ্মনাম
আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়,

মোরা করিব না শোক যা হবার হোক্
চলিব ব্রহ্মধাম !
জয় জয় ব্রহ্মের জয় !

আমি কিছুদিনের জন্য আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমি যে এতদিন এই সমাজের বেদী অধিকার করিয়াছি সে কেবল আপনাদের ঔদার্য্য মনে করিয়া—আমার নিজের এমন কোন গুণ নাই যে গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারি। আমি বিষয়ী লোকের মধ্যে গণ্য, অধ্যাত্মিক সংগ্রামে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, এ কথা বলিতে পারি না। আমার কি সাধ্য যে আপনাদিগকে গুরুর ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারি? আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে যখন যাহা বলিয়াছি তাহার দ্বারা আপনাদের যদি কিছু উপকার হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনাকে ধন্য মনে করিব।

এক্ষণে আমার জীবনসন্ধ্যা সমাগত, রাত্রি আসিবার বড় বিলম্ব নাই। আমার শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইতে চাই। নির্জ্জনবাসে সংসার হইতে কিছুকালের জন্য দূরে থাকিতে চাই। আশা করি আপনারা আমাকে হৃদয়ের একপার্শ্বে স্থান দিবেন।

শকুন্তলায় একস্থানে কবি বলিতেছেন

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতারুণ পুরঃসর একতোঽর্কঃ
তেজোদ্বয়স্য যুগপৎ ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যতইবাত্মদশান্তরেষু

একদিকে চন্দ্র অস্তমিত হইতেছে, অন্যদিকে সূর্য্য উদিত হইতেছে, রবিশশির এইরূপ উদয়াস্তে যেন লোকের নিজ নিজ দশাচক্র নিয়মিত হইতেছে। আমরা এখন অস্তোন্মুখ, যাঁহারা নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমের সহিত জীবন প্রভাতে প্রবেশ করিতেছেন তাঁহারা আমাদের স্থান অধিকার করুণ। আমি নিরতিশয় আনন্দিত হই যদি কোন সাধু যুবা সমুদিত হইয়া বৃদ্ধের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এইরূপ কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলে আমি দূরে থাকিয়াও তৃপ্তি লাভ করিব।

পরিশেষে আমার আশীর্ব্বাদ এই যে ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুণ। তোমরা সত্য পরায়ন হও, সত্য অন্বেষণ কর, সত্যকে বরণ কর, সত্য হইতে কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবেক না। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না। কেবল মাত্র মন্ত্রপাঠে ধর্ম্ম সাধিত হয় না, ধর্ম্মকে জীবনে আনা চাই। ক্ষণিক ভাবের উচ্ছ্বাসে উপাসনার সার্থকতা হয় না, হৃদয়ে আসন পাতিয়া ঈশ্বরকে স্থায়ীভাবে তাহাতে রক্ষা করা চাই। তোমরা যে আলো নিজে পাইয়াছ তাহা দেশ বিদেশে বিকীর্ণ করিতে যত্নশীল হও। স্বদেশ বিদেশ, পূর্ব্ব পশ্চিম, যেখান হইতে সত্যরত্ন আহরণ কর, তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে। পৌত্তলিকতা উপধর্ম্ম হইতে দূরে থাকিবে, জাতি-বন্ধনের কঠোর শাসন অতিক্রম করিয়া সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে। অতীতের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে হইবে অথচ নব্য যুগের বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে তৎপর থাকিয়া উন্নতির স্রোতে প্রাণ মন ঢালিয়া দিবে। এইরূপে তোমরা জ্ঞান ধর্ম্মে আপনারা উন্নত হইয়া আপন ভ্রাতৃবর্গকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পার এই আমার আশীর্ব্বাদ।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ
সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই এক অবর্ণ বিশ্বব্যাপী পরম দেবতা যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজনানুসারে অশেষ প্রকার কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তিনি তোমাদিগকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুণ, এই আমার প্রার্থনা।

—

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,
মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি)

যদিও কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য পালন করা উচিত, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে—কর্ত্তব্যের সহিত হৃদয়ের ভাব যদি সংযোজিত না হইত, তাহা হইলে এই কর্ত্তব্যের নিয়মরূপ উচ্চ আদর্শটি দুর্ব্বল মানবের পক্ষে প্রায় দুরধিগম্য হইয়া পড়িত। আমাদের জ্ঞানের অনিশ্চিত আলোকের অভাব পূরণ করিবার জন্যই হউক, অথবা কোন অস্পষ্ট কিংবা কষ্টকর কর্ত্তব্যস্থলে আমাদের দুর্ব্বল সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করিবার জন্যই হউক,—হৃদয়ের ভাবরূপ ঈশ্বরের একটি মহৎ দান আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সমূহের প্রচণ্ড আবেগ প্রতিরোধ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির সাহায্য আবশ্যক। যেমন সত্যের দ্বারা মন আলোকিত হয়, তেমনি ভাবের দ্বারা আত্মা উত্তেজিত হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। বীরপ্রবর (Assas) স্বীয় সৈন্যকে বাঁচাইবার জন্য, আপনাকে যে বলিদান দিয়াছিলেন সে কেবল জ্বলন্ত হৃদয়ের আবেগে—প্রশান্ত জ্ঞানের প্ররোচনায় নহে। অতএব ভাবের আধিপত্যকে যেন আমরা দুর্ব্বল করিয়া না ফেলি ; হৃদয়ের উৎসাহকে যেন আমরা শ্রদ্ধা করি—সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করি। এই হৃদয়ের উৎস হইতেই মহৎ-কার্য্য-সকল, বীরোচিত কার্য্য-সকল সমুদ্ভূত হয়।

আমাদের নীতিতন্ত্র হইতে স্বার্থকে কি একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে?—না। মানব-আত্মার মধ্যে একটা সুখের বাসনা আছে—ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই বাসনাটি—একটা বাস্তব তথ্য; অতএব যে নীতিতন্ত্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে এই বাসনাটিরও একটা স্থান থাকা আবশ্যক। মানব-প্রকৃতির নানা লক্ষ্যের মধ্যে সুখও একটি ; তবে, ইহাই একমাত্র লক্ষ্য কিংবা মুখ্য লক্ষ্য নহে।

মানবের নৈতিক প্রকৃতির ব্যবস্থা অতি চমৎকার! মঙ্গলই তাহার চরম উদ্দেশ্য, ধর্ম্মই তাহার নিয়ম। অনেক সময় ইহার দরুণ মানুষকে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, কিন্তু এই কষ্টের দ্বারাই মনুষ্য জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। সত্য, এই ধর্ম্মের নিয়মটি বড়ই কঠোর এবং ইহা সুখ-স্পৃহার বিরোধী। কিন্তু ভয় নাই ঃ—যিনি আমাদের জীবনের বিধাতা, সেই মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর এই কঠোর কর্ত্তব্যের পাশাপাশি, হৃদয়ের ভাবরূপ একটি কমনীয় ও মধুর শক্তি আমাদের আত্মাতে নিহিত করিয়াছেন। তিনি সাধারণত ধর্ম্মের সহিত সুখকে সংযোজিত করিয়াছেন ; অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমস্থলও আছে—এবং সেই জন্য তিনি আর একটা জিনিস দিয়াছেন,—জীবনপথের শেষ প্রান্তে আশাকে স্থাপন করিয়াছেন!

আমাদের নীতিপদ্ধতিটি কি—এক্ষণে তাহা জানা গেল। প্রত্যেক তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করা, তথ্যসমূহের মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহা ব্যক্ত করা—ইহাই আমাদের একমাত্র চেষ্টা।

ইহা ব্যতীত, নীতিসম্বন্ধে আমরা কোন নূতন কথা বলি নাই। একটিমাত্র তথ্য স্বীকার করা এবং সেই তথ্যের নিকট অন্যান্য তথ্যকে বলিদান দেওয়া—ইহাই প্রচলিত পন্থা। যে সকল তথ্য আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি, আমাদের নৈতিক পদ্ধতির মধ্যে তাহার প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ কাজ প্রদর্শিত হইয়াছে। বড় বড়

দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই সত্যের একটা দিক্‌মাত্র দেখিয়াছেন।

আজিকার দিনে, কে আবার এপিকিউরসের মতে ফিরিয়া আসিতে পারে—যে এপিকিউরাস, সমস্ত প্রত্যক্ষ তথ্যের বিরুদ্ধে, সহজ জ্ঞানের বিরুদ্ধে, এমন কি সমস্ত নৈতিক ভাবের বিরুদ্ধে, একমাত্র সুখলিপ্সার উপরেই কর্ত্তব্যকে, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন? কেহ যদি ঐ মতে আবার ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার ঘোর অন্ধতা ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতারই পরিচয় দিবেন। পক্ষান্তরে মঙ্গলের (abstract idea) সার-ধারণার নিকট, সুখকে, সকল প্রকার পুরস্কারের আশাকে কি আমরা বলিদান দিব? ষ্টোয়িক সম্প্রদায় তাহাই করিয়াছিল। ক্যাণ্টের ন্যায় আমরা কি সমস্ত নীতিকে অবশ্যকর্ত্তব্যতার মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিব? তাহা হইলে নীতিতন্ত্রকে আরও সংকীর্ণ করিয়া ফেলা হইবে।

এক-ঝোঁকা সিদ্ধান্তের দিন চলিয়া গিয়াছে; আবার উহা আরম্ভ করিলে, দার্শনিক সংগ্রামকে চিরস্থায়ী করা হইবে। প্রত্যেক দর্শনই একটা-না-একটা বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রত্যেকেই সেই তথ্যটিকে কোন প্রকারে বজায় রাখিতে চেষ্টা করে; সুতরাং প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে একবার জয়ী ও আর একবার পরাজিত হয়; এইরূপে একই দর্শনতন্ত্র ফিরিয়া-ফিরিয়া জনসমাজে আবির্ভূত হয়। যতক্ষণ সমস্ত দর্শনতন্ত্রের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হইয়া আর একটা নূতন দর্শন প্রকাশিত হইবে, ততক্ষণ এই সংগ্রাম থামিবে না।

কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন,—এরূপ দর্শনতন্ত্রের কোন একটা চরিত্রগত বিশেষত্ব থাকিবে না। কিন্তু সত্য ছাড়া, দর্শনের নিকট হইতে আর কোন বিশেষত্ব দাবী করিলে, দর্শনকে লইয়া ছেলেখেলা করা হয় না কি? এই বলিয়া কি কেহ আক্ষেপ করেন যে, যেহেতু আধুনিক রসায়নের অনুশীলন কেবল তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং উহা একটি মাত্র মূল পদার্থে গিয়া পর্য্যবসিত হয় না, অতএব উহার কোন চরিত্রগত বিশেষত্ব নাই? মানব-প্রকৃতির সমস্ত অবয়বগুলি যথাপরিমাণে অঙ্কিত করিয়া মানব-প্রকৃতির একটি যথাযথ চিত্র প্রদর্শন করাই প্রকৃত দর্শনের কাজ। আমাদের দর্শনতন্ত্রের যে একতা—সে মানব-আত্মার একতা। মানব-আত্মা মাত্রই মঙ্গলকে উপলব্ধি করে; মঙ্গলকে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানে; মঙ্গলকে ভালবাসে; জানে—ভালমন্দ কাজ করিতে তাহার স্বাধীনতা আছে; জানে—তাহার কর্ম্ম অনুসারে সে দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, সুখ দুঃখ ভোগ করিবে। আমাদের দর্শনতন্ত্রে আর এক প্রকারের একতা আছে—অর্থাৎ সমস্ত তথ্যের মধ্যে একটা অখণ্ড ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—সকল তথ্যই পরস্পরকে ধারণ করে, পরস্পরকে পোষণ করে।

একটিমাত্র তত্ত্ব ছাড়া আর কোন তত্ত্বকে দর্শনের মধ্যে আসিতে দেওয়া হইবে না—ইহাকে যদি একতা বলে তবে এরূপ একতা স্থাপন করিবার কাহারও অধিকার নাই। কেবল বিশুদ্ধ গণিতরাজ্যেই এরূপ একতা সম্ভব। গণিতশাস্ত্র তথ্য লইয়া ব্যস্ত নহে; গণিত যে পদার্থের অনুশীলন করে, সরলীকরণের উদ্দেশে তাহাকে সংক্ষেপ করিবার জন্যই তাহার ক্রমাগত চেষ্টা;—এইরূপে উহা কতকগুলি সার-ধারণামাত্রে পরিণত হয়। তথ্যমূলক বিজ্ঞান কতকগুলি সমীকরণের (equation) সমস্যা মাত্র নহে। পদার্থ-

সমূহের মধ্যে যে প্রাণ, আছে এই বিজ্ঞান সেই প্রাণকে সন্ধান করে, এবং প্রাণের মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহারও অন্বেষণ করে।

অকল্মষ তপস্যা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি-গমন করে এবং যাঁহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে হইবে, কিন্তু কোন্ উপায় দ্বারা? সে উপায়ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন যে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা কর, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিই পরং শ্রেয় লাভ করেন। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইবে, কিন্তু তপস্যা কি? জ্ঞানযোগে লব্ধ সত্যের প্রতি চিত্তের ধারণা দৃঢ় করিবার জন্য, তাঁহার শিব সুন্দর স্বরূপে তন্ময় হইবার উদ্দেশে তাহার পুনঃ পুন অভ্যাসের নাম তপস্যা। কিন্তু সে তপস্যাও কি বিঘ্ন-সঙ্কুল নয়? সে পথও কণ্টাকাকীর্ণ অরণ্যবৎ। এই কণ্টকারণ্যকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে নির্দ্দেশ না করিলে তপস্যা সিদ্ধ হয় না। বিঘ্নসহ তপস্যাকে সকল্মষ ও বিঘ্নবিহীন তপস্যাকে অকল্মষ বলে। অকল্মষ তপস্যা শাস্ত্রে "কেবল" এই শব্দের বাচ্য। "কেবল" শব্দ বীজবাচী। যাহা সমুদয় জগতের বীজ তাহা "কেবল"। যেমন বট-কণিকা বট-মহা বৃক্ষের বীজ, তেমনি যে বীজ হইতে—যে মহাপ্রাণ হইতে এই বিশ্ব-প্রাণ সমুদ্ভূত হইয়াছে, যে মহাসত্য হইতে এইজগৎ-সত্যের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা "কেবল"। তাহা পাইতে হইলে তৎপ্রাপক অকল্মষ তপস্যাও কেবল, কিনা বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

কৈবল্য লাভের জন্য তপস্যাকে যেমন কেবল করিতে হয়, তপস্যার ভূমিকেও সেইরূপ তাহার অনুকূল করিতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার নির্দ্দেশ এইরূপ করিয়াছেন।

> সমে শুচৌ শর্করা বহ্নিবালুকা
> বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
> মনোঽনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে
> গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ।

কঙ্করশূন্য, তপ্তবালুকা বর্জ্জিত, সমান ও শুচিদেশে, উত্তম জল, উত্তম শব্দ, ও আশ্রয়াদির দ্বারা মনোরম স্থানে, প্রতি-বাদীর অনভিমুখে ও সুন্দর বায়ু সেবিত বিমল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক। এইরূপে স্থান নির্ব্বাচন করিলেই যে তপস্যা অকল্মষ হয়, তাহা নহে। এইবার বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর-জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। মনে কর তুমি পবিত্র স্থানে বসিয়া জ্ঞানযোগে ব্রহ্ম-ধ্যানে নিযুক্ত হইয়াছ, তাঁহাতে চিত্ত সমাধানের চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু বৃশ্চিক-দংশকের ন্যায় দ্বাদশটি শত্রু আসিয়া তোমার অন্তরে এমন দংশন করিতে লাগিল যে, তোমার চিত্ত তাহাতে বিক্ষিপ্ত না হইয়াই থাকিতে পারে না, তোমার মন মলিন না হইয়াই থাকিতে পারে না। কাহাদিগকে এই দ্বাদশ শত্রু বলিব, তাহারা কে? তপস্যার এই দ্বাদশটি আন্তরিক শত্রুর নাম—ক্রোধ, কাম, লোভ, মোহ, বিবিৎসা,

অকৃপা, অসূয়া, মান, শোক, স্পৃহা, ঈর্ষা এবং জুগুপ্সা। এই দ্বাদশটি দোষ থাকিতে চিত্ত নির্ম্মল হয় না, ইহারাই তপস্যার কল্মষ অর্থাৎ মল। এই জন্য ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যেমন ব্যাধেরা মৃগ পক্ষীদিগের ছিদ্রান্বেষণ করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদিগকে বিনষ্ট করে, তেমনি উক্ত দ্বাদশ দোষের প্রত্যেক দোষই মনুষ্যদিগের চিত্ত-মন্দিরে প্রবেশের জন্য অনুক্ষণ ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে এবং অবসর পাইয়া তাহাদিগের তপস্যা নষ্ট করিতেছে—ক্রোধাগ্নি যখন জ্বলিয়া উঠে তখন জীব দগ্ধ বিদগ্ধ হয়, কাম ব্যসনে নিমগ্ন করিয়া মানুষকে রসাতলে পাতিত করে, লোভ পরদ্রব্য হরণের ইচ্ছা ও উপযুক্ত পাত্রে স্বোপার্জ্জিত ধন দানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ধর্ম্মহীন করে, মোহ কর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া জড়বৎ উদ্যমহীন করে, বিবিৎসা নানা প্রকার ভোগরসে ভাসমান করাইয়া তাহাকে ব্যাধি জরাতে জর্জ্জরিত ও অশেষ দুঃখভাজন করে, অকৃপা সুন্দর কোমল হৃদয়কে লৌহবৎ কঠিন নিষ্ঠুর করে, অসূয়া তাহাকে পরগুণ দর্শনে অন্ধ করে, মান তাহাকে স্বীয় প্রতিষ্ঠা হইতে শূন্যে উঠাইয়া অধঃপাতিত করে, শোক ইষ্টবিচ্ছেদ ভয়ে ভীত ও বিহ্বল করে, স্পৃহা বিষয় ভোগেচ্ছায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে, ঈর্ষ্যা পরশ্রীতে কাতর করে এবং জুগুপ্সা পরগুণ আচ্ছাদনে প্রবৃত্ত হইয়া সূচীসূত্র যোগে মলিন ছিন্ন বস্ত্র সীবনে নিযুক্ত হয়। তাই হরিভক্তিপরায়ণ কবীর দাস বারানসীর গঙ্গাতীরে বসিয়া এই সকল হৃদ্‌মল পরিপূর্ণ গঙ্গাযাত্রীদিগকে গঙ্গাস্নান ও বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে পবিত্র ও আচারবান মনে করিতে দেখিয়া দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে "এতেনা ছুৎভইয়া তোহেরে সাথ কহেত্ কবীর কৈসে ভইলে আচার"।

কিন্তু আভ্যান্তরিক এই দ্বাদশ প্রকার কল্মষেই সব শেষ হইল না। তপস্যার প্রতিকূলে এখনো সাত প্রকার নৃশংসতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহারাও তপস্যার কম অন্তরায় নহে। বুদ্ধিকে বিষয় নিমগ্ন রাখা, বিষ যেমন অপকার করে—শরীরকে জ্বালাইয়া দেয়, সেইরূপ পরের অপকার করিয়া, পরকে জ্বালাইয়া, নিজেকে বড় মনে করা; দান করিয়া পরে তাহার জন্য অনুতাপ করা, অর্থলোভে মানাপমান জ্ঞান শূন্য হওয়া, ভ্রান্তিজাল ও মলিন সংস্কার সমূহে জ্ঞানদীপকে প্রচ্ছন্ন রাখা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া পরের দুঃখে সন্তুষ্ট হওয়া এবং পতিব্রতা ভার্য্যার প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়া, এই সাতপ্রকার নৃশংসতা তপস্যার অন্যবিধ কল্মষ।

আমাদের ভারতবর্ষের অরণ্যে, নদীতীরে, গ্রামান্তে এবং পর্ব্বত গাত্রে কল্মষ যুদ্ধের সহস্র সহস্র সেনানিবাস—দেবমন্দির সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—যুগ-যুগান্ত কালের স্মৃতি-চিহ্ন এখনো কত কত ভগ্ন মন্দির এবং তাম্র-ফলকে প্রকাশিত রহিয়াছে। কিন্তু এখন আর সে সকল স্থানে সে কল্মষ-যুদ্ধ হয় না—তপঃশ্রীসুন্দর তপস্বী আর সে সকল স্থানে পরিদৃষ্ট হন না, পরন্তু এখন সেই সকল পবিত্র স্থানে রিপুকুল সহায়, কামরত ধনঞ্জয় পুরুষেরা বিহার করে। পঞ্চবিংশ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের প্রসিদ্ধ মার যুদ্ধ আর কিছুই নহে, সে কেবল এই আন্তরিক কল্মষগণের সহিত তাঁহার প্রখর যুদ্ধ। তিনি অন্তরস্থ এই পাপ সকলকে সাধন-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বুদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁর শরীরের অস্থিখণ্ডের

পর্য্যন্ত এত আদর। যখন সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মহাপুরুষ বোধিবৃক্ষ মূলে তপস্যা-লব্ধ বোধি লাভার্থ আসনে উপবেশন করিয়া একান্ত মনে সাধন তৎপর ছিলেন, তখন পুত্র কন্যা পারিষদবর্গসহ মার আসিয়া তাঁহাকে আসনচ্যুত করিয়া প্রবৃত্তি-মার্গে লইয়া যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বুদ্ধদেব সেই পাপ-বুদ্ধিকে বলিলেন কি? বলিলেন যে,

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

এই আসনে যদি আমার শরীর শুষ্ক হয়, ত্বক্ অস্থি মাংস যদি লয় প্রাপ্ত হয়, তথাপি বহু-কল্প-দুর্লভ বোধিকে লাভ না করিয়া এই আসন হইতে আমার শরীর বিচলিত হইবে না। তিনি পুনরায় বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বেয়ং ত্রিসাহস্রং মেদিনী যদি মারৈঃ পূর্ণা ভবেৎ
সর্ব্বেষাং যথমেরু পর্ব্বতবরঃ চাণীষু গচ্ছো ভবেৎ।
তে মহ্যং ন সমর্থ রোম চালিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং
কুর্য্যাচ্চাপি হি বিগ্রহেম বর্ম্মিতেন দৃঢ়ম্॥"

যদি এই ত্রিসহস্র মেদিনী মারের দ্বারা পূর্ণ হয় এবং মেরু অবধি যাবদীয় পর্ব্বত তাহার হাতের খড়্গ হয়, তথাপি আমার প্রাণ নাশের পূর্ব্বে তাহারা আমার একটি লোমকেও চালিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তাহারা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তোমরা জানিও যে দৃঢ় বর্ম্মের দ্বারা আমি আবৃত আছি।

বৈদিক যুগের দেবাসুরের যুদ্ধও আর কিছুই নহে, সেও কেবল, অন্তরস্থ এই কল্মষ অসুরগণের সহিত সাধন যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে পবিত্র করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা দেবতা। আত্মোদ্ধার, আত্মরক্ষা বড়ই কঠিন কার্য্য। দেবতারা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা দেবতা। দেবতা কে?

"দেবা দীব্যতে র্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়-বৃত্তয়ঃ"

শাস্ত্র নির্ণিত প্রকাশাত্মক ইন্দ্রিয় বৃত্তির নাম দেবতা। আর এই প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বৃত্তির প্রাণন ক্রিয়ার মধ্যে থাকিয়া সেই বৃত্তির প্রত্যেক অনুষ্ঠানকে বিপরীত পথে পরিচালনকারী যে বৃত্তি তাহাই অসুর। অন্য কথায় যাহা তমআত্মিকা বৃত্তি, তাহাই অসুর। আত্মস্বভাব পরিরক্ষার জন্য এই দেব এবং এই অসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল—বাণে বাণে নহে, অস্ত্রে অস্ত্রে নহে, কিন্তু দমনে দমনে, প্রত্যাখ্যানে প্রত্যাখ্যানে। দেবতারা যুদ্ধ জয়াভিলাষী হইয়া ওঙ্কার প্রতিপাদ্য সত্যের শরণাপন্ন হইলেন এবং নাসিকাস্থিত চৈতন্য-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া সত্যের কিনা ওঙ্কারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নাসিকা-স্থিত চৈতন্যশক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া পাপবুদ্ধি অসুরেরা আসিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিবা মাত্র তিনি সুগন্ধ আঘ্রাণের সহিত দুর্গন্ধও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন; অতএব তাঁহার পরাজয় হইল। অতঃপর দেবতারা বাক্যস্থিত চৈতন্যশক্তিকে অবলম্বন করিয়া ওঙ্কারের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বাক্যস্থিত চৈতন্য-শক্তিরও সে দৃঢ়তা না থাকায় পাপাত্মিকা অসুরেরা যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিল, তিনিও যেমন সত্যবাক্য উচ্চারণ করিলেন, তাহার সহিত মিথ্যাও বলিতে লাগিলেন। তাঁহারও পতন হইল। এখন চক্ষুর পর্য্যায় পড়িল। চক্ষুকেও অসুরেরা আসিয়া পাপে বিদ্ধ করিল। চক্ষু তখন দর্শনীয় এবং অদর্শনীয় উভয়ই দেখিতে লাগিলেন। চক্ষু জয়-লাভ করিতে পারিলেন না।

শ্রোত্রস্থিত চৈতন্যশক্তির দ্বারা দেবতারা উদ্গীথের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিও দান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং অসুরেরা আসিয়া যেমন তাঁহাকে স্পর্শ করিল অমনি শ্রবণীয় এবং অশ্রবণীয় উভয়ই শুনিতে লাগিলেন এবং পতিত হইলেন। এইবার মনন-শক্তি উদ্গীথ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরেরা আসিয়া তাঁহাকে পাপে বিদ্ধ করিল, মন সঙ্কল্পনীয় এবং অসঙ্কল্পনীয় উভয়ই মনন করিতে লাগিলেন। মন অসুর যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। এইবার দেবতারা আপনাদের আধার স্বরূপ মুখ্য প্রাণকে তাঁহাদের নেতৃত্বে বরণ করিলেন। প্রাণ স্বভাবতই দমসাধন সম্পন্ন ও নিষ্কাম। তিনি আপনার শক্তির দ্বারা চক্ষু, কর্ণ মনাদির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন, দেহে শক্তি সঞ্চার করেন, কিন্তু তজ্জন্য স্বয়ং কোন গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করেন না, নিজে অমানী হইয়া অন্যের মান প্রদান করেন, নিজের প্রাণদানে অন্যকে প্রাণবন্ত করিয়া স্বয়ং অপ্রতিগ্রাহী ও বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান করেন—"দেদা রহে না চুগে ভোগ"। এরূপ স্বভাবসিদ্ধ মুখ্যপ্রাণ যখন দেবতাদিগের প্রতিনিধি রূপে উদ্গীথ-যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তমআত্মিকা অসুরবর্গ আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। তাহাতে ফল হইল এই যে, লৌহ-খণ্ডে পতিত মৃৎপিণ্ড যেমন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেই নিষ্কাম নির্ম্মল মুখ্যপ্রাণে পতিত হইয়া অসুরগণ বিনষ্ট হইল। দেবতারা জয়ী হইলেন। দমনই দেবতার মহাস্ত্র। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী ছিলেন, দেবতারা সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্যের সন্ধিস্বরূপ থাকিয়া সৃষ্ট-জগতে গৃহী এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই ধর্ম্মের এবং কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কিন্তু আমরা গৃহে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম সাধন করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র শান্তিকর আশ্রয়ে বিশ্রাম করিতে চাই, আমাদিগকে কোন্ মহাব্রত যাপন করিতে হইবে? মহাভারতে মহর্ষি সনৎকুমারই তাহা শিক্ষা দিয়াছেন—

> জ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চ দম শ্রুতঞ্চ
> অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাহনসূয়া।
> যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শমশ্চ
> মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥

জ্ঞান, সত্য, দম, অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, উপাসনা, দান, ধৈর্য্য, শম, এই দ্বাদশ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণের মহাব্রত। এই দ্বাদশ মহাগুণ পরম পুরুষার্থ গৃহের দ্বার স্বরূপ। এই দ্বার দিয়াই পরমাত্মজ্ঞানে প্রবেশ করিতে হয়—যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব জানিয়াছেন, সত্য ভাষণের দ্বারা বাক্যকে পবিত্র ও পরোপকারের দ্বারা প্রাণিগণের হিতসাধন করিয়াছেন, মনকে প্রবৃত্তিমার্গ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আত্মার অধীন করিয়াছেন, এবং অধ্যাত্মশাস্ত্র উপনিষদাদি অধ্যয়ন দ্বারা তাহার মূল সত্যের অনুসরণ করিয়াছেন, গুণীর গুণ দর্শনে যাঁহার চিত্ত হৃষ্ট হয় এবং অকার্য্য করিতে যাঁহার লজ্জা হয়, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ ও মানাপমানাদিতে যাহার তুল্য জ্ঞান, পরছিদ্র অনুসন্ধান করা যাঁহার রুচিবিরুদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞান-যজ্ঞে যিনি নিয়ত সমিন্ধন করেন, যিনি দাতা এবং বিষয় সন্নিধান সত্তেও যিনি তাহাতে লোভাহত না হইয়া তৃষ্ণাকে শান্ত রাখিতে পারেন, পরমাত্মজ্ঞানে প্রবেশের দ্বার তাঁহারই নিকটে উন্মুক্ত, তিনিই পরমাত্মজ্ঞানী, তিনিই সাধনায় সিদ্ধ।

সাধন-পথের পথিককে সর্ব্বদা সাবধানে পদক্ষেপ করিতে হয়। যিনি সর্ব্বদা

সাবধান ও বা অপ্রমত্ত, তাঁহাতে আট প্রকার গুণের আবির্ভাব হয়। সে আট-প্রকার গুণ কি তাহা অবধারণ কর—সত্য, ধ্যান, সমাধান, জিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অসংগ্রহ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করা সাধকের সহজসাধ্য হয়, তিনি সমাধিতে অভিনিবিষ্ট হইলে পর-ব্রহ্ম ও তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয় না। আমি কে? কাহার আমি এবং কোথা হইতে, কি প্রকারে এই জগতে আসিলাম, এই প্রশ্নের উত্তর আপনিই তাঁহার মনে উদয় হয়। তখন কি ঐহিক, কি পারত্রিক বিষয়ভোগের ইচ্ছা আর তাঁহার থাকে না —তখন ব্রহ্মানন্দই তাঁহার একমাত্র ভোগ্য হয়। সনৎসুজাত ঋষি শোকাচ্ছন্ন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন এবং আমিও আমার সমধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মভ্রাতৃবর্গকে সেই মন্ত্রই বলিতেছি যে,

সত্যাত্মাভব রাজেন্দ্র সত্যে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
তাংস্তু সত্যমুখানাহুঃ সত্যেহ্যমৃতমাহিতম্।

হে রাজেন্দ্র, তুমি সত্যাত্মা হও, সত্যেই সমুদয় লোক প্রতিষ্ঠিত। সত্যদর্শীগণ বলিয়াছেন যে, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এ সকল সত্য-প্রধান এবং সত্যেতেই অমৃত এবং মোক্ষ নিত্য বিদ্যমান। এই শরীর থাকিতে থাকিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রোধাদি দোষ বিনাশ করিয়া তপস্যা ও ব্রত আচরণ করিবে। দোষ নিবৃত্ত হইলে তপস্যাদিতে সিদ্ধি লাভ করা যায়, ইহা ঈশ্বরকৃত নিয়ম। সত্যই অর্থাৎ পরব্রহ্মই সাধুদিগের ব্রত অর্থাৎ নিত্য বিজ্ঞেয়। যাহা পূর্ব্বোক্ত ক্রোধাদি দোষে অস্পৃষ্ট ও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাদি গুণে যুক্ত, সেই তপস্যাই সমৃদ্ধ ও কেবল। কেবল শব্দে ব্রহ্মকে এবং কেবল শব্দে ব্রহ্ম লাভের হেতুকে বুঝায়। ঈদৃশ নিষ্কাম তপস্যা ও ব্রত, জন্ম মৃত্যু ও জরা অপহরণ করিতে সমর্থ। জন্ম, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিলেই ব্রহ্মসম্ভোগ লাভ হয়।

ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং।

পরমপিতা পরমেশ্বর।

যাঁহাকে লইয়া আমাদের মধ্যে আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে, যাঁহার বিষয় কথোপকথন করিতেছি, তিনি কে? তিনি আমাদের পরমপিতা। তাঁহাকে জানা অতি সহজ নয় কি? তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া উহা পালন করিতেছেন। তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে দেখিবে তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে পাইবে তিনি সকলেতে বিরাজমান। মনুষ্য, জীবজন্তু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, কোন্‌টি না সুন্দর? প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখ, প্রত্যেকটিই সুন্দর লাগিবে। পরমপিতা নিজে সুন্দর। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল অপূর্ব্ব এবং প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থও সুন্দর। তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছায়া সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়। মঙ্গলময় পিতার মঙ্গল-ভাব সকলেতে নিহিত! তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার ব্যবস্থা, তাঁহার অভিপ্রায় সকলই মঙ্গল। তাঁহাকে পিতা বলি কেন? তিনি পিতার ন্যায় দিবারাত্র আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তিনি পিতৃরূপে বিশ্ব-সৃজন করিয়া সকল মনুষ্যকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, তিনিই মঙ্গলোদ্দেশে এই বিশ্বলোক প্রসূত করিয়া জননী সমান পালন

করিতেছেন। তাঁহার শুভ ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইতেছে, মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে। আমরা তাঁহাকে না জানিলেও তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সব জানিতেছেন, সর্ব্বদর্শী সব দেখিতেছেন; আমরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে কিম্বা অন্যায় কাজ করিলে তাঁহার নিকট গোপন থাকিবার যো নাই, কেন না তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী; কিন্তু আমরা চিরদিন এরূপ অস্থানে থাকিলে আমাদের মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয় না। তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে অন্য জীবজন্তুর প্রভেদ কি রহিল। আমরা নিজ নিজ দোষের জন্য প্রতিনিয়ত দুঃখে কষ্টে নিপতিত হই। পরমেশ্বরই হৃদ্গত শুভবুদ্ধি দ্বারা শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই সকল দুঃখ কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া নিজের কাছে আনয়ন করেন। তিনি আমাদের কি না দিতেছেন। আমাদের যে কোন কিছুরই অভাব নাই! আমাদের যাহা আবশ্যক, তাহা পূর্ব্ব হইতে তিনি জানিয়া, তাহারই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন এবং সকল অভাব মোচন করিতেছেন। তাঁহার নিয়ম অনুযায়ী চলিলে কেন আমাদের কষ্টে পড়িতে হইবে? এই পৃথিবীকে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষ লতা পুষ্প ফল এবং নানাবিধ জীবজন্তুর দ্বারা আমাদের জন্য কেমন সুশোভিত করিয়াছেন এবং তাহাতে আমাদের স্বাধীন ভাবে কেমন বিচরণ করিতে দিয়াছেন। আমরা এখানে আরামে সে সকল বস্তু কেমন উপভোগ করিতে পারিতেছি। তিনি আমাদের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, তাহার উপর নিজেকে পর্য্যন্তও দান করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। কিন্তু এই মহৎ দানেও তাঁহার অহঙ্কার নাই; মহৎ কার্য্যেও তাঁহার গর্ব্ব নাই। যাহার যাহা আবশ্যক তাহা তিনি প্রতিনিয়ত যোগাইতেছেন, অথচ ভক্তের কাছে তিনি নিজে পড়িয়া আছেন। এত নম্র-ভাব সেই দেব-দেব ব্যতীত আর কাহারও কি সম্ভবে?

তাঁহার মত ঐশ্বর্য্যশালী কে আছে? তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, অথচ তিনি দীনহীন ভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে লুক্কায়িত আছেন। কখন তাঁহাকে দয়া করিয়া ডাকি, কখন বা তাঁহাকে প্রীতি-উপহার দিই; এ যেন আমাদেরই তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ। যদি তাঁহাকে একবার ভালবাসি, এই ভিক্ষা টুকুর জন্য তিনি যেন লালায়িত। এই ভালবাসাতে যেন তাঁহার জোর নাই। তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়া ভক্তের কাছে ভালবাসাটুকু কেবল ফিরিয়া চান। আমাদের প্রেমময় প্রেম দিয়া প্রেম চান। আমাদের কাছে তাঁহার এই ভিক্ষা। আমরা সর্ব্বস্ব পাইয়া এই ভিক্ষাটুকু দিতে কি কাতর হইব? কোথায় আমরা তাঁহার চরণ সেবার জন্য পড়িয়া থাকিব, তা নয়, তিনিই আমাদের কাছে নিজেকে দান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার এত নম্রতা দেখিয়া কি আমাদের নম্র হইতে ইচ্ছা যায় না? আমি যে মহান্, এই বলিয়া তাঁহার কি অহঙ্কার ও অভিমান আছে? এ মহৎ দৃষ্টান্তে কি আমাদের জ্ঞানশিক্ষা হয় না? আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে সেই মহতের ভাব ব্যক্ত করা অসাধ্য। আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে চেষ্টা করিয়া ভাল হওয়া চাই, যাহাতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রিয় কাজ করিয়া তাঁহার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারি। অনবরত চেষ্টা, অনবরত উদ্যম, অনবরত সাধ্য সাধনা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। তিনি সবেতে অপরিমিত, অসীম, তিনি

আমাদের কাছে বর্ণনাতীত। তিনি নিজের কার্য্যে নিজে সর্ব্বদা বিভোর। তাঁহার সুখও নাই দুঃখও নাই। তাঁহার হর্ষও নাই বিষাদও নাই। অথচ তিনি পরিপূর্ণমানন্দং তিনি সর্ব্বদা আনন্দময়। তাঁহার উদার ভাবের, তাঁর নিস্বার্থ দানের কণামাত্রও লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করা উচিত। আমরা অশেষ গুণে যতই মহৎ হই না কেন, তাঁহার সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হইতে পারে? তিনি অতুলনীয়। যিনি আমাদিগকে আজন্মকাল লালনপালন করিতেছেন, যিনি আজীবন জ্ঞানশিক্ষা দিতেছেন, সেই এক পরমেশ্বরে মাতার পালনীশক্তি ও পিতার গুরুত্ব এই উভয় ভাব দেখিতে পাই বলিয়া তিনি আমাদের পিতা ও তিনিই আমাদের মাতা। তাঁহার মত পূর্ণ মহৎভাব আমাদের নাই বলিয়া আমাদের কার্য্য সীমাবদ্ধ, পরিমিত ও অপূর্ণভাবে থাকে। তিনি আমাদের স্রষ্টা, তাঁহার কৃপায় যে সকল সদ্গুণ লাভ করি, তাহাতে কি আমরা পরিপূর্ণভাবে তাঁহার সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারি? তাহা নয়। আমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পদানত হইয়া তাঁহার চরণ সেবার উপযুক্ত হইলেই আমাদের জীবন আমাদের জন্ম সার্থক হইবে। সেই পরমপিতা পরমমাতাকে জানিবার জন্য আমরা আমাদের পিতামাতাকে পাইয়াছি, যিনি তাহাদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাকে জানিবার কত না উপায় করিয়া দিয়াছেন।

সেই সত্য-জ্যোতিকে পাইতে হইলে অন্তর শুদ্ধি করিয়া আত্মজ্যোতি দ্বারা পাইতে হইবে। সেই পবিত্রময় ও প্রেমময়, বিশুদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র ভাব ও পবিত্র প্রেম আমাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। আমরা কি তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিব না? কেহ ভাল বাসিলে কি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা যায়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশাল সৃষ্টির রচনাতে যখন তাঁহার জ্বলন্ত আবির্ভাব, যখন সকল বস্তুতে তিনি বর্ত্তমান, যখন অন্তরের অন্তরের মধ্যে তিনি বিরাজমান, আমরা সত্য সত্য এতই কি অজ্ঞ, এতই কি অন্ধ, যে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার মহিমা গাহিতে পারিব না। সকল মনুষ্যের ও সকল জীব জন্তুর পিতামাতা সেই একমাত্র ভগবান, তাঁহাকে আমরা নিজ নিজ অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি। আহা! তাঁহাকে কি রূপে ভাল না বাসিয়া ভক্তি না করিয়া থাকিব। আমাদের জীবন কি বৃথা যাইবে। যাঁহাকে জানিয়া যাঁহাকে প্রীতি করিয়া যাঁহার প্রিয় কাজ করিয়া উপযুক্ত সন্তান হইবার জন্য এই মনুষ্য জন্ম হইয়াছে, তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির দ্বারা পূজা করিলে তবে না আমাদের মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইবে। তাহা না হইলে অন্য জীব জন্তুর সঙ্গে আমাদের কি প্রভেদ রহিল। অন্যান্য জীব জন্তু অজ্ঞানে এবং বৃক্ষ লতাদি জড় পদার্থ সকল প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিতেছে, তাহারা জড় পদার্থ হইলেও তাহাদের মধ্যে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। আর আমরা স্বাধীন মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানে উন্নত হইয়া তাঁহার আদেশ এবং তাঁহার নিয়ম কি পালন করিব না? তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া তাঁহাকে কি প্রসন্ন করিব না? সর্ব্বত্র তাঁহার সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম। কোথাও একটু বিশৃঙ্খলা নাই। আমরাও যদি তাঁহার অনুকরণ করিয়া ও তাঁহার অনুসরণ লইয়া ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র ভার সুশৃঙ্খলার সহিত

চালাইতে পারি তবেই আমাদের মঙ্গল।

পরমপিতা পরমেশ্বর এত বড় জগত সংসারের ভার লইয়া অনুক্ষণ তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তিনি আমাদের শরীর মন আত্মার মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তিনি আমাদের কল্যাণ চান। তাঁহার অভিপ্রায় যে আমরা মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যের মত কার্য্য করি। মাতার গর্ব্ভে কে আমাদিগকে পরিপুষ্ট করিলেন? ভুমিষ্ঠ হইলে কাহার করুণায় বর্দ্ধিত হইলাম? কে আমাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করিলেন? জন্মে মৃত্যুতে স্বদেশে বিদেশে, নিকটে দূরে, সময়ে অসময়ে, সুখে দুঃখে সকল কালে তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু। আমরা যে স্থানে ব্যাপককাল ধরিয়া থাকি, সেখানকার জন্য আমাদের কত না মায়া বসে। সে স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে কত না কষ্ট বোধ হয়? যে জীব জন্তু আমাদের কাছে থাকে, তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে করিতে তাহাদের উপর কত না ভালবাসা জন্মে, বৃক্ষ লতাদি রোপন করিলে উহাকে যত্ন করিয়া বাঁচাইতে এবং বর্দ্ধিত করিতে কত না ইচ্ছা যায়। নিজের ঘরের জিনিষ গুলির উপর কত না মায়া বসে। তাহাদিগকে প্রতিদিন তুলিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া যত্নে আদরে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতে কত না ইচ্ছা যায়। দাস-দাসীর পরিচর্য্যায় কত না মুগ্ধ হইতে হয়, তাহাদের উপর কত না মায়া জন্মে। অনেক স্থলে তাহাদের কার্য্য-দক্ষতা ও প্রভুভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। কত প্রভুভক্ত ভৃত্য আমাদের নিকট নিজ সন্তানবৎ হইয়া পড়ে। সাংসারিক নানা অবস্থায় পড়িয়া আমরা আত্মহারা, কিন্তু আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর, যিনি আমাদের নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে কি সত্যসত্যই ভুলিয়া থাকিব। এই পরমপিতাকে পাইবার জন্য কত শত ধর্ম্মাত্মা নিজের জীবন হারাইয়াছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি ভালবাসার পরিচয়, মহৎ-জীবন মহৎ-চরিত্র ব্যতীত কয় জন লোক দিতে পারে, অথচ তিনি প্রত্যেক মনুষ্যের নিজস্বধন। আমরা নিজ নিজ সংসারের মায়ায় এতই মুগ্ধ হইয়া আছি, যে তাঁহাকে বুঝিতে ধরিতে ছুঁইতে অসমর্থ। তিনি আমাদের মত সাংসারিক লোককে শীঘ্র দেখা দেন না। আমরা সংসারের কাজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন যে নমস্কার সেটিও দিন মধ্যে একবার করিতে পারি না; কি আশ্চর্য্য! যিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে প্রত্যেক জীব-জন্তুকে আশ্রয়দান করিতেছেন, যাঁহার আবির্ভাব সকলেতে রহিয়াছে, তিনি আমাদের নিকট হৃদয়ের প্রীতি ভিক্ষা করেন, দরিদ্রের ন্যায় হৃদয়-প্রান্তে অবস্থান করেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে এই সামান্য ভিক্ষা দিতে কাতর, তঁাহাকে দূরে রাখিতে সচেষ্ট, এ কি ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা। হায় আমরা তাঁহার অমৃতের অধিকারী হইলাম না, আমাদের দুর্দ্দশার সীমা কোথায়। একবার তাঁকে প্রেম দিয়া দেখ দেখি, প্রেমের হিল্লোলে হৃদয় উথলিয়া উঠিবে। ভক্তি শ্রদ্ধা যাহা তাঁহাকে অর্পণ করিবে, তাহার ক্ষয় নাই। তিনি সকলই দান করিয়া আমাদিগকে ধনী করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জন্য আমরা কি করিতেছি। ভালবাসা কেহ জোর করিয়া দেওয়াতে পারে না, কিংবা উহাকে কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। ঐ জিনিষটি স্বেচ্ছার জিনিষ। তাঁহাকে ভালবাসিলে তিনি ঐটি কেবল

আমাদের কাছে গ্রহণ করেন,—কেন না. ঐটি আমাদের নিজস্বধন।

এই ভালবাসাটুকু দিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়া উঠে। আমরা তাঁহাকে ভালবাসিলে পাপ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি চলিয়া যায়। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার কাছে কোন অপ্রিয় কাজ করিয়া ঘৃণিত বা লজ্জিত হইতে ইচ্ছা যায় না। যখন আমরা ভাই ভগ্নি স্বামী পুত্র এ সকলকে ভালবাসি, ইহাদের জন্য কত না প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা যায়। যখন তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে আমরা প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতে কি পরাঙ্মুখ হইব? তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? যখন তাঁহার অভাবে কাতর হইয়া পড়ি, নিরাশ হৃদয়ে কাঁদিতে থাকি, তখন সেই দয়াময়ের করুণা বারিতে আমাদের চিত্ত ভাসিয়া যায়, তখন মানস-সরোবরের প্রস্ফুটিত হৃদয়পদ্মে জ্যোতির্ম্ময় পরমপিতাকে দেখিয়া কৃতার্থ হই।

পরমাত্মা আমাদের আত্মার ভিতর স্থিতি করিতেছেন, সেই আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে জানা চাই। সেই সত্যজ্যোতি আত্মজ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। তাঁহাকে পাইবার জন্য সেই কারণে দূরে যাইতে হয় না। নিজ আত্মাই পরমাত্মার আলয়। নিজ হৃদয়-কোষে তিনি বর্ত্তমান। তিনি আমাদের কত যত্নের ধন।

পরমপিতা। আমরা তোমাকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিয়াছি। আমাদের শিক্ষার ভার তুমি গ্রহণ কর। আমরা তোমার পুত্র কন্যা। এখনে তোমাকে সম্পূর্ণ রূপে না জানিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে রহিয়াছি। তুমি শিক্ষার ভার লইলে আমাদের পরমার্থ জ্ঞান জন্মিবে। ভগবন! তুমিই যথার্থ পিতা, তুমিই যথার্থ সকলের মাতা। যাহাতে আমরা শিক্ষার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তোমার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারি,সেইরূপ আমাদের জ্ঞান-শিক্ষা দাও। আমরা তোমার প্রতিনিধি হইয়া পিতা রূপে মাতা রূপে ধরায় আসিয়াছি। কিন্তু তোমার অভিপ্রায় মত কাজ করিলাম কৈ? পিতা মাতার ভার লইয়া তোমার মত শিক্ষাদান, তোমার মত সন্তান পালন করিলাম কোথায়? পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাব আমাদের কোথায়? তুমি আমাদের গুরু, তুমি আমাদের অন্তরে থাকিয়া পিতার ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে শিক্ষা দাও। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যপালন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি, ভাই ভগ্নির প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন, আত্মীয় স্বজন—দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার, এই সকল উচ্চতম শিক্ষা তোমার কৃপায় লাভ হয়। তোমার মত দয়া, স্নেহ, ক্ষমা মমতা কোথায় পাইব? তোমার মত নিকটস্থ আত্মীয় আমাদের আর কে আছে? পিতা মাতা, ভাই, ভগ্নি, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র কন্যা ইহাদের সহিত চিরসম্বন্ধ হইতেই পারে না। কালে যখন সকলে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে, যখন কেহই নিকটে থাকিবে না, একমাত্র তুমিই আমাদের আশ্রয় রহিবে। তোমা ব্যতীত আর কাহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিব। যতদিন আমরা পৃথিবীতে-বিচরণ করিব ততদিন আমরা মায়াতে মুগ্ধ হইয়া যেন এই ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত না হই। তোমার সঙ্গে আমাদের চিরস্থায়ী সম্বন্ধ, নিত্য যোগ। তোমার আশ্রয়েই প্রকৃত আরাম ও মনের চরম শান্তি। তোমাকে ভুলিয়া থাকিলে অশান্তি ও অসন্তোষের দ্বারা বিদ্ধ হইতে হয়। তোমাকে মনে স্থান না দিয়া আমাদের

আরাম কোথায়? ভক্তি ও ভালবাসা না থাকিলে কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করা যায় না। এই দুইটির প্রেরণায় কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা সুসিদ্ধ হয়। কোন জিনিষ ভুয়া হইলে উহা যেমন বাহিরে সুন্দর ভিতরে অসার, সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে ভালবাসা ও ভক্তির অভাব হইলে তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। আমাদের সাংসারিক পিতামাতার প্রিয় হইতে গেলে যেমন তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসিতে হয় ও তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্য স্বচ্ছন্দভাবে সাধিত হয়, সেইরূপ আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বরকে ভক্তির সহিত ভালবাসা চাই। উভয়ের সহযোগে আমাদের কর্ত্তব্য-সাধন সহজ হইয়া পড়ে। এই ভক্তি ও প্রেম হৃদয়ে না থাকিলে কোন কাজেই বল পাওয়া যায় না। ইহাদের প্রভাবে সকল কর্ম্ম সিদ্ধিলাভ করে। যখন আমরা নিজের শরীরটিকে খুব হৃষ্ট পুষ্ট করিতে চাই, যাহাতে সুন্দর থাকে তাহার চেষ্টা দেখি, তখন যদি পরমপিতা পরমেশ্বরকে ভালবাসি, ভক্তি করিতে চাই, কেনই বা তাঁহার আবাসস্থান আমাদের এই আত্মাকে তাঁহার জন্য পবিত্র করিতে চেষ্টা না করিব। বিশুদ্ধভাবে নির্ম্মল অন্তঃকরণে একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে আমাদের আত্মা সুন্দরও পবিত্র হইবে, এবং স্বচ্ছ সলিলের ন্যায় তাঁর প্রেম মূর্ত্তি আমাদের হৃদয় সরোবরে দেখা যাইবে। আমরা সকলে সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্তান। তাঁহাকে ভালবাসিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার সকল প্রাণীর উপর কর্ত্তব্য পালন, সকল জীবের উপর সদ্ব্যবহার করিয়া সকলের সঙ্গে সদ্ভাবে যাহাতে চলিয়া যাইতে পারি, সেইরূপ উচ্চ শিক্ষা সেইরূপ উচ্চ জ্ঞান শুভবুদ্ধি ও শুভমতি তিনি অন্তরে প্রেরণ করুন। পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। বারংবার তাঁহার চরণে আমরা প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সত্যং।

এ বিশ্ব রচনা নহেক কল্পনা
সত্যের সাধনা এ যে সমুদয়।
বিচিত্র বরণে স্বাদে গন্ধে গানে
প্রকাশিত সত্য এ জগতময়।
সত্যে স্থিতি বিনা জ্ঞান মন প্রাণ,
ফেরে কেন্দ্র-ভ্রষ্ট গ্রহের সমান,
শূন্য পথে তারা হয় দিশাহারা
না পেয়ে কিনারা ভেবে সারা হয়।
সত্যেরে লভিলে ইহারা সকলে,
হিল্লোলিত হয়ে প্রেমের হিল্লোলে,
বাজাইয়া তোলে বিশ্ব ছন্দ তালে
আনন্দ মুরতি ধরে প্রভাময়।
সে আনন্দ রূপ উজ্জ্বল বরণ,
উদ্ভাসিত করি জ্ঞান প্রাণ মন,
নেহারে তখন অন্তরে আপন
যোগাসনে সত্য সমাসীন রয়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

বর্ষশেষ।

বর্ষ কেটে গেল
অনন্তে বুদ্বুদ এক ক্ষণিকে মিশাল।
সব সুখ, সব দুঃখ, পরীক্ষার মাঝে
শুধু বিশ্বরাজ ছবি হৃদয়ে বিরাজে।
তাঁহার করুণা স্মরি, তাঁর করুণায়
কি মধুর শান্তি সুধা লভেছি হিয়ায়।
পেয়েছি নূতন জন্ম যেন ধরা পরে
ভাসিতেছি দিবা নিশি আনন্দ সাগরে।
আসে দুঃখ ভরে চোক নয়নের জলে,
কিন্তু এ [illegible] র আর তাহে নাহি টলে।

দুঃখ সাথে পাই কার অমৃত পরশ,
কাহার স্নেহের দৃষ্টি সজীব সরস
করিছে এ হিয়া মোর, সংসারে থাকিয়া
তাঁরি কাছে প্রণত এ ক্ষুদ্র মোর হিয়া।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

নববর্ষে।

পুরাতন বর্ষ গত, নবীন বরষে
জাগিয়া উঠুক প্রাণ নবীন হরষে,
গেছে দুঃখ ব্যথা ভয়
শোক নিরানন্দময়
জাগিল নবীন আশা কাহার পরশে?

কৃতজ্ঞতা ভরে পূর্ণ হৃদয় আমার
কার এই স্নেহ প্রেম এই দান কার?
যেই স্নেহ প্রেম দিয়া
আজি পুলকিত হিয়া
সে চরণে প্রণিপাত করি বারবার।

এসেছে নবীন বর্ষ নব শক্তি দিয়া,
করহ সজীব নব এই দীন হিয়া।
নব শক্তি লভি প্রাণ
গাহি তব জয় গান
দুঃখ, তাপ, মোহ, পাপ যাব পাশরিয়া।

সর্ব্বস্ব আমার সঁপি দিনু ও-চরণে,
দয়াময় কৃপাদৃষ্টি রেখ সর্ব্বক্ষণে।
তব পুণ্য আশীর্ব্বাদ
ঘিরে থাক সাথে সাথ
চরণে আশ্রয় দিও এ ভিখারী জনে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানাকথা।

উৎসব।—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে "আমি বিগত ২৯ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের একোনপঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্ত তৎপূর্ব্ব শনিবার বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺ যোগেশচন্দ্র সরকারের বাটীতে প্রতি বৎসর এই দিন সন্ধ্যার পরে উপাসনা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন বলিলেন যে যোগেশ বাবুর পুত্রেরা তাঁহাদের বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনা হইবে না বলিয়া প্রথমে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ত প্রাতে তাঁহারা ব্রহ্ম কৃপাবলে উদ্বোধিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে সন্ধ্যা সময়ে তাঁহাদের বাটীতে উপাসনা হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রাপ্য সমুদায় দানের টাকা দিবেন। আমরা একটু বিশ্রামান্তে তথায় উপাসনা করিতে গেলাম। দেখি সেই গৃহ-কানন উৎসাহ পূর্ণ। বেদীর উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ খানি স্থাপিত। আমি উপাসনা করিলাম এবং রাজকুমার বাবু মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিলেন। উপাসনা শেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ খানি হস্তে লইয়া সেই যুবার হস্তে দিলাম এবং বলিলাম এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ তোমার পিতামহ পরমব্রহ্মভক্ত অম্বিকা বাবুর, ইহা তুমি গ্রহণ কর, ব্রাহ্মধর্ম্মে জীবন বিসর্জ্জন দাও, ব্রহ্মকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া এখানে তাঁহার নিত্য উপাসনা প্রতিষ্ঠিত কর। তিনি সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম মস্তকে ধারণ করিলেন।

রবিবার সমস্ত দিবসব্যাপী উৎসব। প্রাতে উপাসনান্তে অহৈতুকী "প্রেম" সম্বন্ধে এবং রাত্রে "তপস্যার কম্বল" সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলাম। মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ভিক্ষুককে চাউল ও বস্ত্র বিতরিত হইয়াছিল। পর দিন প্রাতে সম্পাদক বাবু বিনোদ বিহারী সেন মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা শেষ করিয়া বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করি।" ঐ উপদেশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

প্রাপ্তিস্বীকার—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। বারান্তরে ইহার সমালোচনা করিব। মূল্য ৸৹ বার আনা। যাঁহারা বৈশাখ মাসের মধ্যে লইবেন, তাঁহাদিগকে আট আনায় দেওয়া যাইবে। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড্ আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে উহা প্রাপ্তব্য।
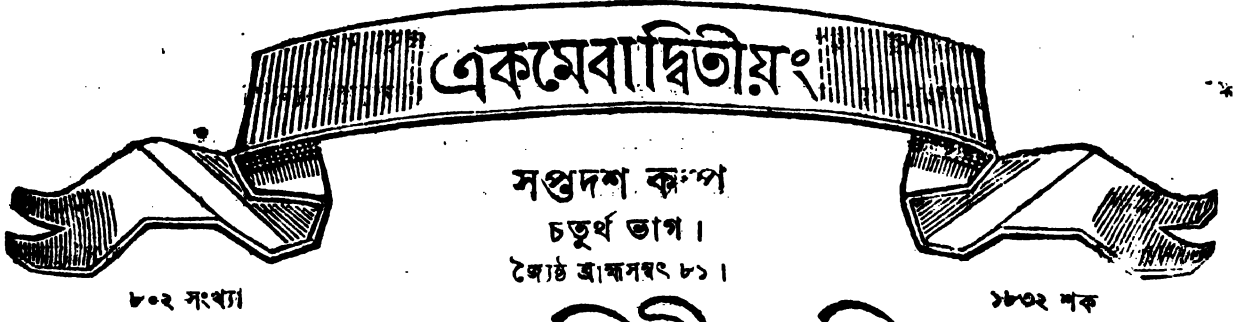
সপ্তদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।
৮০২ সংখ্যা ১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

রাঁচির গিরিগৃহে ব্রহ্মোৎসব।

ছোট নাগপুর প্রদেশের অন্তঃপাতী রাঁচি নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, তাহার একটির নাম মোরাবাদী। মোরাবাদী নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই পর্ব্বতের নিম্নে দূরে দূরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম গুলি আছে তাহার অধিকাংশই মুণ্ডা, উরাঁও সম্প্রদায়ের কোল ও হিন্দু আহির প্রভৃতি অতি অজ্ঞ ও সরল লোকের বাসস্থান। ইহারা গো, শূকর ও কুক্কুট পালন করিয়া থাকে। সূর্য্যদেবই ইহাদের উপাস্য। ইহারা গো-গৃহে সূর্য্যের উদ্দেশে শূকর ও কুক্কুট বলি দিয়া থাকে। তাহার মাংসও ইহারা ভোজন করে। এস্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর। এই গ্রীষ্ম-কালের দুই এক মাস এখানে রৌদ্র উগ্র ও বায়ু প্রচণ্ড হইলেও তাহা স্বাস্থ্যের হানিকর নহে। এখানকার কূপোদক সুমিষ্ট ও শীতল। এ জল পান করিয়া "অপ্সু ভেষজং" এই বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারা যায়।

কর্ম্ম-শেষ জীবনে জন-কোলাহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি লাভের ইচ্ছায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রথিতযশঃ দ্বিতীয় ও পঞ্চম পুত্র ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পর্ব্বত-খণ্ডকেই আপনাদের বাসোপযোগী স্থির করিয়া এখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতের শিরোদেশে মহেশের মুক্ত মহিমার মধ্যে দেব-মন্দির। তন্নিম্নে পর্ব্বত-গাত্রে ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্জ্জন নিকেতন এবং ইহার সানুপ্রদেশে আশ্রম-মাতা ও বালকগণের আবাসস্থান। এই স্থানে আগমন করিলে প্রথমেই সানুপ্রদেশের আশ্রমটিকে একটি প্রস্ফুটিত আরণ্য-পুষ্পের ন্যায় বোধ হয়। ইহার গঠন প্রণালী এমন নূতন ও শোভাসম্পন্ন যে দেখিলেই নয়ন মন মুগ্ধ হয়। পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যখন দেখি, তখন নিভৃত-নিকেতনের আর এক ভাব মনে উদয় হয়। ইহার গবাক্ষ দ্বারগুলি যেন দূরান্তবিশিষ্ট আকাশকে আলিঙ্গন করিয়া প্রান্তরস্থিত চতুর্দ্দিকের ক্ষুদ্র শ্যামল তরুগুলিকে স্নেহ-চুম্বনে হৃদয়ের প্রীতিপ্রবাহ ঢালিয়া দিতেছে। এখানকার প্রকৃতি ও প্রজা সকলেই যেন আপনার, কেহ পর

নহে। সরল প্রীতির ইহাই মহিমা। এখানে কোন কোলাহল নাই, কেবলই শান্তি। শান্তিদেবী যেন ইহার নিবাসী-দিগকে সমাধিসুপ্ত করিবার জন্য অহরহ চামর ব্যজন করিতেছেন। উর্দ্ধে শিখরে দিঙ্মুক্ত দেবমন্দির সেই শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা বক্ষে ও তাঁহার ওঙ্কারাঙ্কিত মহা-নাম মস্তকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রভাতে যখন সূর্য্য রক্তিম বর্ণে প্রকাশিত হয়, তখন ইহাঁরা পূর্ব্বমুখী হইয়া এবং প্রদোষে সূর্য্যের অস্ত-গমন কালে তদভিমুখে ঈশ্বরের আরতি, অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়া থাকেন। স্বামী অচ্যুতানন্দ মিশ্র শান্তি-নিকেতন হইতে আসিয়া এই মন্দিরের আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য ১০৩২ শকের ৪ঠা বৈশাখ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন। নগর হইতে ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও সাকারবাদী হিন্দু সমাজের প্রায় ৮০ জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রভাতে সমবেত সকলে প্রথমে শিখরস্থ মন্দিরে ঈশ্বরের অর্চ্চনা ও আরতি করিয়া স্তুতিগান করিতে করিতে অবরোহণ ও আশ্রমস্থ বৃহৎ মণ্ডপে আসন গ্রহণ করিলেন। এই স্থানেই উপাসনা ও মহেশ্বরের মহৎ যশ ঘোষিত হইল। ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতার আদি-সমাজ হইতে সমাগত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও স্বামী অচ্যুতানন্দ মিশ্র অর্চ্চনা পূর্ব্বক বেদী গ্রহণ করিলেন।

"অশ্বইব রোমানি বিধূয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকং অভিসম্ভবামি"

এই শ্রুতি অবলম্বনে শাস্ত্রী মহাশয় সময়োপযোগী উদ্বোধন করিলে পর উপাসনা ও প্রার্থনা হইয়া সঙ্গীত হইল। তদনন্তর ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা কল্পে একটি হৃদ্য মনোহর বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আর্য্য-সমাজের ভক্তেরা হিন্দি ভজন ও অন্যেরা হরি সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সকলের চিত্ত হরণ করিলে পর প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হইল। ইহার পর ফলাহার। বিদুষী ঠাকুর পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অতিথির সৎকারে বড় যশস্বিনী। ইঁহার সহিত মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী অতিথি সৎকারে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে বহুবিধ উপাদেয় ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া সযত্নে সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মের এমনিই মহিমা যে অদ্য তাঁহারই অতুলনীয় প্রেমে সকলে এক প্রাণ হইয়া স্বস্ব গণ্ডী-রেখা ছিন্ন করিয়াছিলেন। দৃশ্য বড় মধুময় অমৃতময় হইয়াছিল।

এখানে চারিটি ভাব দৃশ্যমান। প্রথম, আশ্রমভাব। ইহাতে আশ্রম মাতার আতিথ্য ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, আশ্রম-শিশুর ক্রীড়া-কৌতুক, এবং ধ্যান ও জ্ঞানরত আশ্রমবাসীর নীরব নিশ্চিন্ত ভাবে কাল যাপন। দ্বিতীয়, প্রাতঃপ্রদোষে দেবমন্দিরে মহেশ্বরের আরতি ও বন্দনা। তৃতীয়, মন্দিরের অনতি দূরে যে তিনটি গুহা আছে তাহা যোগীর যোগ সাধনার জন্য অহরহ উন্মুক্ত এবং বজ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝা হইতে আত্মরক্ষণের পরম অনুকূল। চতুর্থ ভাব, লতামণ্ডপ। পর্ব্বতের উত্তর কটিদেশে সুগন্ধী পুষ্পমাতা একটি আরণ্য লতিকা পাষাণ গাত্রে অনাশ্রিত ভাবে লম্বিত ছিল। তাহাকেই আশ্রয় দিবার জন্য এই লতামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং

তাহারই নীচে শান্তং শিবমদ্বৈতং পুরুষে আত্ম সমাধানের জন্য বেদী স্থাপিত হইয়াছে। এই চতুর্দৃশ্যমান আশ্রম-পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী এখানকার গৃহী ও পথিক জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে,

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।
আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ।

যখন এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছিল, তখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—এই মন্দিরে কোন্ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইবে? আমি তাহার উত্তরে বলিতাম অমূর্ত্তের প্রতিষ্ঠা।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।

সেই প্রকাশবান্ অমূর্ত্ত অজাত পুরুষ যিনি সকলের বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। অমূর্ত্ত ব'লে কি তাঁকে দেখা যায় না? যায়, শুদ্ধসত্ত্ব ক্ষীণপাপ যতিরা তাঁর দর্শন লাভ করেন।

এখনকার কালে আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত, কিন্তু বেদ অথবা উপনিষদে মূর্ত্তিপূজার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। উপনিষদে স্পষ্টই আছে

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ

তাঁর কোন প্রতিমা নাই, যাঁর নাম মহদ্‌যশ—যাঁর যশোভাতি ভূলোক ও দ্যুলোকের প্রত্যেক অংশে দীপ্যমান। উপনিষদের ঋষিরা আরো বলেছেন

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে,
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

বাক্য যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত—মন যাঁকে মনন করতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক চিন্তা মনন করেন—তাঁকে ব্রহ্ম বলে জান, তিনিই ব্রহ্ম; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কদাপি ব্রহ্ম নহে। আমাদের উপাস্য দেবতা, যিনি 'অনাদ্যনন্তং' 'মহতোমহীয়ান্', তিনিই এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

বিগ্রহের প্রয়োজন কি? যিনি সর্ব্বব্যাপী—আকাশে যিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রয়েছেন—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন—

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুতবিশ্বতস্পাৎ। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

সর্ব্বত্র যাঁহার চক্ষু—সর্ব্বত্র যাঁহার মুখ—সর্ব্বত্র যাঁর হস্ত পদ—যাঁর দৃষ্টি ও শ্রুতি সর্ব্বত্রই—যিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন—তাঁর কি কোন কাষ্ঠ-পাষাণের প্রতিমূর্ত্তির প্রয়োজন!

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।

"কি ঊর্দ্ধে, কি অধোতে; কি পশ্চাতে, কি সম্মুখে; কি দক্ষিণে, কি উত্তরে; আমাদের চতুর্দ্দিকে সকল স্থানেই তিনি দীপ্যমান রহিয়াছেন। আমরা যদি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানে তিনি বিরাজমান; যদি গভীর সমুদ্র-গর্ব্ভে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন-কিরণে যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অন্ধতম তিমিরেও জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। সকল স্থানই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই তাঁহার দৃষ্টি।"

বিগ্রহ নাই তবে তাঁহার আরতি কি প্রকার?

"তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁর জগত মন্দিরে।"

গুরু নানক এই আরতির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন,

"গগণ মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে
তারকামণ্ডলা জনক মোতী
ধূপ মলয়ানিলো পবন চমরো করে
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি।
কহো কৈসী আরতী হোয়ে
ভবখণ্ডন তেরি আরতী—
অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী।"

গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা-মণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল-বন রাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।

অনাহত অথচ ভেরীর বাদ্যধ্বনি দিশি দিশি উত্থিত হইতেছে।

এ কথা কেহই বলে না যে কাষ্ঠ পাষাণ পুত্তলিকাই স্বয়ং দেবতা। তাঁদের বক্তব্য এই যে অনন্তস্বরূপকে আমরা মনে ধারণা করিতে পারি না—তাঁতে চিত্ত সমাধানের জন্য শালগ্রাম প্রভৃতি একটা কোন চিহ্ন চাই। তা যদি বল তবে সেরূপ চিহ্ন কোথায় না আছে? এই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি সেই চিহ্নে পরিপূরিত—

পুষ্পিত কানন, গিরিনদী সাগর,
অযুত অগণ্য লোক—সূর্য্য
চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র তারা—"তাঁর
মহিমা কোথায় না হয় স্মরণ?"

"অভ্রভেদী অচল শিখর, ঘননীল সাগরবর,
যথা যাই তুমি তথা।
রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ
শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি
তব কান্তি মেঘে।
সজন নগর বিজন গহন
যথা যাই তুমি তথা।"

তবে যদি তাঁহার ধ্যানের অবলম্বন কোন চিহ্ন আবশ্যক হয়—আমি বলি তাহা ওঁ। এই অক্ষর আমাদের মন্দিরের চূড়ায় স্থাপিত দেখিতে পাইবেন। ওঁকার ব্রহ্মের প্রাচীন নাম—"ওমিতি ব্রহ্ম;" ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়শক্তি এই অক্ষরের অন্তর্ভূত। পুরাণে এই ত্রিশক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন পৃথক পৃথক দেবতা রূপে কল্পিত হয়েছে। ওঁকারের ভিতরে এই তিনই একত্রে সন্নিবিষ্ট। উপনিষদে আছে

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা
ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ধনু, আত্মা তীর, আর ব্রহ্ম তার লক্ষ্য; প্রমাদশূন্য হয়ে সেই লক্ষ্য ভেদ করে—তাঁতে শরবৎ তন্ময় হবে; জ্ঞানী ব্যক্তি ওঁকার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত অজর অমর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

আপনারা কেহ যেন এমন মনে না করেন যে কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য এই মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। এ মন্দিরের অবারিত দ্বার। সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে স্বাগত। আমি আপনাদের সকলকে আহ্বান করেছি—যখন-যাঁর-ইচ্ছা এখানে এসে আপন ইষ্টদেবতার ভজনা করতে পারেন। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে আর কিছু চান না—আমাদের প্রীতি—আমাদের আন্তরিক ভক্তি চান। গীতায় ভগবান বলিছেন—

ভক্তি সহ যে যা দেয়
পত্র পুষ্প ফল জল আর,
লই আমি সুপ্রসন্ন
ভক্তদত্ত সব উপহার।

গীতার অসাম্প্রদায়িক ভাবের জন্য এই গ্রন্থ আমাদের সকলেরই উপাদেয়, অতি আদরের সামগ্রী। গীতোক্ত আর একটী বচন দেখুন তাহা কেমন উদার, কেমন সারগর্ভ। সে বচনটি এই

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।

আমাকে যারা যে প্রকারে ভজনা করে, আমি সেই রূপে তাদের পরিতুষ্ট করি। লোকে যে কোন পথ দিয়ে যায়, আমাতে গিয়েই পৌঁছে।

"সেই একে নানা লোকে ভজে নানা মতে
কেহ খোঁজে এক পথে কেহ অন্য পথে।"

ভ্রাতৃগণ, এই বিষয়ে গোঁড়ামি ছেড়ে আমাদের উদারতা অবলম্বন করা উচিত। আমরা অল্পবুদ্ধি—অজ্ঞান; যিনি অনন্ত-জ্ঞান-সমুদ্র তাঁকে আমরা কতটুকু জানতে পারি। আমরা তাঁর স্বরূপের একদেশ মাত্র পেয়েই মনে করি এই বুঝি তাঁর সমস্ত। আপনারা অন্ধের দল ও হাতীর গল্প শুনিয়া থাকিবেন। জনকতক অন্ধ মিলে একটা হাতীর বর্ণনা আরম্ভ করে দিলে; তারা ত চখে দেখতে পায় না—স্পর্শ করে তাদের যা কিছু জ্ঞান লাভ হয়েছে। যে কাণে হাত দিয়েছে সে বলে এই জন্তু কুলার মতন; কেউ বলে এটা মূলার মতন; কেউ বলে থাম; কেউ বলে চামর; তার পুচ্ছ, দাঁত, শুঁড়, যে ভাগ যে ছুঁয়েছে, তা থেকেই তার হাতীর ধারণা। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদেরও অনেকটা এইরূপ। আমরা তাঁর একদেশদর্শী, অথচ আপনাদের সর্ব্বদর্শী মনে ভেবে আস্ফালন করি। আমি বলতে চাই না, আমি যতটুকু জেনেছি তাই সত্য, তার আর কোন দিক্ নেই, আর সকলই মিথ্যা, সকলই ভুল। সাধনা দ্বারা ঈশ্বরকে যে যতটুকু জানতে পেরেছে, সে সেই অনুসারে তাঁকে পূজা করে। তাই আমি বলছি আপনাদের যার যেমন বিশ্বাস থাকুক না কেন, এখানে এসে ভগবানের আরাধনা করবার কোন বাধা নেই। কেবল এখানে বিগ্রহের অভাব। এই মন্দিরে অদৃশ্য অরূপের দর্শন করতে হবে। ধ্যান দ্বারা সেই অমূর্ত্ত পুরুষের দর্শন অনেক অভ্যাস—অনেক সাধনা সাপেক্ষ। যিনি অমূর্ত্তের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, এই মন্দির তাঁর সাধনার প্রশস্ত স্থান।

এই মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? কেহ কেহ মনে করতে পারেন যে এর জন্য এত ব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা নষ্ট। কিন্তু বন্ধুগণ! তা নয়। আমরা অহর্নিশি বিষয়ার্ণবেই মগ্ন রয়েছি, পরমার্থ চিন্তার একটুও অবকাশ পাই না। আমাদের দৃষ্টি বহির্মুখী, অন্তর্দৃষ্টির আমরা সময় পাই না, আত্মহারা হয়ে দীনভাবে জীবন যাপন করি। সেটা কি ঠিক? অর্থের সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থের প্রতিও মনোযোগ করা কি আবশ্যক নয়? এ কালের জন্য আমরা যেমন ধনোপার্জনে ব্যস্ত, অনন্তকালের জন্য কি কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করা প্রার্থনীয় নয়? সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হতে নিবৃত্ত হয়ে ভূমা অমৃত-সাগরে এক একবার অবগাহন ক'রে যাতে আমরা সুস্থ সবল হতে পারি, তারই জন্যে এই সকল তীর্থ-স্থানের প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় সংসারানলে দীপ্তশিরা হ'য়ে যন্ত্রণা ভোগ করি, এখানে এসে সেই দীপ্তশিরার অভিষেকের সুযোগ হবে। রোগ-শোকে, নানা কারণে

আমাদের ঘোরতর অশান্তির মধ্যে বাস করতে হয়; এই মন্দিরে বিশ্রাম ক'রে শান্তি ও আরাম পাওয়া যাবে, এই উদ্দেশেই এই মন্দির বাঁধা হয়েছে—সিদ্ধিদাতা বিধাতা আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন।

আর এক কথা। এখানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। বৈদিক ঋষিরা হোম করতেন দেবতাদের প্রসন্নতা লাভের জন্য; যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ যাজ্ঞিকদিগকে প্রচুর ধন ধান্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করিতেন। এইরূপ আদান প্রদানের ভাবে হোম-যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হত। আমাদের হোম-যাগ জীবনের কর্ত্তব্য সাধন। কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের অব্যর্থ উপায়। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, প্রতিবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য—এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালন, দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধ পথ্যপ্রদান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, এই সকল কার্য্যই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য। এইরূপ যজ্ঞ-অনুষ্ঠানেই তাঁর প্রসাদ লাভ করা যায়। আপনারা এখানে এসে যা কিছু আধ্যাত্মিক রত্ন সঞ্চয় করবেন, মনে রাখবেন তা সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যয় করবার জন্য। আবার যদি কখন বিষয়-কোলাহল হতে দূরে গিয়ে শান্তির ক্রোড়ে ব্রহ্মানন্দ-রসপান করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে এই মন্দিরে এসে আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবেন।

নিখিল-বিশ্বের প্রতিষ্ঠা সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরকে অদ্য আমাদের এই নবগৃহে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। সেই সর্ব্বমঙ্গলালয় বিশ্বনিয়ন্তার কৃপায় এই গিরি-মন্দির নিত্য-বিমল-আনন্দের মধুর-ধ্বনিতে পূর্ণ হউক। নিত্য-পুণ্যের নির্ম্মল প্রভায় ইহা চিরকাল উজ্জ্বল থাকুক—ইহার মঙ্গল আরতির দিব্য-সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হউক। যিনি এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি তাঁহার দর্শনাগত নর-নারীদিগকে নিত্য তাঁহার কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন, পাপ-তাপ দুর্ব্বাসনা হইতে সর্ব্ব প্রকারে মুক্ত রাখুন। সেই কৃপাময় পরমপিতার কৃপাবারি এই মন্দিরের উপর নিয়ত বর্ষিত হউক এবং তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদে ইহা শাশ্বত শান্তির আলয় হইয়া থাকুক। তাঁহারই কৃপায় এই নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের চিত্তপটে নিত্যকাল দিব্য অক্ষরে লিখিত থাকুক যে

"তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা; এবং তাঁহাদের জীবনে এই মহা উপদেশ-বাক্য ফলিত হউক।

রাঁচী ব্রাহ্মসমাজে নববর্ষ উপলক্ষে

আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

আজ আমরা বিগত বৎসরের রাশি রাশি বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিতেছি—সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা পরমপিতা পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বারবার নমস্কার করি। যে বৎসর অতীত হল, তা থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করেছি? এক কথায় বলা যেতে পারে—সংসারের অনিত্যতা। আমরা স্থির জেনেছি যে এখানে শান্তি নেই, কেবলই পরিবর্ত্তন—সকলই অনিত্য, 'চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।' কিছুই স্থির নয়, এই শিক্ষা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে।

এই অস্থির প্রপঞ্চে স্থায়ী ধন কি? এর উত্তরে দুটি জিনিস নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। আত্মশক্তি ও ভগবদ্ভক্তি; এই দুইটি আমাদের অনন্ত জীবনের সম্বল। আমাদের জীবনে যে সকল বিচিত্র ঘটনা ঘটছে, তার মধ্যে আমাদের কখন উত্থান—কখন পতন। এই ঘোর সঙ্কটে আমাদের নেতা হচ্চে আত্মশক্তি। এই শক্তির প্রভাবে আমরা দুই প্রকারে সুরক্ষিত হই;—এক এই যে অশেষ প্রলোভন অতিক্রম ক'রে ঠিক পথে চলতে পারি। আমরা যদি মোহবশতঃ পাপপঙ্কে পতিত হই, তা থেকে উদ্ধার হবার জন্যও আত্মশক্তি প্রয়োজনীয়। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ উদয় হয়েছেন, তাঁরা আত্মপ্রভাবে অমরতা লাভ করেছেন। বুদ্ধদেব এই আত্মশক্তির প্রভাবে 'মার' কে পরাভব ক'রে বুদ্ধত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এই আত্মশক্তি পরিমিত। এমন কত ঘটনা আসছে যা আমাদের জীবনস্রোতকে আমাদের ইচ্ছার বিপরীত পথে বলপূর্ব্বক টেনে নিয়ে চলেছে; কত দৈবঘটনা যার উপর আমার কোন অধিকার নাই। তার মধ্যে যা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য সে হচ্চে মৃত্যু। গতবর্ষে মৃত্যুর কঠোর আঘাতে কত লোকে হাহাকার করছে। কেহ মাতৃহীন, কেহ পিতৃহীন, কেহ পুত্রশোকে কাতর, কেহ বন্ধুর বিচ্ছেদে ম্রিয়মান, কেহ প্রিয়তমা ভার্য্যা বিয়োগে অজ রাজার ন্যায় বিলাপ করছেন—

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
গান হল শেষ, ঋতু উৎসবহীন।

এই মৃত্যু ঘটনা অপরিহার্য্য, কিছুতেই আমরা একে প্রতিরোধ করতে পারি না। এর কাছে আত্মশক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত।

ঈশ্বর চান যে আমরা আত্মশক্তি জাগ্রত করে তাঁর শক্তি উপার্জ্জন করি—এই উদ্দেশে তিনি এই সংসারের পথ দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছেন। তিনি চান আমরা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে সেই পথ উত্তীর্ণ হতে পারি। কিন্তু আমরা পদে পদে উপলব্ধি করি আমাদের এই শক্তি কত পরিমিত। কত দিক্ দিয়ে কত প্রকারে তা প্রতিহত হচ্চে! আমাদের চিরন্তন সংস্কার, শিক্ষা, সঙ্গ ইত্যাদি নানা কারণে তার গতিরোধ হচ্চে; নানারকমে ঠেকে শেষে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, যে শুধু শক্তিতে ত্রাণ নেই, তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি চাই, কোন এক উচ্চতর পুরুষের উপর নির্ভর করা চাই, আপনাকে ছেড়ে ভগবানের শরণ গ্রহণ করা আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদিগকে এই সংসার-সঙ্কটে ফেলে রেখে আমাদের ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছেন, তা নয়। মাতা যেমন ক'রে শিশুকে পদচারণা শিক্ষা দেন, তিনি আমাদিগকে সেইরূপে শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন যে, যখনি আমাদের পদস্খলন হয়, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি, তাঁর হস্তধারণ করে অশেষ দুর্গতি হতে পরিত্রাণ পাই। ভ্রাতৃগণ! আমরা তাই এই নববর্ষের প্রারম্ভে পাপতাপে তাপিত হয়ে সান্ত্বনার জন্যে তাঁকে ডাকছি; রোগ-শোকে উৎপীড়িত হয়ে শান্তি-লাভের জন্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি, মৃত্যু-বিভীষিকায় ভীত হয়ে সেই অমৃতের অভয়বাণী ভিক্ষা করিতেছি। সেই রাজরাজেশ্বর আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন—হীনতা মলিনতা বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁর কাছে চল। 'নত কর উন্নত মস্তক। দূর কর সমস্ত

বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা, শান্ত হও, পবিত্র হও—তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফের।' আমরা আত্মানুসন্ধান করলে দেখতে পাই যে আমরা অন্তরে কোন না কোন গূঢ়-পাপ পোষণ ক'রে রেখে, কোন না কোন কু প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনাদের অধঃপাতের সূত্রপাত করেছি। কেহ আলস্যের দাস, কেহ লোভের, কেহ ক্রোধের অধীন। প্রতিজ্ঞা কর যে আজ হতে এইরূপ আসক্তি বিসর্জন দিয়ে জীবনের নূতন পৃষ্ঠা সুরু কর্‌বে। সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে সম্মুখে দেখে তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা কর—তিনি আমাদের প্রতিজ্ঞাপালনে সক্ষম করবেন। সাধু যার চেষ্টা, ঈশ্বর তার সহায়।

"সরল হৃদয় লয়ে চল সবে
অমৃতের দ্বারে, কত সুধা মিলিবে।
দুর্ব্বল সবল, ভীরু অভয়,
অনাথ গতিহীন হয় সনাথ,
সেই প্রেমশশী যবে মধু বরষে
সাধুর হৃদয়াধারে।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,
মঙ্গল।

আপনার প্রতি ও সাধারণের প্রতি।
পঞ্চম উপদেশ।

আমরা জানিয়াছি—নৈতিক হিসাবে, আমাদের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে; আমরা জানিয়াছি এই ভাল মন্দের প্রভেদ হইতেই অবশ্যকরণীয়তার উৎপত্তি—একটা নিয়মের উৎপত্তি—অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য সকলের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা এখনও জানিতে পারি নাই—এই কর্ত্তব্যগুলি কি? শুধু কর্ত্তব্য-নীতির সাধারণ মূলতত্ত্বটি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র, কার্য্যত ইহার কিরূপ প্রয়োগ হয়, এক্ষণে তাহাই দেখা আবশ্যক।

যদি, কোন সত্য অবশ্যকরণীয় হইলেই তাহা কর্ত্তব্য নামে অভিহিত হয় এবং যদি শুধু প্রজ্ঞার দ্বারাই সেই সত্য জানা যাইতে পারে তাহা হইলে, কর্ত্তব্য-নিয়মকে মানিয়া চলাও যা' প্রজ্ঞাকে মানিয়া চলাও তা'—একই কথা।

কিন্তু "প্রজ্ঞাকে মানিয়া চলা"—এই কথাটি বড়ই অস্পষ্ট ও সূক্ষ্মধারণামূলক। আমাদের কোন কার্য্য প্রজ্ঞার অনুসারী কিংবা প্রজ্ঞার অনুসারী নহে, তাহার কিরূপে নিশ্চয় হইবে?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রজ্ঞার একটি লক্ষণ সার্ব্বভৌমতা, আমাদের কার্য্য এই প্রজ্ঞার অনুসারী হইতে হইলে, এই কার্য্যেতেও কতকটা সার্ব্বভৌমের লক্ষণ থাকা আবশ্যক। আবার আমাদের কার্য্য-প্রবর্ত্তক অভিপ্রায়ের উপর আমাদের কার্য্যের নৈতিকতা নির্ভর করে; যদি কোন কাজ ভাল হয়, সেই কাজের অভিপ্রায় হইতেও প্রজ্ঞার লক্ষণ প্রতিভাত হয়। কি নিদর্শন দেখিয়া বুঝা যাইবে যে অমুক কাজ প্রজ্ঞার অনুসারী—কিংবা সেই কাজ ভালো? যদি কার্য্যপ্রবর্ত্তক কোন অভিপ্রায়কে বিশ্ববিধানের অন্তর্গত এমন একটি নীতি-সূত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে পার, যাহা প্রজ্ঞা সমস্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বাধীন জীবের অন্তরে স্থাপিত করিয়াছেন—তাহা হইলে বুঝিবে উহাই প্রজ্ঞানুস্থত কাজের নিদর্শন—ভাল কাজের নিদর্শন। তদ্বিপরীতই মন্দ কাজ। যদি তোমার কোন অভিপ্রায়কে সার্ব্বভৌম নিয়মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পার, তাহা হইলে বুঝিবে সেই কাজ ভালোও নহে মন্দও নহে,—উহা উপেক্ষণীয়। জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট এইরূপ মানদণ্ড প্রয়োগ করিয়া, কার্য্যের নৈতিকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ন্যায়ের কঠোর অবয়ব

পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যেরূপ যুক্তির দ্বারা সত্য ও ভ্রান্তি নির্ণয় করা হয়, সেইরূপ উক্ত নৈতিক মান-দণ্ডের দ্বারা, আমাদের কি কর্ত্তব্য, ও কি কর্ত্তব্য নহে, তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হয়।

প্রজ্ঞাকে অনুসরণ করা—ইহা নিজেই একটি কর্ত্তব্য; এই কর্ত্তব্যটি—প্রজ্ঞার সহিত স্বাধীনতার যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এমন কি, একথা বলা যাইতে পারে,—আমাদের শুধু একটিমাত্র কর্ত্তব্য, সেটি কি?—না প্রজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া চলা। কিন্তু মানুষ, বিচিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায়, এই সাধারণ কর্ত্তব্যটি, বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আমার নিজের সহিত আমার যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ এরূপ আর কাহারও সহিত নহে। অন্যান্য কার্য্যের যেরূপ নিয়ম আছে, সেইরূপ মানুষ যে সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও বিষয়, তাহারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে। এই শ্রেণীর কার্য্যের যে কর্ত্তব্য উহাই মানুষের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য।

প্রথম দৃষ্টিতে ইহা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় যে, নিজের প্রতি মানুষের আবার কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে।

মানুষ স্বাধীন বলিয়া, মানুষ আপনার নিজস্ব। আমার সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় কে?—না, আমি নিজে;—ইহাই আমার প্রথম স্বত্বাধিকার; ইহার উপর অন্যান্য স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত। স্বত্বাধিকারের মুল কথাটি কি?—না স্বত্বাধীকারী নিজ ইচ্ছা-মত তাঁহার সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারে, অতএব আমার নিজের সম্বন্ধে আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কি আমি করিতে পারি না?

না, তাহা পারি না। মানুষ স্বাধীন, নিজের উপর মানুষের অধিকার আছে বটে—তাই বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে, যে, মানুষ আপনার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। বরং মানুষের স্বাধীনতা আছে বলিয়াই,—বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমার মনে হয়, মানুষ তাহার স্বাধীনতার ও তাহার বুদ্ধির অবনতি সাধন করিতে পারে না। স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন করাই স্বাধীনতার অপব্যবহার করা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিঃ—স্বাধীনতা যে শুধু অন্যের নিকটেই পূজ্য তাহা নহে, উহা নিজের নিকটেও পূজ্য।

কর্ত্তব্যের উদার অনুশাসনে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে বর্দ্ধিত না করিয়া,যদি আমরা তাহাকে প্রবৃত্তির অধীন করিয়া রাখি, তাহা হইলে আমরা অভ্যন্তরস্থ এমন একটি জিনিসকে হীন করিয়া ফেলি, যাহা আমা-দের নিজের ও অপরের শ্রদ্ধার বিষয়। মানুষ একটা জিনিস নহে, সুতরাং নিজের প্রতি একটা জিনিসের মত ব্যবহার করি-বার অধিকার মানুষের নাই।

যদি আমার নিজের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে, তবে সে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য নহে—সে সেই স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কর্ত্তব্য—যে স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া আমার নৈতিক "পুরুষটি" সংগঠিত হইয়াছে।

কোন্ জিনিসটি আমাদের নিজের, এবং কোন্ জিনিসটি বিশ্বমানবের তাহা ভাল করিয়া নির্ণয় করা আবশ্যক। আমা-দের প্রত্যেকের অন্তরে মানবপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সমস্ত উপাদান-গুলি সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু এই সকল উপাদানগুলি বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির অন্তরে বিশেষ বিশেষ প্রকারে সন্নিবিষ্ট।

এই বিশেষত্ব হইতেই ব্যক্তি গঠিত হয় কিন্তু পুরুষ গঠিত হয় না। আমাদের অন্তরে যে পুরুষটি আছেন কেবল সেই পুরুষই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ও পবিত্র, কারণ সেই পুরুষই বিশ্বমানবের একমাত্র প্রতিনিধি। যাহাতে নৈতিক পুরুষের কোন আস্থা নাই, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে, তাহা উপেক্ষণীয়। ভালও নহে, মন্দও নহে—এই সীমা-গণ্ডির মধ্যেই আমি আমার যাহা অভিরুচি তাহা করিতে পারি, এমন কি আমার খেয়ালও চরিতার্থ করিতে পারি, কারণ উহার মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই নাই,—উহার মধ্যে ভালও নাই—মন্দও নাই। কিন্তু যখনই কোন কার্য্য, নৈতিক পুরুষের সংস্পর্শে আসে, তখনই আমার ইচ্ছা তাঁহার শাসনাধীনে স্থাপিত হয়,—প্রজ্ঞার শাসনাধীনে স্থাপিত হয়—যে প্রজ্ঞা স্বাধানতাকে কিছুতেই নিজের বিরুদ্ধে যাইতে দেয় না। তাহার দৃষ্টান্ত,—যদি আমি কোন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, কিংবা বিষাদের আবেগে, কিংবা আর কোন অভিপ্রায়ে, আমার শরীরকে অত্যন্ত নিগ্রহ করি, যদি দীর্ঘকাল অনিদ্রায় যাপন করি, সমস্ত নির্দোষ সুখ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করি, এবং এইরূপে যদি আমি আমার স্বাস্থ্যের হানি করি, জীবনকে বিপন্ন করি, বুদ্ধিবৃত্তিকে নষ্ট করি—তাহা হইলে এই সব কাজ আর উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তখন সেই সব কাজের পরিণাম স্বরূপ আমাদের রোগ, মৃত্যু, কিংবা উন্মাদ মহাপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, কেন না আমরা স্বেচ্ছাক্রমেই উহাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছি।

আমার অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষটিকে আমি শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য;—এই বাধ্যতা, এই অবশ্যকর্ত্তব্যতা আমি নিজে স্থাপন করি নাই, সুতরাং আমি নিজে উহাকে ধ্বংস করিতেও পারি না। চুক্তিকারী দুই পক্ষ রাজি হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যেমন স্বীয় চুক্তি রহিত করিতে পারে, সেইরূপ স্বেচ্ছাকৃত কোন চুক্তির উপর কি এই আত্মশ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত? এই চুক্তির দুই পক্ষই কি "আমি"?—না। ইহার এক পক্ষ আমি নহি—ইহার এক পক্ষ বিশ্বমানব—বিশ্বমানবের প্রতিনিধি আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষ। এবং এস্থলে ইহা কোন বন্দোবস্তও নহে, চুক্তিও নহে। নৈতিক পুরুষটি শুধু আমাদের অন্তরে আছেন বলিয়াই আমরা তাঁহার শাসন মানিতে বাধ্য;—তাঁহার সহিত আমাদের কোন বন্দোবস্ত নাই—কোন চুক্তি নাই। এ বাধ্যতার বন্ধন অচ্ছেদ্য।

আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষকে শ্রদ্ধা করা—এই সাধারণ মূলতত্ত্বটি হইতেই আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য সমুৎপন্ন। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

জাতিভেদ।

"জাতিভেদ" কথাটা মুখে আনিতেও আজকাল সংকুচিত হইতে হয়। অনেকে হয়ত বলিবেন, মানুষের আবার জাতিভেদ কি? সব মানুষ এক জাতি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষক ইংরাজ, অন্য এক প্রকার জাতিভেদ বর্ণন করেন সত্য, পরন্তু সে সকলের কোন প্রকার আচারভেদ থাকা বা হওয়া উচিত মনে করেন না। প্রাচীন হিন্দু ব্যবস্থাপকেরা উহার বিপরীতবাদী। হিন্দু মুনিঋষিরা যেমন জাতিভেদবাদী ছিলেন, তেমনি আচারভেদবাদীও ছিলেন। ইংরাজ বর্ণিত জাতিভেদ

কথা একরূপ, মুনিঋষিগণের বর্ণিত জাতিভেদ কথা অন্যরূপ।

ইংরাজ বলেন, পৃথিবীস্থ মনুষ্য প্রধানতঃ পাঁচ বর্ণে বিভক্ত। ককেশীয়, মোগল, মালাই, আমেরিক, ও আফ্‌রিক। উক্ত পাঁচ বর্ণের (জাতির) মধ্যে ককেশীয়বর্ণের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক। আফ্‌রিক বর্ণের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ ও ধর্ম্ম-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। জ্ঞানের বা বুদ্ধির ও অন্যান্য মানসিক শক্তির বাসস্থান মস্তিষ্ক; তাহারই অল্পতা ও আধিক্য ঐ প্রকার বর্ণভেদের কারণ। আফ্‌রিক বর্ণের লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষা ককেশীয় বর্ণের লোকের মস্তিষ্কপরিমাণে অনেক অধিক এবং সংস্থানেও কোন কোন অংশে অন্যরূপ। সেই জন্য ককেশীয় বর্ণের লোকেরা অধিক বুদ্ধিমান ও আফ্‌রিক বর্ণের লোকেরা হীন-বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত। বুদ্ধ্যাদির আধার মস্তিষ্ক পদার্থের ঐরূপ পরিমাণাদি অর্থাৎ ঐরূপ অল্পাধিক্য ও সন্নিবেশ সেই সেই দেশের ভৌম প্রকৃতির ও জল বায়ু প্রভৃতির প্রভাবে আত্মলাভ করে বা উৎপন্ন হয়। সুতরাং উক্ত প্রভেদ নির্ণয় সেই সেই দেশের নামঘটিত হওয়া সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে, ইত্যাদি।

প্রাচীন হিন্দু মুনিঋষিদিগের ব্যবস্থিত জাতিভেদ কথা এইরূপ,—

মনুষ্যসকল পঞ্চবর্ণে বিভক্ত। প্রথম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ক্ষত্রবর্ণ, তৃতীয় বৈশ্যবর্ণ, চতুর্থ শূদ্রবর্ণ এবং পঞ্চম বর্ণ নিষাদ অর্থাৎ ম্লেচ্ছবর্ণ। ইংরাজ পণ্ডিতদিগের বর্ণবিভাগব্যবস্থা মস্তিস্ক পদার্থের পরিমাণ গত অল্পাধিক্য ঘটিত; পরস্তু প্রাচীন ঋষিদিগের অভিহিত বর্ণবিভাগ, সত্ত্ব-রজ-স্তমঃ এই তিন গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ ঘটিত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতীয় দেহে সত্ত্বগুণের আধিক্য বা উৎকর্ষ, ক্ষত্রজাতীয় দেহে সত্ত্বগুণের তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অপকর্ষ, বৈশ্য বর্ণের দেহে তদপেক্ষা অধিক অপকর্ষ, শূদ্রদেহে আরও অধিক অপকর্ষ। ম্লেচ্ছদেহে উক্ত সত্ত্বগুণ একেবারে অভিভূত, ও রজ স্তমোগুণের প্রাবল্য দৃষ্ট বা লক্ষিত হয়। এই বেদোক্ত বর্ণভেদ-কথা ভগবদ্গীতায় "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম-বিভাগশঃ।" এই শ্লোকে অনূদিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পৌরাণিক নিবন্ধে ও প্রায় ঐরূপ বর্ণনা আছে। যথা—

মান্ধাতা নামক রাজা নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষে! শরীর-ত সকলেরই একবিধ। ঘর্ম্ম, মূত্র, পুরীষ শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত ইত্যাদি সকল শরীরেই সমান; তথাপি আপনি বলিতেছেন, মানুষ সব এক বর্ণের নহে। তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ বর্ণ-ভেদ আছে। ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি গুণৈস্তং বর্ণতাং গতম্॥

অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময়, সে ভাবে বর্ণ ভেদ না থাকিলেও, সত্ত্বরজস্তমো গুণের দ্বারা একই মনুষ্য বর্ণ বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছে।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিবেক নামক সংস্কৃত ভাষার একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, শিরোমজ্জা মস্তিষ্কের ভ্রূসন্নিহিত বিভাগে সত্ত্বাদি গুণের আবির্ভাব স্থান। যথা—

> "ভ্রূ-মধ্যে ত্রিদলং চক্রং আজ্ঞাসংজ্ঞং ফলানি তু।
> আবির্ভাবঃ সত্ত্বরজস্তমসাং ক্রমশোমতঃ॥"

ঐ গ্রন্থে মস্তিষ্কের আকার, সন্নিবেশ, বিবিধ বিভাগ ও সে সকলের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য ও ফলাফল বর্ণিত আছে। মস্তিষ্ক মণ্ডলের সেই সকল বিভাগ বা অংশ সংস্কৃত ভাষার পুস্তকে চক্র-সংজ্ঞায় ও পদ্ম-সংজ্ঞায়

উল্লিখিত হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এতদ্দেশীয় প্রাচীন মুনিঋষিদিগের নির্ণীত জাতিভেদ ব্যবস্থাও প্রকারান্তরে মস্তিষ্ক ঘটিত। সত্ত্বাদিগুণ কি? তাহা এখন ব্যবস্থাপক ঋষিদিগের উপদিষ্ট মনোবৃত্তি সমূহের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে। জগন্মূল সত্ত্বাদি এখন সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবার নহে।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ সত্ত্বাত্তু সাত্ত্বিকাঃ।
আস্তিকাঽশুরুধর্ম্মে চ রুচিপ্রভৃতয়ো মতাঃ॥"

আস্তিকী—অস্তি পরলোকাদিরিতি বুদ্ধিঃ। অশুরুঃ শুদ্ধঃ নির্ম্মলোবা ধর্ম্মঃ তত্র রুচিঃ প্রীতিঃ। প্রভৃতি শব্দেন অধর্ম্মান্নিবৃত্তি রুচ্যতে।

সত্ত্বাত্ রাজসাৎ ভাবাঃ কামক্রোধ মদাদয়ঃ॥
রাজসাৎ রজঃপ্রধানাৎ সত্ত্বাৎ।
"নিদ্রালস্য প্রমাদানি বঞ্চনাদ্যাস্তু তামসাঃ।"
নিদ্রা ইন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়ব্যাপারোপরমঃ।
আলস্যং ইষ্টসাধনেষ্বপি ব্যাপারেঽপ্রবৃত্তিঃ।
প্রমাদঃ বুদ্ধিকৌন্ন্যং নিরবধানত্বং বা
বঞ্চনা প্রসিদ্ধা। আদিপদাৎ পৈশূন্য প্রভৃতয়ঃ।
"প্রসন্নেন্দ্রিয়তারোগ্যাঽনলস্যাদ্যাস্তু সত্ত্বজাঃ।
আরোগ্যং রোগাল্পত্বং। যক্ষ্মকুষ্ঠাদি মহারোগাঽনাক্রান্তত্বমিতি।

শ্লোকগুলির ভাষানুবাদ এইরূপ—

সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ। সত্ত্ব গুণের ধর্ম্মে বা সামর্থে সাত্ত্বিক ভাব, রজোগুণের দ্বারা রাজস ভাব, তথা তমোগুণের প্রভাবে তামস ভাব সকল উৎপন্ন হয়। আস্তিকতা—বিশুদ্ধ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম্য বিষয়ে নিবৃত্তি, এ সকল ভাব সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বজাত। কাম, ক্রোধ, মদ ও উগ্রতা প্রভৃতি ভাব রজোগ্রস্ত সত্ত্বের প্রভাবে জন্মে। নিদ্রালুতা, অলসতা, প্রমাদ, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বোধ রাহিত্য প্রভৃতি তমোগুণের পরিণামে জন্মে।

ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা, রোগাল্পতা ও আলস্য শূন্যতা প্রভৃতি দৈহিকভাব গুলিও সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রভব। সত্ত্বগুণের আধিক্যে দেহের অভ্যন্তর ভাগেরও বৈলক্ষণ্য জন্মে। সে বৈলক্ষণ্য বোধ হয় শ্বেত ডিম্বেরই অল্পাধিক্যঘটিত। "শ্বেত ডিম্ব" নামটি আধুনিক সংকেত-প্রসূত, প্রাচীন নহে। অধুনা কালের ডাক্তারেরা রক্ত পদার্থের বর্ণনায় "শোণ বিন্দু" Red corpuscles 'মস্ত' Serum "শ্বেতবিম্ব" White globules "শ্বেতডিম্বাণু" White globulines, এই সকল নামের উল্লেখ করেন। ঐ সকল ইংরাজি নামের অনুভাষায় ঐ সকল বাঙ্গালা নাম প্রখ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ঐ সকল নাম নাই। না থাকিলেও, স্থূলতঃ বুঝা যায় যে, ঋষিরা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে শিরাবাহী আহারীয় রসের মধ্যে শুভ্রতার বিবৃদ্ধি দেখিতে পাইতেন। মহাভারতীয় বনপর্ব্বে একটি গল্প আছে। গল্পটি এইরূপ—

"মঙ্কণক নামা এক ঋষি অন্য এক ঋষিকে নিজ দেহে সত্ত্বাধিক্য দেখাইবার জন্য কুশতৃণের দ্বারা অঙ্গুলি বিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেই বিদ্ধ স্থান হইতে যে রস নির্গত হইয়াছিল তাহা ভস্মবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ।" সুতরাং আমরা বুঝিতে বাধ্য যে, সত্ত্ববিবৃদ্ধিতে রক্তগত শ্বেত ডিম্বের ও শ্বেত-ডিম্বাণুর বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার মাত্রেই বলিয়াছেন যে, "আহার শুদ্ধ্যা সত্ত্বশুদ্ধিঃ"। মদ্য মাংসাদি ত্যাগী নিরামিষ ভোজী ও পথ্যাশী মনুষ্যের দেহস্থ সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তমোগুণের দ্বারা অনাচ্ছন্ন হয়। শুদ্ধসত্ত্বদেহের কান্তি ও মুখশ্রী অন্যবিধ হয় এবং মনও অন্যাপেক্ষা অনেকটা প্রশান্ত হয়। এ কথা শাস্ত্রলেখকদিগের, আমাদের নহে। আমরা এতাবন্মাত্র দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যে, নিরামিষভোজীদিগের রক্তে প্রাগুক্ত শ্বেতডিম্বের ও শ্বেত

ডিম্বাণুর ভাগ অধিক। আমার এক বন্ধু এক সময়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। এখন তিনি একজন খ্যাতনামা ভাল ডাক্তার। ইনি ছাত্রাবস্থায় মৎস্য মাংসত্যাগী ও হবিষ্যভোজী ছিলেন।

ইনি এক দিন বলিলেন, সাহেবেরা বলে, নিরামিষ ভোজনে শরীরের শোণ বিন্দু কমিয়া যায় এবং শ্বেত-ডিম্বের ভাগ বৃদ্ধি পায়। তুমি নিরামিষ ভোজী, সেজন্য তোমার শরীরস্থ রক্তে শ্বেত-ডিম্বের ভাগ বেশী। এই বলিয়া তিনি তাঁহার ও আমার শরীর হইতে রক্ত বাহির করিলেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা নিজের উক্তি সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। ডাক্তার পুরেন্দ্র মোহনের ঐ কথা স্মরণ হওয়ায়, এখন মনে হইতেছে, শুদ্ধসত্ত্ব দেহের রক্তাদি আর রজস্তমোপ্রবল শরীরের রক্তাদি একরূপ ও একধর্ম্মাক্রান্ত নহে। পরন্তু ভিন্ন রূপ ও ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত। যে সময়ে এ দেশে জাতিভেদ ব্যবস্থা প্রাতষ্ঠাপিত হইয়াছিল, সে সময়ে অভিহিত প্রকারের গুণভেদকৃত শরারের ও মনোবৃত্তির প্রভেদ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ, এই পাঁচ জাতি নির্ণয়ীকৃত হইয়াছিল। ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, জাতিভেদের মূল গুণভেদ, এবং গুণভেদের মূল ভৌম প্রকৃতি। পুরাকালে এ দেশের জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতিরই প্রভাবে ঐরূপ বিভিন্ন গুণের ও তদনুযায়ী বিভিন্নজাতীয় মানবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগের সহিত এই আর্য্য-ভূভাগের তুলনা হয় না। অন্যান্য ভূভাগে তিন ঋতু এবং এই ভূভাগে ছয় ঋতু। অন্যান্য ভূভাগে মনুষ্যের বল বর্ণাদি প্রায় এক প্রকারের। এখানে সাদা, কাল, লাল, পীত সকল বর্ণের মানুষ দেখা যায়। অন্যান্য দেশে এরূপ বিচিত্র বর্ণের মানুষ দেখা যায় না। এ দেশে যেমন বিবিধ জাতীয় শস্যাদির ফসল জন্মে, অন্যান্য দেশে এরূপ বিবিধ জাতীয় শস্যাদি জন্মে না। এতদ্দৃষ্টান্তে বুঝা উচিত যে, এ দেশের ভৌম প্রকৃতির প্রভাবেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ, এই পাঁচ জাতি মানব জন্মে। মানুষও শস্যাদির ন্যায় ভূমির ফসল বিশেষ।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

এই শ্লোকের লিখিত নবগুণ অনুসারে প্রথমতঃ এ দেশে কয়েক জন ব্রাহ্মণ কুলীন হইয়াছিলেন। পরে তদ্বংশীয়েরা উক্ত গুণে গুণী হইতেন এবং কুলীন বলিয়া গণ্য মান্য হইতেন। ক্রমে সেই কৌলিন্য বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। বংশগত হওয়ায় অকুলীন অর্থাৎ কোন গুণ না থাকিলেও এখন তদ্বংশীয়েরা কুলীন বলিয়া গণ্য হইতেছেন। এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক আমরা বলিতেছি, আদিম কালের বর্ণভেদ সত্ত্বাদি গুণের অল্পাধিক্য অনুসারেই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। পরন্তু সে ভেদ এখন বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। এখন সেরূপ ব্রাহ্মণত্ব না থাকিলেও, শরীরে সত্ত্বাদি গুণের উৎকর্ষ না থাকিলেও, ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। যদিও ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদের কারণীভূত মূলতত্ত্ব এখন বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত, তথাপি এখনও ব্রাহ্মণজাতীয় দেহের সহিত অন্য জাতীয় দেহের অসমানতা বুঝিবার একটী পরীক্ষা বিদ্যমান আছে। পরীক্ষা এই যে, সকল দেহই দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন হাত, পরন্তু ব্রাহ্মণের দেহ অনধিক অর্দ্ধ অঙ্গুলি বড়।

এই বঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরও কায়স্থের কুলস্থান কনোজ ও কুলপুরুষ কনোজিয়া। পরন্তু কালের পরিবর্ত্তন,

ভূমির স্বভাব, জল ও বায়ুর প্রভাব, আহার ব্যবহারের ব্যতিক্রম ও সংসর্গের শক্তিতে ইহারা এখন জাত্যন্তরে পরিণত হইয়াছে। এখন ইহারা বাঙ্গালী জাতি, কনোজিয়া জাতি নহে। আকার প্রকার চালচলন শ্রী সৌষ্ঠব সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন কোন বাঙ্গালী কনোজিয়া মধ্যে লুকায়িত থাকিতে পারেন না। দর্শকদিগের দৃষ্টিতে ধরা পড়েন। এখন যদি কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ, সেই আদিম কালের ব্রাহ্মণ, বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে এ কালের ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে লুকায়িত থাকিতে পারিতেন না, দর্শকদিগের দৃষ্টিতে ধরা পড়িতেন। (ক্রমশঃ)

চৈতন্য।

কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
প্রকাশিত যাহা মানব জীবনে
এ বিশ্বের মাঝে অতি অপরূপ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
যে চেতনা পেয়ে মনুষ্য জীবন,
হয়েছে এমন অমূল্য রতন,
জল স্থল সবে করিয়ে আপন
হেরিতেছে তাহে আপন স্বরূপ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
পাইবারে এই দুর্লভ চেতনা,
করেছে জগত অপূর্ব্ব সাধনা,
হইয়ে সফল আজি সে কামনা
উদিয়াছে ভবে এ মানব রূপ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
মনুষ্য আবার এ চেতনা পেয়ে
খুঁজিছে তাহার পরম আশ্রয়ে
তার সমাচার এবে নাহি লয়ে
মানব চেতনা হবে না বিমুখ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ!
চৈতন্য সাগরে ডুবিবার তরে,
হেরিতে তাঁহারে পরিপূর্ণাকারে,
বিচিত্র আকারে মানব অন্তরে
হতেছে কতই সাধনা উন্মুখ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ।
মানব জীবনে হইবে যখন,
সব সাধনার শুভ-সম্মিলন,
পরম চেতন রবে না স্বপন,
প্রকাশিত হবে সবার সম্মুখ।
কে জানে এ চেতনা কিরূপ!

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

এ জগতে মোর আর কিবা আছে বল,
শুধু 'ভালবাসা' তাই জীবনে সম্বল।
সেই ভালবাসা-দীপ পথ দেখাইয়া,
তোমা পানে টানিতেছে এই ক্ষুদ্র হিয়া।
প্রথমেতে বিন্দু বিন্দু বারি ধারা সম,
জাগিয়া উঠিল তাহা এ হৃদয়ে মম।
ক্রমে স্রোত ধারা বয় তটিনী সমান,
দুকূল ভাসায়ে টেনে লয়ে যায় প্রাণ।
তার পর হল প্রাণ ক্ষুব্ধ সিন্ধু প্রায়,
আকুল উচ্ছ্বাসি যেন কোন মুখে ধায়।
শুধু বুক ভরা আহা আকুল কামনা,
কাহারে সর্ব্বস্ব সঁপি হারাতে আপনা।
কোথা কামনার লক্ষ্য কোথা সে আমার,
দয়াময় সে যে তুমি, কেহ নহে আর।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

জগদীশ কত সুখ লভি এ জীবনে
যদি সব সুখ দুঃখ, সঁপিও চরণে।
যদি মনে স্থির জানি
উপরেতে অন্তর্য্যামী
তুমি আছ, চেয়ে আছ স্নেহের নয়নে
ঢালিতেছ প্রীতি ধারা স্নেহ প্রেম জ্ঞানে।
প্রতিদিন সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে,
কত অশ্রু ঝরে, লভি ব্যথা হৃদয়েতে,
জাগে কত শত ভয়,
কেন না মঙ্গলময়
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া করি নির্ভর তোমাতে,
দুঃখ ব্যথা সঁপি থাকি স্নেহে ও শান্তিতে।
করজুড়ি অর্পণ যদি বেদনার ভার
পরিশ্রান্ত লভি শান্তি, আনন্দ অপার।
মোর দুঃখ ভার দিয়া,
জুড়ায় তাপিত হিয়া,
জানি মনে দয়াময় তুমি আছ যার,
কি ভয় বিপদ দুঃখ জ্বালায় তাহার।

বিশ্বাসেতে পূর্ণ হয়ে কেন না তোমারে,
ডাকি সদা! কেন সদা হৃদয় মাঝারে
জাগিছে চঞ্চল ভয়?
এই সারা বিশ্বময়
তোমারি প্রীতিতে ভরা, কুসুমের থরে,
ঝরে প্রীতি, জাগে প্রীতি বিহঙ্গের স্বরে।
এই অবিশ্বাস পূর্ণ আমার হৃদয়
তোমাতে নির্ভর করি হোক তোমাময়।
ওই কুসুমের মত
পালি জীবনের ব্রত
লভি বিহঙ্গের মত কণ্ঠ সুধাময়
গাহি প্রভু তব নাম, গাহি তব জয়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানা কথা।

মৃত্যু সংবাদ—

বিগত ১৮২২ শকের পবিত্র মাঘোৎসবের দিনে ভারতমাতা সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বিয়োগ সংবাদ আমরা ঘোষণা করিয়াছিলাম। আজ আবার প্রায় দশ বৎসর পরে ভারতসম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রদান করিতে হইতেছে। বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, শান্তির প্রতিমূর্ত্তি, উদার হৃদয় মহাপ্রাণ মহারাজা সমস্ত পরিজনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া, অসংখ্য প্রজাবর্গের রাজভক্তি তুচ্ছ করিয়া বিগত ২৩ এ বৈশাখ রাত্রি এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে সমস্ত ভারত আজ শোকসমাচ্ছন্ন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তুলনায় সত্যসত্যই তিনি অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহার পরমায়ু ৬৯ বৎসরের অধিক হয় নাই। সর্দ্দিরোগ ভীষণাকার ধারণ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার প্রাণান্ত ঘটাইল। তিনি সমস্ত রাজসম্পদ পরিহার পূর্ব্বক ললাটের মাণিকামণ্ডিত মুকুট অবতারণ করিয়া একাকী সেই বিশ্বভুবনের নিস্তব্ধ মহাসভায় গমন করিলেন। মৃত্যু ত সংসারে যাতায়াত করিতেছে; কিন্তু যখন তাহার বিপুল বিক্রম দুর্গম রাজসিংহাসনের উপর প্রতিফলিত দেখি, তখনি আমরা ভয়ে বিস্ময়ে সন্ত্রস্ত হই। মৃত্যু আজ তাহার প্রচণ্ড প্রতাপ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিতেছে, এখানকার নশ্বরতা মুক্তকণ্ঠে বিঘোষিত করিতেছে এবং সেই অচঞ্চল ধ্রুব ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছে। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সংসিদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার চরণের ছায়াতে আমাদের পিতৃসদৃশ সম্রাটের পরলোকগত আত্মাকে স্থান দিন, তাঁহার শোকসন্তপ্ত মহিষীর অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করুন, নব-সম্রাটের অন্তরে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রজাবাৎসল্য প্রেরণ করুন, চরিত্রের বিকাশে অন্তঃস্ফূর্ত্ত রাজভক্তি আকর্ষণ করিবার শক্তি দিন, নবমহিষীর অন্তরে কারুণ্যরস বিতরণ করুন, অসংখ্য প্রজাবর্গের সম্মুখে তাঁহার নিকলঙ্ক মাতৃমূর্ত্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিন, সেই পরম সম্রাটের নিকট আমাদের ন্যায় দীন প্রজার এই কাতর নিবেদন।

প্রার্থনা—বিগত ২৮ এ বৈশাখ বুধবারের উপাসনায় আদি-ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে সম্রাটের পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, অগ্রহায়ণ মাস।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৭১।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩২৩২৸ ৬
সমষ্টি	...	৩৫০৪ ৶৬
ব্যয়	...	৩২৮॥৶৩
স্থিত	...	৩১৭৫॥ ৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৫৭৫॥ ৩

৩১৭৫॥ ৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে
পাওয়া যায়
২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১৶০
পুস্তকালয়	...	২॥৵০
যন্ত্রালয়	...	৫৭॥৵০
সমষ্টি	...	২৭১।৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৪।৵৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২।০
পুস্তকালয়	...	৮।/৩
যন্ত্রালয়	...	৯৮ ৶৯
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৫ ৶৬
সমষ্টি	...	৩২৮॥৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৭৭১॥৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩১৭৫॥ ৩
সমষ্টি	...	৩৯৪৭৶৯
ব্যয়	...	৪৫৩৵৩
স্থিত	...	৩৪৯৪/৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
অদি·ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৮৯৪/৬

৩৪৯৪/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০৪৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৲

২০৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩॥০
পুস্তকালয়		১৭৶০
যন্ত্রালয়	...	৫৪৭৻৬
সমষ্টি	...	৭৭১॥৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭২৷৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২ ৴৯
পুস্তকালয়	...	৷/৬
যন্ত্রালয়	...	২৪৫৶৬
ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট	...	৩৲
সমষ্টি		৪৫৩৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

প্রাপ্তি স্বীকার।

একবালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র
১০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
২৲

" " সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৲

" " সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৲

" " অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৲

" " যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১৲

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী
২৲

" সুহাসিনী দেবী
২৲

" নীপময়ী দেবী
১৲

" প্রফুল্লময়ী দেবী
১৲

" চারুবালা দেবী
১৲

" ললিতা দেবী
১৲

" কমলা দেবী
১৲

" অলকা দেবী
১৲

" সুকেশী দেবী
১৲

" ইরাবতী দেবী
১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন
১০৲
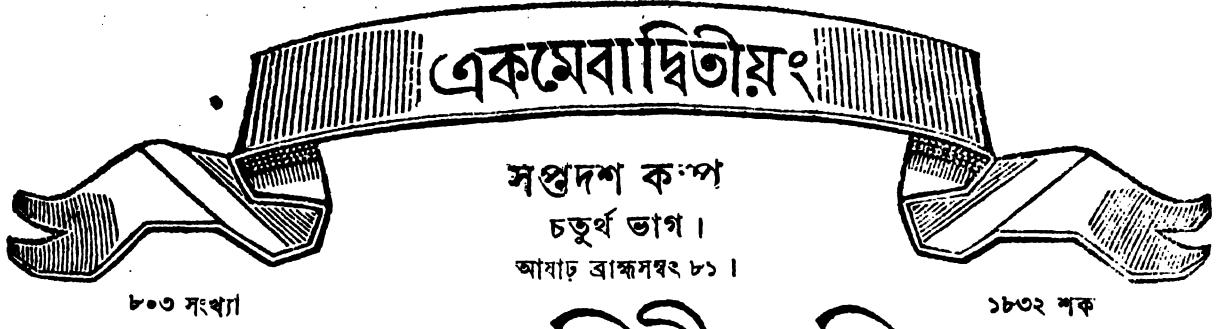
সপ্তদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।

৮০৩ সংখ্যা | ১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সম্রাটের মৃত্যু উপলক্ষে উপাসনা।

ভারত সম্রাটের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার পরলোক গত আত্মার কল্যাণ জন্য বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তিন দলের ব্রাহ্মগণ একত্র হইয়া সম্মিলিত ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবু উদ্বোধন করেন এবং সে দিনের বিশেষ উপাসনার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। সত্যেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কয়েকটি সময়োপযোগী সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। উহার মধ্যে একটি সঙ্গীতের স্বরলিপি নিম্নে প্রকাশিত হইল। সেদিনের কার্য্য হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

"অদ্য আমরা এক বিপুল শোকের তাড়নে মর্ম্মাহত হইয়া সেই শোকের উচ্ছ্বাসে এই পবিত্র স্থানে সকলে মিলিত হইয়াছি। কিছু দিন পূর্ব্বে কে জানিত যে কাল প্রতীক্ষা করিয়া আছে, অচিরাৎ আমাদের সম্রাটকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। আমরা কোথায় আশা করিতেছিলাম, যে রাজ্যের আসন্ন বিপ্লবে রাজা দুই প্রতিদ্বন্দীদলের মধ্যস্থ হইয়া সকল গোলযোগ মিটাইয়া দিবেন, এমন সময় এক বলবত্তর সম্রাট আসিয়া তাঁহাকে কোথায় অদৃশ্যের মধ্যে লইয়া গেল। সহসা তিনি আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অমৃত-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনার জন্য এখানে আসিয়াছি। যিনি সমস্ত জগতে শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, আমরা আজ তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার রাজত্বকালে অনেক বিশেষ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সমালোচনা করিবার সময় ইহা নহে; কিন্তু ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিস্থাপন তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন,

এবং তাঁহার প্রতিভার প্রভাবে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মধ্যে সখ্যবন্ধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আমরা আশা করি যেন সেই শান্তির বন্ধন কিছুতেই ভাঙ্গিয়া না যায়।

ভারতের প্রতি তাঁহার স্নেহ দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁহার মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতবাসীকে স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র প্রতি অক্ষরে তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ নিজ চক্ষে সন্দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। তখন হইতে ভারতের উপর তাঁহার মমতা অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই কারণেই তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র বর্ত্তমান সম্রাটকে ভারতদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও এদেশীয় রাজগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখানে তিনি যে ভাবে কয়েক দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এদেশের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক মমতা ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যাহাতে রাজা প্রজার মধ্যে সহানুভূতি রাজ্যতন্ত্রের মূলমন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; এই তাঁহার একান্ত কামনা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে বিগত সাম্রাজ্যের ন্যায় আমাদের নবীন সম্রাটের উদীয়মান সাম্রাজ্য সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত ও জয়যুক্ত হউক এবং তিনি দীর্ঘ-জীবী হইয়া এই সুবিশাল রাজ্যতরী যথানিয়মে পরিচালন করুন।

সেই রাজেশ্বর যিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। তিনি এই মৃত্যুময় সংসারের পরপার সেই পুণ্যধামে শান্তি সুখ উপভোগ করুন। সেই পরলোকগত রাজার যে সুচরিত, তাঁহার ধৈর্য্য বীর্য্য আত্মত্যাগ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা—তাহার স্মৃতি আমরা ধারণ করিতেছি। তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার সেই পবিত্র স্মৃতি আমাদের অন্তরে চির জাগরূক থাকিবে। তিনি যখন রোগে দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন, জীবন ধারণ তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও তিনি কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত হন নাই, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুর উপরে আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু আমরা মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারি, যদি আমরা জীবনের কর্ত্তব্যের প্রতি বিমুখ না হই। কর্ত্তব্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিতে পারি। পরলোকগত সম্রাট যখন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, কত বিঘ্ন বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পরম আরাধ্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদর্শ অবলম্বন করিয়া সকল কার্য্যে সুদক্ষ ও জয়যুক্ত হইলেন। মাতার নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইল। তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, পরবর্ত্তী লোকদের জন্য তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গেলেন। শুধু নিজের রাজ্যে নয়, সমস্ত সভ্য জগতে তাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পিতার পথ অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, ইহা সামান্য শুভচিহ্ন নহে। সেই পুরাতন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের সহিত আমাদের স্মৃতির যোগ রহিয়াছে, আর এই নবীন

সম্রাটে আমাদের আশা সমাশ্রিত। তাঁহার উপর আমরা যে আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছি, তিনি আমাদের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়া সেই আশা পূর্ণ করুন। যেন তাঁহার পুণ্যব্রত পিতার দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্র শান্তি রক্ষার জন্য প্রহরী রূপে নিযুক্ত থাকেন। অবশেষে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে যিনি সকল শান্তির আলয়, তিনি সকলের অন্তরে শান্তি প্রেরণ করুন। আর যিনি প্রিয়পতির সদ্য বিয়োগে শোকতাপে জরজর, সেই যে কল্যাণময়ী রাজ্ঞী আলেকজাণ্ড্রিয়া, তাঁহাকে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? তাঁহার এই ঘোর দুঃখ-দুর্দ্দিনে মানুষের সান্ত্বনা-বাক্য কি করিতে পারে? সেই সর্ব্বসন্তাপহারী করুণাময়ের নিকট আমাদের কাতর ক্রন্দনে এই নিবেদন যে তিনি পতিবিয়োগ-বিধুরা দুঃখিনী বিধবার অশ্রুজল মুছাইয়া দিন—তাঁহার অন্তরে অজস্র ধারে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া তাঁহার সকল সন্তাপ দূর করুন, রাজ-পরিবারের সকলের অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করুন।

হে ভগবন্! আমাদের কিসে ভাল কিসে মন্দ হয় তাহা আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার যা' বিধান তাহাই মঙ্গল বিধান, তুমি সুখই দাও দুঃখই দাও, আমরা যেন তোমাতে বিশ্বাস না হারাই। তোমার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা যে পরলোকগত সম্রাটের কল্যাণ কর, যাহারা শোকার্ত্ত তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ কর। আমরা রাজা প্রজা সকলে তোমার সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে তোমার আনন্দ-ধামের উপযুক্ত হইতে পারি, তুমি আমাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। সকলকেই তোমার কল্যাণ-পথে লইয়া যাও, জোড়করে তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রভাতী—ঝাঁপতাল।

যাওরে অনন্ত ধামে মোহতাপ পাসরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চলেছে প্রবাহি॥

যাওরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,
শ্রান্তিহর শান্তিময় বিরাম-বিতানে।
দেবঋষি, রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে॥

যাওরে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও তুমি, যাও সেই দেব সদনে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {গা -া। গা গা সা। গা -া। রা সা সা I ন্‌া সা। রা -া গা।
যা ০ ও রে, অ ন ০ ন্ত, ধা মে দে হ তা ০ প

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। রা -পা। মা গা -া I সা -া। রা রা -পা। পা -ধা। পা মা মা I
পা ০ স রি ০ দুঃ ০ খ, আঁ ০ ধা ০ র, যে থা

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I গা গা। রসা রা -গা। রসা -া। -া -া -া}I {রা মা। মা মমা -পা।
কি ছু ই, না ০ হি ০ ০ ০ ০ জ রা না হি০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা পা। পা পা পা I পা -দা। দা দা ণদা। পা -দপা। মা পা -া} I
ম র ণ, না হি শো ০ ক, না হি০ যে ০০ লো কে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I {মা মগা। মা মা -দা। পা -দা। পা মা মপা I মা গা। গা রসা -া।
কে ব০ লি, আ ০ ন ০ ন্দ, স্রো ত০ চ লে ছে প্র০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। রগা -মপা। মা -া -া} I {গা -া। গা গা সা। গা -া। রা সা সা I
বা০ ০০ হি ০ ০ যা ০ ও রে অ ন ০ ন্ত ধা মে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ন্‌া সা। রা গা -মগা। রা -পা। মা গা -া I সা -া। রা পা পা।
অ মৃ ত নি ০০ কে ০ ত নে ০ শ্রা ০ ন্তি হ র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পপা -ধা। পা মা মপা I মা পা। রসা রা -গা। রগরা -া। সা -া -া} I
শা০ ০ ন্তি ম য়০ বি রা ম বি ০ তা০ ০ নে ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I {রা -মা। মা মা মমপা। পা -া। পা পা পা I পা -দা। দা দা ণদা।
দে ০ ব ঋ ষি০০ রা ০ জ ঋ্‌ষি ব্র ০ হ্ম ঋ ষি০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা -দপা। মা পা -া } I {মা -গা। মা দা দা। পা -দা। পা মা মপা I
যে ০০ লো কে ০ ধ্যা ০ ন ভ রে গা ০ ন ক রে০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I গাঃ -রঃ | সা রগা -মপা | মা -া | -া -া -া } I {গা -া | গা গা সা |
এ ০ ক তা০ ০০ নে ০ ০ ০ ০ যা ০ ও রে অ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| গা -া | রা সা সা I ন্‌া -সা | রা গা মগা | রা -পা | মা গা -া I
ম ০ স্ত ধা মে জ্যো ০ তি র্ম্ম য়০ আ ০ ল য়ে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I সা -া | রা রা পা | পা পধা | পা মা মা I গা -া | রসা রা -গা |
শু ০ ভ্র সে ই চি র০ বি ম ল পু ০ ণ্য কি ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| রগা -া | রসা -া -া } I { রা -মা | মা মা মপা | পা -া | পা পা পা I
র ০ ণে ০ ০ যা ০ য়, যে থা০ দা ০ ন ব্র ত

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা -দা | দা দা ণদা | পা -দপা | মা পা -া.} I { মা -গা | মা দা দা |
স ০ ত্য ব্র ত০ পু ০০ ণ্য বা ন্‌ যা ০ ও তু মি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| পা -দা | পা মা মপা I গা গরা | সা রগা -মপা | মা -া | -া -া -া } II II
যা ০ ও সে ই০ দে ব০ স দ০ ০০ নে ০ ০ ০ ০

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন।

—*—

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

মঙ্গল।

আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)

যে কর্ত্তব্যটি সর্ব্বপ্রধান, যে কর্ত্তব্যটি আর সমস্ত কর্ত্তব্যের উপর আধিপত্য করে, সে কর্ত্তব্যটি কি?—না আপনার প্রভু হইয়া থাকা। দুই প্রকারে আপনার উপর প্রভুত্ব আমরা হারাইতে পারি;—এক কাম ক্রোধ প্রভৃতি উন্মাদনী প্রবৃত্তি সমূহের দ্বারা নীয়মান হইয়া, আর এক—বিষাদ প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া। উভয়ই সমান দুর্ব্বলতা। আমার নিজের উপর ও সমাজের উপর উহাদের কিরূপ কার্য্যফল, তাহা এস্থলে আমি কিছুই বলিতেছি না। উহারা স্বতই মন্দ; কেন না, উহারা মানুষের প্রকৃত গৌরবের উপর আঘাত করে, স্বাধীনতার লাঘব করে, বুদ্ধিকে বিক্ষুব্ধ করে।

অগ্রপশ্চাদ্ বিবেচনা বা পরিণাম-বুদ্ধি—ইহা একটি উচ্চতর সদ্‌গুণ। আমি সেই সুবিবেচনার কথা বলিতেছি, যাহা সকল কাজেরই মানদণ্ড স্বরূপ, সেই প্রাগ্‌দৃষ্টি, সেই দূরদৃষ্টি—যাহা বীরত্বনামধারী "গোঁয়ার্ত্তিমি" হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করে; বীরত্বনামধারী এইজন্য বলিতেছি, কেননা, কখন কখন, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতাও এই নামটি অন্যায়রূপে দখল করিয়া থাকে। বীরত্ব যুক্তির দ্বারা চালিত না হইলেও বীরত্বকে যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই। আমরা সময়ে সময়ে বীর হইতে পারি, কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবনে, সুবিবেচক ও পরিণামদর্শী হইতে পারিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের জীবনের রাশরজ্জু আমাদের হাতে থাকা চাই, উপেক্ষা কিংবা গোঁয়ার্ত্তিমির দ্বারা আমরা যেন অনর্থক বাধা বিঘ্ন প্রস্তুত না করি, অনর্থক নূতন বিপদের সৃষ্টি না করি। অবশ্য, সাহসী হওয়া প্রার্থনীয়, কিন্তু এই পরিণামদর্শিতাই—সাহসের মূলতত্ত্ব না হউক, সাহসের একটা নিয়ম; কেননা, প্রকৃত সাহস একটা অন্ধ আবেগ মাত্র নহে; ইহা মুখ্যত ধীরতা,—বিপদকালে বিচলিত না হওয়া, আপনার উপর দখল হারাইয়া না ফেলা। এই পরিণামবুদ্ধি, মিতাচারিতা সম্বন্ধেও শিক্ষা দেয়; ইহা আমাদের আত্মার সেই সাম্যভাব রক্ষা করে, যাহার অভাবে আমরা ন্যায়কে ঠিক্ চিনিতে পারি না, ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতে পারি না। পুরাকালের লোকেরা এই জন্যই পরিণামদর্শিতাকে সকল সদ্‌গুণের জননী ও রক্ষক বলিতেন। এই পরিণামবুদ্ধি, সুবিবেচনার দ্বারা স্বাধীন ইচ্ছাকে পরিশাসন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে; আবার যে স্বাধীনতা বুদ্ধিবিবেচনার হাত-ছাড়া হয়, তাহাই অবিমৃষ্যকারিতার নামান্তর; একদিকে, সুশৃঙ্খলা, আমাদের মনোবৃত্তির পরস্পরের মধ্যে উচ্চনীচতা-অনুসারে ন্যায্য অধীনতা সংস্থাপন; অন্য দিকে উচ্ছৃঙ্খলতা, অরাজকতা ও বিদ্রোহিতা।

সত্যবাদিতা আর একটি মহদ্‌গুণ। সত্যের সহিত মনুষ্যের যে একটা স্বাভাবিক বন্ধন আছে, মিথ্যাবাদিতা সেই বন্ধন ছেদন করিয়া মনুষ্যের গৌরব নষ্ট করে। এই জন্যই মিথ্যা কথনের ন্যায় গুরুতর অপমান আর নাই এবং এই জন্যই অকপটতা ও ঋজুতা এত সম্মানিত হইয়া থাকে।

আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষের

যাহা সাধন-যন্ত্র সেই সাধন যন্ত্রকে আঘাত করিলে, স্বয়ং নৈতিক পুরুষটিকেই আঘাত করা হয়। এই অধিকারসূত্রেই, স্বকীয় শরীরের প্রতি মানুষের কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য আছে। এই শরীর আমাদের একটা বাধাও হইতে পারে, একটা সাধনোপায়ও হইতে পারে। যাহার দ্বারা শরীর রক্ষা হয়, শরীরের বলাধান হয়, তাহা যদি শরীরকে না দেওয়া হয়, যদি শরীরকে অতিমাত্র উত্তেজিত করিয়া, তাহা হইতে অধিক কাজ আদায় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে শরীর অবসন্ন হইবে, শরীরের অপব্যবহারে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। আবার যদি শরীরকে বেশী প্রশ্রয় দেও, যদি তাহার সমস্ত উদ্দাম বাসনাকে চরিতার্থ করিতে দেও, যদি তুমি শরীরের দাস হইয়া পড়—সে আরও খারাপ। যে শরীর আসলে আত্মার দাস সেই শরীরকে যদি দুর্ব্বল করিয়া ফেল, তাহা হইলে আত্মারই হানি করা হইবে; আরও হানি করা হইবে যদি আত্মাকে শরীরের দাস করিয়া ফেল।

কিন্তু আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষটিকে সম্মান করিলেই যথেষ্ট হইবে না, উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট হইতে যেমনটি পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের হাতে যাহাতে প্রত্যর্পণ করিতে পারি,তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। আবার নিত্য সাধনা ব্যতীত এই বিষয়ে সুসিদ্ধ হওয়াও সুকঠিন। প্রকৃতিরাজ্যে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, নিকৃষ্ট জাবেরা, ইচ্ছা না করিয়া, ও না বুঝিয়া, বিনাচেষ্টাতেই স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট বিকাশ লাভ করে। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে অন্যরূপ নিয়ম। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহার অন্য মনোবৃত্তিসমূহ অবসাদগ্রস্ত ও জড়তাগ্রস্ত হইয়া কলুষিত হইয়া পড়ে; তখন উদ্দাম অন্ধ আবেগের দ্বারা চালিত হইয়া, ঐ সকল মনোবৃত্তি অপথে গমন করে। ফলত আপনার দ্বারা শাসিত হইয়াই, শিক্ষিত হইয়াই, মানুষ বড় হইয়াছে।

সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া মানুষের ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। ফলত একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই সত্য ও মঙ্গলকে স্পষ্টরূপে দেখিতে আমাদিগকে সমর্থ করে, এবং একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই স্বাধীনতাকে স্বকীয় প্রযত্নের ন্যায্য বিষয় প্রদর্শন করিয়া তাহাকে যথাপথে চালিত করে। বুদ্ধিবৃত্তি মনকে সর্ব্বদাই কোন প্রকার কাজে নিযুক্ত রাখে, শরীরের ন্যায় মনকেও সুদৃঢ় করে, নিদ্রালু হইলে তাহাকে জাগাইয়া তুলে; যখন দুষ্ট অশ্বের ন্যায় রাশরজ্জু না মানিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখে, এবং তাহার নিকট নূতন নূতন বিষয় আনিয়া উপস্থিত করে। কেননা, মনকে সর্ব্বদাই বিবিধ সম্পদে বিভূষিত করিতে পারিলেই মনের দৈন্য নিবারিত হয়। আলস্য মনকে অসাড় ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সুনিয়মিত কাজ মনকে উত্তেজিত করে, সুদৃঢ় করে, এবং এইরূপ কাজ করা আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত।

আমাদের অন্যান্য মনোবৃত্তির ন্যায় স্বাধীনতারও একটা শিক্ষা আছে। কখন শরীরকে দমন করিয়া, কখন স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে শাসন করিয়া, বিশেষত প্রবৃত্তিসমূহের আবেগকে প্রতিরোধ করিয়া আমরা স্বাধীন হইতে শিক্ষা করি। বাধাবিঘ্নের সহিত প্রতিপদে আমাদিগের সংগ্রাম করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন

কারণে চলিবে না। এইরূপ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়াই আমরা স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হই।

এমন কি, আমাদের ভাববৃত্তিরও একটা শিক্ষা আছে। ভাগ্যবান তাহারা যাহাদের হৃদয়ে জ্বলন্ত উৎসাহরূপ স্বর্গীয় অগ্নি স্বভাবতই বিদ্যমান! ইহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য। এমন কোন আত্মা নাই যার অন্তরের প্রচ্ছন্ন স্তরে কোন একটা উচ্চভাব খনি সঞ্চিত নাই। ইহাকে আবিষ্কার করা চাই, অনুসরণ করা চাই, এই পথে যদি কোন বাধা থাকে তাহাকে অপসারিত করা চাই, যদি কোন অনুকূল জিনিস থাকে, তাহার অনুসন্ধান করা চাই, এবং অবিশ্রান্ত যত্নের দ্বারা তাহা হইতে অল্পে অল্পে রত্ন উদ্ধার করা চাই। যদি কোন একটা বিশেষ উচ্চভাব তাহার না থাকে, অন্তত যে উচ্চভাবের অঙ্কুর তাহার অন্তরে স্বভাবত আছে, তাহারই পুষ্টিসাধন করা আবশ্যক। সেই ভাবের স্রোতে সময়ে সময়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কি বুদ্ধিবৃত্তিকেও তাহার সাহায্যার্থে আহ্বান করিতে হইবে; কেননা সত্য ও মঙ্গলকে যতই জানা যায়, ততই তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তি,আমাদের ভাববৃত্তি হইতে যাহা কিছু ধার করে, পরে তাহা সুদসমেত ফিরিয়া পায়। মহৎভাব সমূহে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি, জল্পী দার্শনিকদিগের বিরুদ্ধে আপনার অন্তরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়।

অন্যের সহিত সংশ্রব যদি রহিতও হয়, তবু মানুষের কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে। যতক্ষণ তাহার কতকটা বুদ্ধি থাকে, কতকটা স্বাধীনতা থাকে,ততক্ষণ তাহার অন্তরে মঙ্গলের ধারণা ও সেই সঙ্গে কর্ত্তব্যের ধারণাও বিদ্যমান থাকে। যদি আমরা কোন মরুদ্বীপে নিক্ষিপ্ত হই, সেখানেও কর্ত্তব্য আমাদিগকে অনুসরণ করিবে। স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাধীনতার প্রতি কোন বুদ্ধিমান ও স্বাধীন জীবের যে কর্ত্তব্য আছে,—কতকগুলি বাহ্য অবস্থা, সেই কর্ত্তব্য হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিবে,—এ একটা অসঙ্গত কথা। কোন গভীর বিজনতার মধ্যে থাকিয়াও, সে অনুভব করে,—সে একটা নিয়মের অধীন, তাহার উপরে সেই নিয়মের তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি সতত নিপতিত রহিয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে যেমন একটা বিষম যন্ত্রণা তেমনি আবার গৌরবের বিষয়।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বপ্রেম।

ব্রাহ্ম-সমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে অপৌত্তলিক অংশ পরিবর্জ্জন করিয়া প্রচলিত হিন্দু গৃহ্য-অনুষ্ঠানের প্রায় তাবৎই রক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ অনুষ্ঠান-পদ্ধতির যিনি সংগ্রহকার, তিনি সত্যের অবিরোধী সর্ব্বাঙ্গীন হিন্দুভাব যাহাতে রক্ষা পায়, তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। উভয়বিধ অনুষ্ঠান যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। যাহাতে অনুষ্ঠানের প্রকৃত অর্থ সর্ব্বসাধারণের হৃদগত হয়,দায়িত্বভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, এ কারণে উপদেশগুলী ভাষায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতি অনুষ্ঠানের উপসংহারভাগে এরূপে উপদেশের যে বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এরূপ উপদেশ দানের নবীনত্ব অনেকের চক্ষে আপত্তিকর ঠেকিতে পারে,

কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমাদের নিবেদন এই ঠিক একই পদ্ধতি চিরকাল সমানভাবে চলিতে পারে না, সময় ও অবস্থা অনুসারে তাহার তারতম্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। গৃহ্য-সূত্রে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমানকালের ভবদেব-পদ্ধতি তাহা হইতে অনেকটা পৃথক।

নিম্ন বঙ্গে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান যে পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, গয়াতে তাহা হইতে কতকটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ পিণ্ডদানের পক্ষপাতী না হইলেও পরলোকগত পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে এবং তাঁহাদের প্রীতি উদ্দেশে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদাসীন নহেন। ব্রাহ্মসমাজ এ সত্য জলন্ত ভাষায় সর্ব্বসময়ে ঘোষণা করিতে প্রস্তুত, যে পরলোকগত পিতৃলোকের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধানতম সহায়। এই পিতৃপূজার মর্য্যাদা এদেশে এতই প্রতীত হইয়াছিল যে অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ এ সকলেরই প্রারম্ভে পিতৃলোকের অর্চ্চনা ও আবাহন হইত; এমনকি দেবদেবী পূজার পূর্ব্বে নিত্য উপাসনার ভিতরে পারিবারিক মাঙ্গলিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের ভিতরে পৃতৃপূজার অল্পাধিক ব্যবস্থা ছিল ও আছে। হিন্দুজাতির স্বাত্বিক প্রকৃতির মূলে যে সকল কারণ অনৈতিহাসিক কাল হইতে কার্য্য করিতেছে, আমরা যদি বিরলে তাহার পরিচয় পাইতে চাই, সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাইব পিতৃপূজা ও তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান। যাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, আপনার বলিবার কেহ নাই, তাহাদের সকলের আত্মা সুতৃপ্ত হউক, এইত মন্ত্র। জানি না হৃদয়কে কতদূর উদার ও বিশ্বপ্রেমিক করিতে পারিলে, স্বার্থপরতার রাজ্য হইতে কত উচ্চে উঠিতে পারিলে আমাদের দুর্ব্বল কণ্ঠ হইতে একথা সহজে বিনির্গত হইতে পারে। গয়াশ্রাদ্ধে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়; তাহা পিতৃষোড়ষী ও মাতৃষোড়ষী নামে আখ্যাত। আমরা মাতৃষোড়শীর প্রথম চরণ গুলিই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, প্রতি দ্বিতীয় চরণে "তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং" এইরূপ আছে।

গর্ব্ভদবগমে চৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি। ১
মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ। ২
শৈথিল্যে প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্ত দুষ্করং। ৩
পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরং। ৪
অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ। ৫
পিবেচ্চ কদ্রব্যাণি ক্লেশানি বিবিধানি চ। ৬
চর্ব্বিতং ভক্ষ্যদ্রব্যস্য ত্যাগে বিন্দতি যৎফলং। ৭
রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং। ৮
পুত্রং ব্যাধি সমাযুক্তং মাতৃর্দুঃখমহর্নিশং। ৯
যদা পুত্রো ন লভতে তদা মাতুশ্চ শোচনং। ১০
ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরং স্তনং। ১১
দিবারাত্রৌ যদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ। ১২
পূর্ণে তু দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং। ১৩
গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতুস্তৃপ্তিং নৈব প্রগচ্ছতি। ১৪
অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ। ১৫
যমদ্বারে মহাঘোরে পথিমাতুশ্চ শোচনং। ১৬
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং।

ইহার ভাষা সরল, অনুবাদ প্রদান করা বাহুল্য মাত্র।

ঊনবিংশতি-পিণ্ডদান-ক্রিয়ার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যাহারা মাতামহ-কুলে বা বন্ধুবর্গ-কুলে জন্মিয়াছেন, যাহাদের কোন গতি নাই, যাহারা অজাতদন্ত অথবা গর্ভ্রে প্রপীড়িত, যাহারা অগ্নিদগ্ধ বা তাহার বিপরীত, যাহারা বিদ্যুতহত বা চৌরহত, যাহারা দাবদাহে মৃত অথবা সিংহব্যাঘ্রহত, যাহারা দন্তী বা শৃঙ্গীর আঘাতে মৃত, যাহারা উদ্বন্ধনে বিষ বা শস্ত্র প্রয়োগে হত, যাহারা আত্মঘাতী, যাহারা

অরণ্যে বা পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হত, যাহারা ভূত প্রেত পিশাচ, যাহারা অন্ধকারময় রৌরবে কালসূত্রে অবস্থিত, অনেক যাতনাময় প্রেতলোকে যাহারা গত, যমকিঙ্করগণ কর্তৃক যাহারা নীত হইয়া যাতনাময় নরকে অবস্থিত, যাহারা পশুযোনিগত, পক্ষী কীট ও সরীসৃপ ও বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত, যাহারা স্বীয় কর্ম্মে বিবিধ যোনি ভ্রমণ করিতেছে, যাহাদের মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, দিব্যলোকে অন্তরীক্ষে বা এখানে যে সকল পিতৃগণ ও বান্ধবেরা অবস্থিতি করিতেছেন, যাহারা মৃত হইয়া অসংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছেন বা প্রেতরূপে অবস্থান করিতেছেন, "তে সর্ব্বে তৃপ্তিং আয়ান্তু" তাঁহারা সকলে সুতৃপ্ত হউন। যাহারা আমাদের আবান্ধব বা বান্ধব বা পূর্ব্বজন্মে বান্ধব ছিলেন, যাহারা পিতৃকুলে মাতৃবংশে গুরু শ্বশুর ও বন্ধুকুলে মৃত হইয়াছেন, যাহারা আমার কুলে পুত্রদারাবিবর্জ্জিত হইয়া লুপ্তপিণ্ড হইয়াছেন, যাহাদের ক্রিয়া লোপ পাইয়াছে, যাহারা জন্মান্ধ পঙ্গু বিরূপ আমগর্ত্ত, যাহাদের সকলকে আমি জানি বা জানি না, যাঁহারা আমার পিতৃ ও মাতৃবংশে অতি পূরাকালে জন্মিয়াছিলেন, যাহারা এই উভয় কুলে দাস ভৃত্য আশ্রিত ও সেবক, যাহারা মিত্র, সখা, পশু, বৃক্ষ, যাহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমার উপকার করিয়াছে, যাহারা পূর্ব্বজন্মে আমার দাস ছিলেন, তাহাদের সকলের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতেছি। কি উদারতা, বিশ্বপ্রেমের কি সুন্দর নিদর্শন।*

হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া আমরা ঈশ্বরের পূজা করি। আমাদের পিতৃপূজার উপকরণও তাঁহাই। ঈশ্বরের পূজার যেমন দুইটি অঙ্গ এক তাঁহাকে প্রীতি করা আর এক তাঁহার প্রিয় আদেশ পালন করা, পিতৃপূজার অঙ্গও ঠিক তাই; এক তাঁহাদের উদ্দেশে প্রীতিকৃতজ্ঞতা উদ্দীপিত করা, অন্য তাঁহাদের বৈধ আদেশ পালন করা। ঈশ্বরের যদি আমরা প্রকৃত ভক্ত উপাসক হইতে চাই, তবে পিতা মাতা বা গুরুজন, তাঁহারা ইহলোকেই থাকুন আর পরলোকেই থাকুন, তাঁহাদের প্রতি যেন প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত না হই। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার ভাবকে এইরূপে অনুশীলিত করিয়া তাহাকে পরিবর্দ্ধিত ও সুমার্জ্জিত করিতে পারিলে তবে তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য হয়, এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁহার উপাসনা করিবার আমাদের অধিকার জন্মে। এইত গেল পরলোকগত আত্মার দিকে। আবার অন্যদিকে এই যে পিতৃলোকের সহিত ভক্তি-যোগে এই যে সখ্য-বন্ধন, তাঁহাদের অনুগত ও আশ্রিত লোকের সহিত এই যে

---

* আমরা এখানে ইহাও বলিতে চাই যে অন্যান্য জীবের সহিত, হীনজাতীয় মনুষ্যের সহিত, এমন কি সামান্য কীট পতঙ্গের সহিত সখ্যভাব স্থাপন এদেশের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আমরা আজ কালকার দিনে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর সকল জাতির সহিত সাম্যভাবের মীমাংসা যে ভাবে করিতে উদ্যত, ঠিক সেই ভাবের কোন চেষ্টা এদেশে পূর্ব্বে ছিল না বটে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিদিগের প্রচারিত সাম্যভাব মহত্তর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা সকল মনুষ্যের ভিতরে—সকল প্রাণীর ভিতরে—সকল কীট পতঙ্গের ভিতরে ব্রহ্মসত্ত্বা উপলব্ধি করিতেন। "চণ্ডালে গবি হস্তিনি" এ সকলের মধ্যে ব্রহ্মসত্বা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে আর ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন না, সকলের সঙ্গে মৈত্রী যোগে আবদ্ধ হইতেন। অবশ্য তাঁহাদের প্রদত্ত এ শিক্ষা জনসমাজ ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। ফলতঃ তাঁহাদের শিক্ষা প্রভাবে বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগে এই সাম্যমন্ত্রে সকলে দীক্ষিত হইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বুদ্ধ দেবের শিক্ষা তাঁহার ধর্ম্মের ভাব সাম্যবাদ মৈত্রী ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাগবতের শিক্ষাও কতকটা এই ভাবের। ফলতঃ যে ধর্ম্ম বিশ্বপ্রেমকে জাগাইয়া তুলিতে না পারে, সকলের সহিত মৈত্রী বন্ধন শিক্ষা না দেয়, অহিংসার ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহা একভাবে বলিতে গেলে অপূর্ণ ধর্ম্ম, তাহা কোন দেশের এবং কোন কালেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

মৈত্রীভাব, পশু পক্ষী জীবাণু এ সকলেরই কল্যাণের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই যে বিশ্ব-ব্যাপী প্রেমের অভিব্যক্তি, অথবা বিশ্ব-ব্যাপী বলি কেন, ইহলোক পরলোক দিগ-দিগন্ত কালাকাল প্রসারিত এই যে নিষ্কাম প্রীতির ভাব, আত্মীয় অনাত্মীয় শত্রু মিত্র, এ সকলের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ সাধন, স্বার্থপূর্ণ মর্ত্তে স্বর্গীয় এই যে দেবভাবের অভিনয়, বিরাট হৃদয়ের এই যে অপূর্ব্ব প্রার্থনা, ইহার মধুময় ফলে যদি আত্মার অসাড়তা বিদূরিত না হয়, বসন্তের প্রাণদ সমীরণ যদি সে স্থানকে স্পর্শ না করে, তবে জান না আত্মার কল্যাণ আর কিরূপে সম-ধিক সাধিত হইতে পারে।

তোমার পথে।

দেখতে দেখতে হল সে যে
অনেক দিনের কথা।
দেখেছিলে আমায় যে দিন
ফিরতে যথা তথা।
তুলতে ছিনু ঘরের কোণে
ধুলো মাটির রাশ।
দিন দুপুরে দিতেছিনু
শুক্‌নো ভুঁয়ে চাষ্।
দেখেছিলে ব্যর্থ কাজে
করতে আনা গোনা।
সেই পথেতে, সে পথ আমার
নয় কো জানা শোনা।
তুমি যে দিন ঘরে আমার
দিলে আসি দেখা,
চিনিয়ে আমায় দিলে তোমার
সরল পথের রেখা,
সে দিন হতে তোমার পথে
করছি আসা যাওয়া,
লাগছে আমার গায়ে যেন
খোলা মাঠের হাওয়া।
মুক্ত হাওয়ায় চোখে আমার
পড়ে গেছে ধরা।
আমার যেটা ছড়িয়ে আছে
তোমায় সেটা ভরা।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

দয়াময় সৃজিলেন আকাশ ধরণী,
তাঁরি দয়া লয়ে আসে দিবস রজনী,
ছড়ায়ে আলোক ধারা। দিবস আসিয়া
সজীব চেতন করি দেয় ক্ষুদ্র হিয়া।
সন্ধ্যালোকে আসে নিশি লয়ে সন্ধ্যা তারা,
শ্রান্ত ধরণীরে ঢালি সুধা শান্তি ধারা।
নিশীথে প্রহরী সম কে সদা জাগিয়া,
দয়াময় পিতা তিনি জুড়াইতে হিয়া।
থাক সাথে দয়াময় নিশীথে দিবসে,
যেন শক্তি লভি দেব তোমার পরশে।
ভয় বা ভাবনা রাশি ব্যথিত করিয়া,
যেন না বিকল করে এই ক্ষুদ্র হিয়া।
কখনো ভোজোনা মোরে জগৎ-জীবন
সর্ব্ব কাজে লভি যেন তোমার শরণ।

প্রার্থনা।

জাগরে অবশ প্রাণ, তরুণ তপন
ধরারে চেতন দিল, তুমি অচেতন
থেকোনাক, দূর কর অলস বিলাস
আনন্দ স্বরূপে প্রাণে করহ প্রকাশ।
যা গেছে তা যাক্ চলে, এখনো সময়
রয়েছে সম্মুখে পড়ি, ভুলি সমুদয়
নবীন উৎসাহ লয়ে হও অগ্রসর,
তাঁরে স্মর, যাঁর পূজা করে চরাচর।
সদা সত্য-ব্রত তুমি করহ পালন,
বিবেকের হাত ধরি করিও গমন।
নির্ম্মল গগন সম পবিত্র উদার,
হউক সর্ব্বদা এই জীবন আমার।
অনন্ত মহান সেই পরম ঈশ্বরে,
সদা পূজিবারে যেন পারি ভক্তিভরে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

জন্ম স্থিতি বা মৃত্যু একই শক্তির বিকাশ।

শক্তি জ্ঞানেরই বিকাশ, সুতরাং শক্তি নাই, জ্ঞানই নিত্য বা সত্য।

ক্রমশঃ পিতা মাতা, পুত্র কলত্র, পৌত্র কন্যা, দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতির বিয়োগ হেতু কাতর হইয়াছি। বাস্তবিক কাতরতার একবারেই কোন কারণ আছে কিনা দেখা আবশ্যক। পিতা মাতা পুত্র কলত্র প্রভৃতির দেহের অভাব বা দেহ অদৃষ্ট হইয়াছে। দেহ পরিবর্ত্তনশীল। দেহ থাকে এবং পরে তাহার ধ্বংস হয়। পদার্থ মাত্রই এই নিয়মাধীন। তাহারা জন্ম স্থিতি এবং মরণ ধর্ম্মশীল। অতএব মরণ ধর্ম্মশীল দেহের মরণ বা ধ্বংস হইল বলিয়া ক্ষোভের কারণ নাই। পদার্থময় জগৎ ধ্বংসশীল বা পরিবর্ত্তনশীল। জ্ঞান স্থির থাকিলে এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয় না এবং জ্ঞান অস্থির হইলেই পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য হয়। আমার স্থির জ্ঞান না থাকা হেতু জগতের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতঃ বিচলিত হই এবং ক্ষুব্ধ হইয়া থাকি। বাস্তবিক যে নিজে অস্থির, তাহার পক্ষে স্থির জ্ঞান সম্ভব নহে। তাহার জ্ঞানে সদা অস্থিরতা। আমি স্বয়ং অস্থির-জ্ঞান হইয়া কি প্রকারে শান্তি পাইব? আমার স্থির জ্ঞান থাকিলে জগতের পরিবর্ত্তনে মনোনিবেশ হয় না; সুতরাং ক্ষোভের কোন কারণ হয় না। আমার স্থির জ্ঞানের অভাব হেতু জগতের অস্থির ভাবই মনে করি। জগতের পরিবর্ত্তন-ভাব সন্দর্শনে বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হই। এবং সেই ভাব অসহ্য হওয়ায় জগতের অপরিবর্ত্তনীয়তার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বলবতী হয়। আমার স্থির জ্ঞান থাকিলে জগতের পরিবর্ত্তনে আমার শান্তির অভাব হয় না। স্থির জ্ঞান থাকিলে আমি স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই যে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে। পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার জন্য আবার ক্ষোভ কি? এই ভাব আমার স্থির-জ্ঞানের পরিচায়ক। অর্থাৎ এইরূপ ভাব হইতে বুঝিতে হইবে যে আমার স্থির বা ঠিক জ্ঞান হইয়াছে। তখন সহজেই বুঝিব অস্থির ভাবে ভ্রান্তি এবং স্থির ভাবে সত্য। তখন পদার্থের তারতম্য জ্ঞান থাকিবে না। দেখিব এক অসীম বল বা শক্তি সমভাবে সৃষ্টি স্থিতি এবং ক্ষয়কে পরিচালিত করিতেছে। সৃষ্টি স্থিতি এবং ক্ষয় একই শক্তির বিকাশ মাত্র। এই তিনে একই কার্য্য সাধন করে। একই ভাব প্রকাশ করে। তাহারা তিন পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইলেও অভিন্ন। সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় অথবা জন্ম অবস্থান এবং মরণ এই প্রত্যেকের যখন একই কারণ শক্তি এবং যখন প্রত্যেকটিই একই শক্তিরই বিকাশ, তখন আর প্রত্যেকের পার্থক্য অনুমান করা যাইতে পারে না। জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু একই। তাহারা শক্তির নামান্তর মাত্র। শক্তিই আদি কারণ। শক্তি আবার জ্ঞানাশ্রিত বা জ্ঞানাপেক্ষী। জ্ঞানের প্রকাশই শক্তি। সুতরাং জ্ঞান শক্তির অব্যবহিত হেতু! জ্ঞানই মূল। এক্ষণে প্রতীতি হইবে, আমার অস্থির ভাব হেতুই যত অনর্থপাত। অস্থির ভাব না থাকিলে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে বিচলিত হই না। আমি স্থির থাকিলে আমার নিকট সমুদায়ই স্থিররূপে প্রতীয়মান হয়। জগতের পরিবর্ত্তনে অস্থিরতার লেশমাত্র উপলব্ধি করি না। তখন সৎ বা নিত্য জ্ঞানাপেক্ষী স্থির-শক্তি সম্ভূত পরিবর্ত্তনই মনে করি না। পরিবর্ত্তনের কারণ শক্তিকে স্থির জানিয়া তন্মূলক পরিবর্ত্তনে স্থিরতাই উপলব্ধি করি। তখন একই সমভাবাপন্ন শক্তি ভিন্ন আর কোন কিছুরই ধারণা হয় না। সেই শক্তি আবার নিত্য জ্ঞানকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞানেরই অনুভব হয়। তাহা হইলে আর ক্ষুদ্র দেহের অবস্থান্তর বা রূপান্তর হেতু মুগ্ধ হই না, ক্ষুব্ধ হই না। যে শক্তি প্রসাদাৎ জন্ম এবং স্থিতি, সেই একমাত্র শক্তি প্রসাদাৎই মৃত্যু জানিয়া স্থির থাকি। দেহান্তর হেতু শক্তির অবসান হইল বলিয়া ভ্রম হয় না। পূর্ব্বাপর একই শক্তির ক্রিয়া দেখি। আর জ্ঞানকে আশ্রয় বা অপেক্ষা পূর্ব্বক শক্তির ক্রিয়া হওয়া হেতু জ্ঞানই মাত্র অনুভূত হয়। "জ্ঞানমানন্দম্ ব্রহ্ম" অর্থাৎ জ্ঞান আনন্দ এবং ব্রহ্ম। ইহা বেদান্তবাক্য। জ্ঞান নিত্য এবং মঙ্গলময় এবং মঙ্গলই বুঝিতে হইবে। যখন জ্ঞানেরই সত্তা বা বিদ্যমানতা এবং জ্ঞানকে অপেক্ষা বা আশ্রয় করিয়া জগৎ, অথবা জ্ঞান হেতু জগৎ, তখন জগতের আর পৃথক সত্তা সম্ভবে না। আমাকে লইয়া জগৎ, সুতরাং আমার আর পৃথক সত্তা নাই। আমিও জ্ঞান ব্যতীত নহি। আমি অথবা জগৎ সেই জ্ঞান। পদার্থ মাত্রই সেই জ্ঞান ব্যতীত নহে। জন্ম স্থিতি লয় পদার্থের ধর্ম্ম। আর জন্ম স্থিতি লয় একই শক্তির অধীন। একই শক্তি কর্ত্তৃক সমভাবে পরিচালিত, অতএব শক্তিই তাহাদের হেতু। সেই শক্তি আবার জ্ঞান সাপেক্ষ, জ্ঞান ব্যতীত শক্তির সত্তা অসম্ভব। জ্ঞান হইতেই শক্তি। জ্ঞান কিন্তু শক্তি-নিরপেক্ষ অর্থাৎ শক্তিকে অপেক্ষা করে না; এবং অনাদি বা স্বপ্রকাশ। পঞ্চদশীতে উল্লেখ আছে "কিং মানমিতি [চেন্নাস্তি মানাকাংক্ষা স্বয়ংপ্রভে।

অর্থাৎ জ্ঞানব্রহ্মের প্রমাণ আর কিছুই নাই, ইহা নিত্য জ্ঞানময় এবং নিজ হইতে প্রকাশিত। ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে, জ্ঞান ব্যতীত কিছু নিত্য নহে, বা কিছুই নাই। আমার অস্তিত্ব জ্ঞানেতেই যাহাকে সাধারণতঃ 'আমি' বলিয়া থাকি, তাহার ক্রিয়া আছে। সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন এবং তদ্ধেতু ক্ষোভাদিও আছে। কিন্তু পূর্ব্ব নির্দ্দেশিত 'জ্ঞান-আমির' ক্রিয়া নাই বা ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন এবং তদ্ধেতু ক্ষোভাদি নাই। জ্ঞান একই। জ্ঞান পৃথক পৃথক নহে। সুতরাং জ্ঞান-আমি বা আমি পৃথক নহি। সমুদায়ই এক আমি বা এক জ্ঞান। অতএব আমার জন্য বা আমার অভাবে আমার ক্ষোভ, অথবা জ্ঞানের জন্য বা জ্ঞানের অভাবে জ্ঞানের ক্ষোভ বাতুলতা মাত্র।

"প্রয়োজন বলিয়া কিছুই নাই।"

প্রয়োজনীয়তার বিশ্বাসই ক্ষোভ, দুঃখের হেতু; কিন্তু প্রয়োজন বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং আমারও প্রয়োজন নাই। বরং আমার প্রয়োজন না থাকাই আমার প্রয়োজন। কারণ তাহা হইলে, প্রয়োজন জড়িত দুঃখ পাই না। অন্নের প্রয়োজন বলিয়া তদন্বেষণে ধাবিত হই। এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে বলি বস্ত্রের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে বলি অর্থের প্রয়োজন। এই তৃতীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে বলি সুহৃদের প্রয়োজন। সেই চতুর্থ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে অন্যবিধ প্রয়োজনের উল্লেখ করি। বাস্তবিক যতই প্রয়োজন সাধন হয়, ততই নূতন নূতন প্রয়োজনের অবতারণা করি। এইরূপ অনন্তকাল প্রয়োজনীয় পদার্থের নমোল্লেখ করতঃ তাহা আয়ত্ত করিলেও প্রয়োজন থাকিবে এবং তদুদ্দেশে ধাবিত হইতে হইবে। বাস্তবিক যদি প্রয়োজনটী ঠিক কি তাহা জানিতাম, তাহা হইলে তদন্বেষণে প্রাণপণ করিতাম; এবং প্রয়োজন সম্যক সাধন করিয়া শান্তিলাভ করিতাম। এতদবস্থায় বলিতে হইবে যে এরূপ কোন প্রয়োজন আছে, যাহা জানিনা যে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই শান্তি লাভ করিব। অথবা বলিতে হইবে যে প্রয়োজন বলিয়া কিছুই নাই, সুতরাং তদন্বেষণে প্রয়োজন নাই। "এমন কোন প্রয়োজন আছে যাহা জানা যায় না" এবং "প্রয়োজন কিছুই নাই" এই দুই একই কথা। কারণ যখন বলি প্রয়োজন কিছুই নাই, তখন বিচার করিয়াই কিছু প্রয়োজন থাকে দেখিতে পাই না। আর "এমন কোন প্রয়োজন আছে, যাহা জানা যায় না।" বলিবার সময়েও বিচারে কিছু প্রয়োজন থাকা দেখিতে পাই না। প্রয়োজন কিছুই না থাকিলে আর প্রয়োজন সাধনের জন্য নিরন্তর ক্লেশ পাইতে হয় না। "প্রয়োজন আছে" মনে করিয়াই তৎসাধনোদ্দেশে আমার ঈদৃশী অশান্তি। বাস্তবিক প্রয়োজন কিছু থাকিলে অবশ্যই তাহা কোন না কোন কালে কোন না কোন উপায়ে জানা যাইত এবং তাহার প্রতিবিধানও হইত। প্রয়োজন কিছুই নাই, সুতরাং তাহার প্রতিবিধানও নাই। "প্রয়োজন আছে" বিশ্বাসে তাহার প্রতিবিধান জন্য আমার অশান্তির অবধি নাই। কিন্তু যখন প্রয়োজনই নাই, তখন আর তৎপ্রতিবিধান হেতু অশান্তি কেন? প্রয়োজন বলিয়া যে ভুল বিশ্বাসে এতাদৃশ উদ্বেগ, সে ভুল বিশ্বাস অপ্রয়োজন। অতএব প্রয়োজনে আর প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হেতুই যখন দুঃখ, আর যখন প্রয়োজন নাই, তখন ত প্রয়োজন না থাকাই প্রয়োজন।

ব্রহ্মজ্ঞানীই সুখী।

ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ
রসো ব্রহ্মরসং লব্ধা নন্দী ভবিতি নান্যথা।

অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন এবং আত্মজ্ঞানী শোক মোহ হইতে মুক্ত থাকেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানীর আনন্দ অনিবার্য্য। এই শ্রুতি বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পদার্থ-ধর্ম্ম—জন্ম মরণ অবস্থান একই বা কিছুই নহে এবং সেই বাক্যে জ্ঞান ব্রহ্মই সত্য প্রকাশ পাইতেছে।

সুখ কি?

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

যাহা নিশ্চয়ই অতি বৃহৎ বা অসীম তাহাতেই সুখ, ক্ষুদ্রে বা সীমাবদ্ধ কিছুতে সুখ নাই। পঞ্চদশী এই মহৎ বাক্যের যাথার্থ্যই প্রতিপাদন জন্য দেখাইতেছেন যে দশ বহিরিন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং অন্তরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণ বা মন প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র পদবাচ্য। অতএব সুখ প্রদানে অসমর্থ চক্ষু দ্বারা সাময়িক দর্শন সুখ মাত্র হয় এবং ক্রমশঃ তাহার অবসান হয়। কর্ণ দ্বারা শ্রুতি সুখের, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ সুখের, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ সুখের, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ সুখের ক্ষণস্থায়ী অনুভব মাত্র হয় এবং ক্রমশঃ তাহার অবসান হয়। সেইরূপ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থের ক্রিয়া হেতু সুখের উদ্রেক এবং ক্রমশঃ তাহার অবসান হইয়া থাকে। যে উপস্থ বা জননেন্দ্রিয়-সুখ জন্য আমরা উন্মত্ত, সেই বৃথা ইন্দ্রিয় সুখেরও সীমা রহিয়াছে। কেন যে এই ঐন্দ্রিক সুখ সত্য নিত্য সুখ হইতে পারে না, তাহা কি আর বলিতে হইবে? ইহারা প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র বা সীমাবদ্ধ। যাহা সীমাবদ্ধ নহে, অতি বৃহৎ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম বা জ্ঞানানন্দব্রহ্ম, তিনিই প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত সুখের নিদান।

কয়েকটি পুরাতন কথা।

কলিকাতা নন্দনবাগান নিবাসী ৺ কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় একজন বিচারপতি ছিলেন। রাজকার্য্য উপলক্ষে তিনি যখন যেখানে যান, প্রায় সকল স্থানেই ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। জেলা ২৪ পরগণায় যৎকালে প্রধান সদরআলা পদে নিযুক্ত থাকেন, ভবানীপুরকেও বিস্মৃত হয়েন নাই। ১৭৭৪ শক, ১২৫৮ সাল ৯ই আষাঢ় দিবসে তিনি তথায় "জ্ঞান প্রকাশিনী সভা" স্থাপিত করেন। প্রথমে উত্তর রসা রোডের ধারে ৺ শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় প্রতি সোমবার সন্ধ্যার পর ঐ সভার অধিবেশন হইত। শম্ভুনাথ বাবু তখন সদর দেওয়ানি আদালতের উকীল এবং পরে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন। ৺ রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বিচারাসন গ্রহণ ঘটে নাই। নূতন হাইকোর্টের কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। সেই জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার স্থলে নিয়োগ করা হয়। ভবানীপুরের প্রধান প্রধান প্রায় সকলেই ঐ সভায় যোগ দিয়াছিলেন। বেদ উপনিষদ ও গীতা পাঠ হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের রচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য শেষ হইত।

চারি মাস পরে পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সভার সভ্য হইলেন এবং তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বিত ও "ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজ" নামে ঐ সভা অভিহিত হইল। বয়ঃক্রম অনুসারে ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বিতীয়, ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ তৃতীয় এবং কৃষ্ণনগর ব্রাহ্ম-সমাজ চতুর্থ। সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি পণ্ডিত মহাশয়, প্রতিনিধি সভাপতি হাইকোর্টের সরকারি উকিল ৺ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, খ্যাতনামা সম্পাদক ৺ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সহকারী সম্পাদক ৺ গোবিন্দচন্দ্র বসু ও ৺ প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হয়েন। ইংরাজী সংবাদ পত্র "হিন্দুপেট্রিয়টের" হরিশ বাবু প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। অর্থ সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইল এবং ১২৬০ সালের ৯ই আষাঢ় দিবসে দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ঐ নূতন গৃহে প্রবেশ করা হইল। ভবানীপুর অনেক শিক্ষিত লোকের স্থান। তথাকার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের উদ্যম ও উৎসাহে সমাজের কার্য্য অতি সুচারু-রূপে চলিতে লাগিল। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে নূতন ব্যাপার এই ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ধর্ম্ম-প্রচার জন্য ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা সমাজ-গৃহে দিবার ব্যবস্থা করেন এবং সেই সকল বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইতে লাগিল। হরিশ বাবু অন্নদা বাবু ও বাবু কালীকুমার দাস কয়েকটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা কালে সমাজ-গৃহ শিক্ষিত লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। ঐ সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা মহা উদ্যমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। ভবানীপুরে কলিকাতায় ও শ্রীরামপুরে তাঁহাদের অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের আস্থা চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার অনুরূপ কোনও উন্নত ধর্ম্ম তাহাদের সম্মুখে প্রদর্শিত হয় নাই। কাজেই ঐ সকল খৃষ্ট-বিদ্যালয়ের কতকগুলি ভাল ভাল ছাত্র খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই স্রোত প্রতিরোধ করার অভিপ্রায়ে ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই পরে সমুদায় সমাজে গৃহিত হইয়াছে।

হরিশ বাবুর বক্তৃতা গুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তি কখনই লোপ হইবার নহে। এস্থলে তাহা বিশদ রূপে বলিবার আবশ্যক নাই। সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। নীলকরদের অত্যাচার তাঁহার লেখনীর বলে নিবারণ হয়। সিপাহী বিদ্রোহ কালে লর্ড ক্যানিংএর কার্য্য সকল তিনি অতিশয় পারদর্শিতা সহকারে সমর্থন করিতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রতি সোমবার প্রাতে একজন অশ্বারোহী রাজদূত "পেট্রিয়ট" কাগজের প্রথম খণ্ড লইয়া যাইবার জন্য কার্য্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত থাকিত। হরিশ বাবুর শেষ পাড়ার সময় লর্ড ক্যানিং তাঁহার বাটীতে এডিকং পাঠাইয়া সংবাদ লইতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাতেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বক্তৃতার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, যুক্তিও সেই প্রকার অকাট্য। সুতরাং তৎসমুদয় অতীব হৃদয়গ্রাহী হইত। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা যে ধর্ম্মপ্রচারের একটি প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা তিনি বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর The Brahmo Somaj, its Position ond Prospects" বিষয়ে প্রথম, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি The Positive Theology of the Brahmo Somaj" বিষয়ে দ্বিতীয় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে The Utility of Public Worsbip" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা দেন। শেষোক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া শ্রীরামপুরের তৎকালীন "Friend of India" সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "কোনও ইংরেজ অবশ্যই ইহার লেখক।" তদুত্তরে হরিশ বাবু তাঁহার সংবাদ পত্রে লেখেন যে

"ইংরেজ নহেন, এক জন কুলীন ব্রাহ্মণ ইহার লেখক।" "The Ethics of Bhagabatgita" বিষয়ে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা মুদ্রিত হয় নাই এবং লেখাটিও পাওয়া যায় নাই। আমার বাল্য বন্ধু শ্রদ্ধেয় ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী ঐ তিনটি বক্তৃতা পুস্তিকাকারে সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বহুলরূপে এই বক্তৃতাগুলি শিক্ষিত লোকে পাঠ করেন ইহাই প্রার্থনীয়। হরিশ বাবু লক্ষণ-যুক্ত পুরুষ ছিলেন। দীর্ঘাকার (৬ফুট লম্বা), অজানুলম্বিত বাহু, বিস্তৃত বক্ষঃ এবং ভ্রূযুগল জোড়া ও ঘন। এমন সকল মানুষের অকাল মৃত্যুতে বাস্তবিক ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

"The Age and its wants বিষয়ে কালীকুমার বাবুর বক্তৃতা ছিল। ইনি সুবিখ্যাত Phrenologist ছিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ে অনেক লিখিয়াছিলেন। "Age and its wants" বিষয় বক্তৃতা শুনিতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক খ্যাতনামা ডাক্তার ডফ আসিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের সহিত ভবানীপুর সমাজের অতিশয় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। হিমালয়ে যোগ সাধন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নবানুরাগে ও পরম উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা। এই সময়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। মহর্ষি আদি-সমাজের বেদী হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" নামে ঐ সকল উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। উপদেশ গুলি এতই উচ্চ, যে ব্রাহ্ম-সমাজে কেন সমগ্র ধর্ম্ম-জগতে উহা চির-আদৃত থাকিবে। তদ্ভিন্ন আদি-সমাজের দ্বিতল গৃহে তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। প্রতি রবিবার প্রাতে তথায় তিনি ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উপদেশ দিতেন। মহর্ষির দশটি উপদেশ "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতেছে। কলিকাতার পরেই ভবানীপুর মহর্ষির এক প্রধান প্রচার-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। প্রতি সোমবার তথাকার সমাজের বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতে ও উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহার উপর আবার সেখানেও ব্রহ্ম-বিদ্যালয় খুলিলেন। মাসের প্রথম রবিবার প্রাতে আদিসমাজে মাসিক উপাসনা হইত। সুতরাং প্রথম রবিবার ভিন্ন প্রতি রবিবার প্রাতে ভবানীপুর বিদ্যালয়ে উপদেশ দেওয়া হইত। ঐ সকল উপদেশ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইত। ছাত্রদিগকে লিখিত প্রশ্ন দেওয়া হইত। প্রশ্ন ও ভাল ভাল উত্তর গুলিও মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হইত। প্রাতে ৭॥ ঘণ্টার সময় বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইত। অতি প্রত্যুষে মহর্ষি শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে নিজ ভবন হইতে বহির্গত হইতেন। ধর্ম্মতলায় গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে ময়দান পার হইয়া কেথিড্রেল গিরজার নিকট আবার গাড়ীতে উঠিতেন। ঐ সময়ে ৯ই আষাঢ় শনিবার পড়ে। উৎসবের কার্য্য শেষ হইতে রাত্রি হইয়া যায়। পরদিন ব্রহ্মবিদ্যালয়। মহর্ষি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন ছাত্রেরা প্রায় সকলেই অনুপস্থিত। বিলম্বে সকলে আসিলে মহর্ষি বলিলেন "কাল তোমাদের শুইতে রাত্রি হইয়াছিল।" ছাত্রেরা লজ্জিত হইয়া মনে মনে হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল "আমরা যুবা ও স্থানীয় লোক; ঠাকুর! আপনি জোড়াসাঁকো হইতে আমাদের অগ্রে আসিলেন!!" ইতিপূর্ব্বে তিনি এক দিন উপদেশ দিয়াছিলেন "সূর্য্য কেমন নিয়মিত সময়ে উদিত হয়; মেঘ ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টি হইলেও সে যথাকালে পূর্ব্ব আকাশে সমুদিত। তোমরাও সূর্য্যের ন্যায় হইবে।" ইহার মর্ম্ম ছাত্রেরা ঐ দিন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। ৺ হেমেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ পুত্রত্রয় প্রায়ই মহর্ষির সঙ্গে আসিতেন। এক বৎসর কার্য্যের পর বিদ্যালয় বন্ধ হয়। সেই সময়ে মহর্ষি চুঁচুড়ায় ব্রহ্ম-বিদ্যালয় করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে ভবানীপুর সমাজের সম্পাদক। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কয়েকজনকে লইয়া এক প্রতিনিধি অধ্যক্ষ সভা গঠন করেন। ঐ সভার যত্নে আবার সমাজ-গৃহে ইংরাজী বক্তৃতা হয়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্রের কৌমার বক্তৃতা এই ভবানীপুরে হইয়াছিল। ৺ ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয় এবং আরও কয়েকজন বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতার সময় মহর্ষি উপস্থিত থাকিতেন।

দুই বৎসর পরে মহর্ষি ভবানীপুরে আবার বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। এক বৎসর উপদেশের পর পরীক্ষা করা হয়। ছাত্রদিগকে পৃথক পৃথক বসাইয়া লিখিত প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করা হইত। আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রহরী থাকিয়া উত্তর লইয়া যাইতেন। পরীক্ষায় তের জন উত্তীর্ণ হয়েন। পার্চমেণ্টে ঐ তের জনকে প্রশংসা-পত্র দেওয়া হয়। কলিকাতা সমাজের তৎকালীন সম্পাদক রূপে ব্রহ্মানন্দ প্রশংসা-পত্রে স্বাক্ষর করেন। মহর্ষির কতই আনন্দ—কতই পুত্রবৎ স্নেহ। এ জীবনে চিত্তপট হইতে তাহা অপসারিত হইবার নহে। দেখা হইলেই সাদর আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ। প্রত্যেকের শারীরিক ও পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা। নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে আহার এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে ও মাঘোৎসবে আহ্বান। তাঁহার স্বর্গীয় ভাব ও সরল প্রেম সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিত। সটীক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ও তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ পুরাতন ছাত্রদিগকে নিজ হস্তে লিখিয়া উপহার দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ভাল ভাল কর্ম্ম করিতেছেন।" ভবানীপুরের নেতাদিগকে এতই ভাল বাসিতেন যে শম্ভুনাথ বাবু ও হরিশ বাবুর মৃত্যুর পর উৎসব উপলক্ষে ভবানীপুরের বেদী হইতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের আত্মার কল্যাণার্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ বাবুর বয়ঃক্রম এখন ৮৭ বৎসর হইয়াছে। প্রথম হইতে তিনি এই সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য। যদিও এখন দেহে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি তাঁহার উৎসাহের খর্ব্বতা নাই।

কলিকাতায় "তত্ত্ববোধিনী সভার" ন্যায় ভবানীপুরের "সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী" সভাও কার্য্য করিত। ঐ সভার এক খানি পত্রিকা ছিল। ৺ নবকৃষ্ণ বসু মহাশয় ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রচলিত হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্ম্মে কোনও প্রভেদ নাই, ইহাই ঐ পত্রিকা প্রতিপাদন করিত। অপর দিকে কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ খৃষ্টধর্ম্মের

সহিত বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে খৃষ্টধর্ম্মের স্রোত আর অপ্রতিহত বেগে চলিতে পারিল না। শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নবকৃষ্ণ বাবু ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। এক দিন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ করিয়া মহর্ষি নবকৃষ্ণ বাবুকে দেখিতে গেলেন এবং অবস্থা দেখিয়া কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়াছিলেন।

এখন আর ভবানীপুরের সে দিন নাই। সে মহর্ষি নাই, স্থানীয় লোকেরও সে ধর্ম্মোৎসাহ নাই। পূর্ব্বের তুলনায় এখন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় অবস্থা। সমাজ-গৃহ পর্য্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় তাহার সংস্কার চলিতেছে।*

এস্থলে মহর্ষির আকর্ষণী শক্তির বিষয় কিছু না বলিয়া উপসংহার করা যায় না। স্কুলে পড়ার সময়ে, এক দিন আমার সমপাঠী আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেন "ওহে! আজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবানীপুর সমাজে আসিবেন।" আগ্রহের সহিত দুই জনে সমাজে গেলাম এবং এতদুর আকৃষ্ট হইলাম যে স্কুলের পর বাসা হইতে হাঁটিয়া ধর্ম্মতলায় স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আফিসে গিয়া প্রতি বুধবার তাঁহার গাড়ীতে জোড়াসাঁকো সমাজে যাইতাম। সমাজের পর মহর্ষির ভবনে অধ্যক্ষ সভা হইত। বেচারাম বাবু অধ্যক্ষ সভার একজন সভ্য ছিলেন। কাজেই বেচারাম বাবুর ফিরিতে রাত্রি হইয়া পড়িত। আমরাও তাঁহার সঙ্গে ফিরিতাম। নগেন্দ্র বাবু বেচারাম বাবুর সঙ্গে বেহালা গিয়া তথায় রাত্রি কাটাইতেন। আমি বাটী আসিয়া দেখিতাম সকলে নিদ্রিত। কাহাকেও না ডাকিয়া অনশনে রাত্রি যাপন করিতাম। আকর্ষণ ব্যতীত এতাধিক কষ্ট স্বীকার সম্ভব নহে। তখনও মহর্ষির সহিত পরিচয় হয় নাই। ব্রহ্মবিদ্যালয় হইলে পরিচিত হইলাম।

শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক।
অবসর প্রাপ্ত সবজজ।

নানা কথা।

শোকসভা।—সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যু উপলক্ষে ভারত-সঙ্গীত-সমাজের বিশেষ উদ্যোগে কলিকাতার ময়দানে ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বিরাট শোকসভা আহূত হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশ হাজার লোক সমাগত হন। সকলেরই মুখে শোক ও বিষাদের কালিমা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১

কি হ'ল কি হ'ল, কি শুনালি বল;
বিনা মেঘে একি বাজ রে!
সৌম্য, শান্ত, ধীর-প্রশান্ত,
নাহি সে রাজাধিরাজ রে!
কন্যা-কুমারী হ'তে হিমালয়,
'নাই' 'নাই' 'নাই' প্রতিধ্বনি বয়;
সারা ধরা আজি অন্ধকার-ময়!
নাহি সে রাজাধিরাজ রে!
আঁখি আবরিয়া কাঁদে রাজেন্দ্রাণী;
কহ তাঁরে দুটী সান্ত্বনার বাণী;
কাঁদিয়া আকুল ভারত দুঃখিনী;
স্মরিয়া তোমারে আজ রে!
গেলে চলে যদি ত্যজি ইহধাম,
শান্তিপূর্ণ হোক তোমার বিশ্রাম!
কাঁদিছে ভারত স্মরি গুণগ্রাম
(পরি) নববর্ষে শোক-সাজ রে!
অক্ষয় স্বর্গ ভিক্ষা তব আজ
মাগিছে কাতরে সঙ্গীত সমাজ;
দিব্য ধামে পরি নব দিব্য সাজ,
থাক আনন্দে অমরা মাঝ রে!
(আজি) জননী ধরণী লবে তুলে কোলে;
ঢেকে দিবে বপু শ্যামল আঁচলে;
বল হরি হরি, হরিবোল ব'লে
(সবে) পরাও কুসুম-সাজে রে!

২

চল ভাই চল ধীরে অতি ধীরে।
দিতে রাজার প্রতিমা বিসর্জ্জন অনন্ত নীরে॥
কি ফল বিফল, ফুকারি রোদন,
পুষে রাখ হৃদে হৃদয়-বেদন,
কেঁদে চির দিন, দীন মোরা আর, পাবনা
অমন রাজারে ফিরে॥
কররে নীরব সংসারের রোল,
সারা বঙ্গবাসী বল হরি হরি বোল,
হরিনামে স্বর্গধামে ঐ যায় গো রাজা স্বশরীরে।
দয়াল হরি দিও তরী ভব-পারাবার তীরে॥
(মহারাজারে) ভব-পারাবার তীরে॥
যাও প্রভু যাও বৈজয়ন্ত ধামে,
দেবের প্রসাদে জ্যোতির্ম্ময় বামে, বিরাজ বিরামে,
করুণ নিদান, তুমি পুণ্যবান, পর অমর মুকুট শিরে॥

---

* এমন একদিন গিয়াছে হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় নিজেরা দড়ী ধরিয়া ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের বারাণ্ডার পত্তন দেন। হায় বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন। সে উদ্যম সে অধ্যবসায় আর নাই। সহ সং।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

মঙ্গল।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)
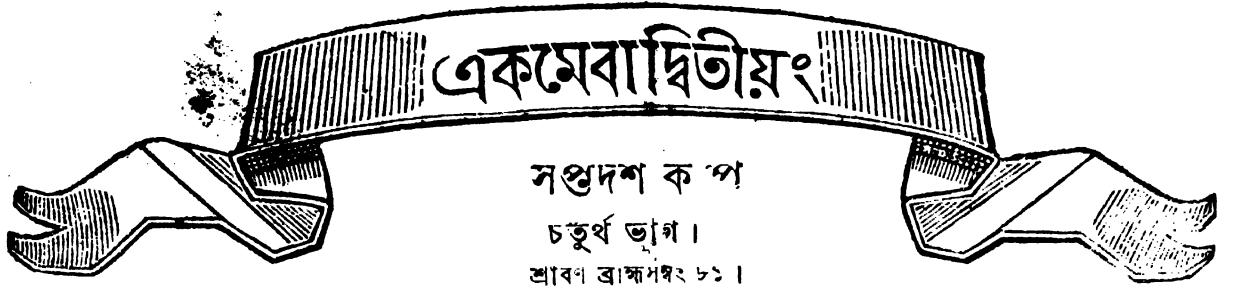
আমার মধ্যে আছে বলিয়াই যে নৈতিক পুরুষটি আমার নিকট পবিত্র তাহা নহে,—নৈতিক পুরুষ বলিয়াই পবিত্র। নৈতিক পুরুষটি স্বতই শ্রদ্ধেয়; নৈতিক পুরুষ সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার পাত্র।

এই নৈতিক পুরুষটি যেমন আমার মধ্যে আছেন, তেমনি তোমার মধ্যেও আছেন;—উভয়ত্রই আছেন একই অধিকার-সূত্রে! আমার নিজের সম্বন্ধে, তিনি আমার উপর যে কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত করেন, সেই কর্ত্তব্যটি আবার তোমার মধ্যে একটি অধিকারের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়; এবং এই সূত্রে আবার তোমার সম্বন্ধে, আমার একটি নূতন কর্ত্তব্য আসিয়া পড়ে।

সত্য যেমন আমার পক্ষে আবশ্যক, তেমনি তোমার পক্ষেও আবশ্যক। কেন-না, সত্য যেমন আমার বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ম, তেমনি তোমার বুদ্ধিবৃত্তিরও নিয়ম। সত্যই বুদ্ধিবৃত্তির নিজস্ব ধন। তাই, তোমার চিত্তবৃত্তির বিকাশের প্রতিও আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; সত্যের পথে তোমার চিত্ত যাহাতে বাধা না পায়, এমন কি, সত্যের অর্জ্জনে সুবিধা সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তৎপ্রতিও আমার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

তোমার স্বাধীনতার প্রতিও আমার সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এমন কি, তোমার কোন দোষ ক্রটি নিবারণ করিবারও সকল সময়ে আমার অধিকার নাই। স্বাধীনতা এমনি একটি পবিত্র সামগ্রী যে, উহা যখন বিপথগামী হয়, তখনও উহাকে একেবারে বাধা না দিয়া, কতকটা উহাকে বাগাইয়া আনিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। অনেক সময় আমরা কোন মন্দ নিবারণ করিবার জন্য অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভুল করি। ভাল মন্দ দুই ঈশ্বরের বিধান। কোন আত্মাকে বলপূর্ব্বক সংশোধন করিতে গিয়া তাকে আমরা আরও পশুবৎ করিয়া ফেলি।

যে সকল অনুরাগ বৃত্তি তোমারই অংশ রূপে অবস্থিত, সেই সকল অনুরাগের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; এবং যত প্রকার অনুরাগ আছে তন্মধ্যে পারি-

বারিক অনুরাগ-গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। আপনাকে আপনার বাহিরে প্রসারিত করা, (বিক্ষিপ্ত করা নহে) সুনিয়ন্ত্রিত ও ধর্ম্মের দ্বারা পূত কোন একটি অনুরাগের দ্বারা কতকগুলি আত্মার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করা—এইরূপ একটি দুর্নিবার প্রয়োজন আমাদের মধ্যে আছে। পরিবারমণ্ডলীর দ্বারাই আমাদের এই প্রয়োজন চরিতার্থতা লাভ করে। মানুষের প্রতি অনুরাগ—ইহা একটি সাধারণ অনুরাগ। পারিবারিক অনুরাগ—কতকটা আত্মানুরাগ হইলেও নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুরাগ নহে। যে পরিবারবর্গ প্রায় আমাদের নিজেরই মত, সেই পরিবারবর্গকে নিজেরই মত ভালবাসিবে—ইহাই পারিবারিক অনুরাগ। এই অনুরাগ, —পিতা,মাতা, সন্তান—ইহাদের পরস্পরকে একটি সুমধুর অথচ সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে; পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা পাইয়া সন্তানগণ অমোঘ আশ্রয় লাভ করে এবং পিতামাতারও চিত্ত আশা ও আনন্দে পূর্ণ হয়। তাই, দাম্পত্য-অধিকারের প্রতি কিংবা পিতামাতার অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিলে, আত্মা-পুরুষের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, তাহাকেই আক্রমণ করা হয়।

তোমার ধনসম্পত্তির প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, কেন না উহা তোমার শ্রমের ফল। তোমার শ্রমের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; কারণ, স্বাধীনতাকে কাজে খাটানোই শ্রম। তুমি যদি তোমার ধন সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া থাক, তাহা হইলেও, যে স্বাধীন ইচ্ছা ঐ ধন সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়া গিয়াছে, সেই স্বাধীন ইচ্ছাকেও আমার সম্মান করা কর্ত্তব্য।

অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেই ন্যায়াচরণ বলে। কাহারও অধিকার লঙ্ঘন করাই অন্যায়াচরণ।

সকল প্রকার অন্যায়াচরণই আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষটির প্রতিই উৎপীড়ন; আমাদের লেশমাত্র অধিকার খর্ব্ব করিলেই, আমাদের নৈতিক পুরুষটিকেই খর্ব্ব করা হয়; অন্তত উহার দ্বারাই পুরুষকে জিনিসের পদবীতে নামাইয়া দেওয়া হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায়াচরণ কি? —না দাসত্ব। কেন না, সকল অন্যায়াচরণই এই দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর এক জনের লাভের জন্য, কোন ব্যক্তির সমস্ত মনোবৃত্তিকে তাহার সেবায় নিযুক্ত করাই দাসত্ব।

দাসের যে টুকু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধিত হয়—সে কেবল বিদেশী প্রভুর স্বার্থের জন্য। দাসের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভুর কাজে আসিবে বলিয়াই তাহাকে কতকটা তাহার বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিতে দেওয়া হয়। কখন-কখন ভূমির সহিত আবদ্ধ দাসকে সেই ভূমির সহিত বিক্রয় করা হয়; কখন বা দাসকে প্রভুর শরীরের সহিত শৃঙ্খলিত করা হয়। যেন তাহার কোন স্নেহ মমতা থাকা উচিত নহে, যেন তাহার কোন পরিবার নাই, তাহার পত্নী নাই, তাহার সন্তানসন্ততি নাই, এইরূপ মনে করা হয়। তাহার কাজ কর্ম্ম তাহার নহে, কেন না, তাহার পরিশ্রমের ফল অন্যের ভোগ্য। শুধু তাহাই নহে; দাসের অন্তর হইতে স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাবকে উন্মূলিত করা হয়, সর্ব্বপ্রকার অধিকারের ধারণাকে নির্ব্বাপিত করা হয়; কেন না, এই ভাবটি দাসের অন্তরে থাকিলে, দাসত্বের স্থায়িত্বের প্রতি দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না, কেন না তাহা হইলে এক সময়ে প্রভুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার জাগিয়া উঠিতে পারে।

ন্যায়-ব্যবহার, এবং যাহার উপর মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন,—ইহাই মানুষের প্রতি মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাই কি একমাত্র কর্ত্তব্য ?

আমরা যদি অন্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, যদি তাহার স্বাধীনতায় বাধা না দিই, তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উচ্ছেদ না করি, যদি তাহার পরিবারের প্রতি কিংবা তাহার ধনসম্পত্তির প্রতি আক্রমণ না করি, তাহা হইলেই কি আমরা বলিতে পারি—তাহার সম্বন্ধে আমরা সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিলাম ? মনে কর, একজন হতভাগ্য ব্যক্তি তোমার চোখের সাম্‌নে কষ্ট পাইতেছে ; আমরা তাহার কষ্টের কারণ নহি,—এইটুকু সাক্ষ্য দিতে পারিলেই কি আমাদের অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয় ? না ; কে যেন আমাদিগকে বলে,—তাহাকে একটু অন্নদান করা, আশ্রয় দান করা, সান্ত্বনা দান করা আরও ভাল।

এইখানে একটি গুরুতর প্রভেদ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। যদি তুমি অন্যের দুঃখ কষ্টকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কঠোর-হৃদয় হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার অন্তরাত্মা তোমাকে ভর্ৎসনা করিবে ; কিন্তু তাই বলিয়া, যে ব্যক্তি কষ্ট পাইতেছে,এমন কি মরিতে বসিয়াছে,—তোমার প্রভূত ধনসম্পত্তি থাকিলেও সেই ধন সম্পত্তির উপর সেই ব্যক্তির লেশমাত্র অধিকার নাই ; এবং সে যদি একগ্রাস অন্নও তোমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সে অপরাধী হইবে। এই স্থলে আমরা এমন এক শ্রেণীর কর্ত্তব্য দেখিতে পাই—যাহার অনুরূপ অন্যের কোন অধিকার নাই। কোন ব্যক্তি স্বীয় অধিকারের প্রতি সম্মান আদায় করিবার জন্য বলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু যতটুকুই হোক্ না কেন,—সে অন্যের নিকট হইতে ত্যাগ আদায় করিতে পারে না। ন্যায়পরতা অন্যের সম্মান বজায় রাখে, অন্যের অধিকার পুনরুদ্ধার করে। দয়াধর্ম্ম দান করে—স্বাধীন ভাবে, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দান করে।

দয়াধর্ম্ম অন্যকে দান করিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে নিজেকে বঞ্চিত করে। যখন দানশীলতা এতটা প্রবল হয় যে, আমাদের প্রিয়তম স্বার্থসমূহকেও বিসর্জ্জন করিতে আমরা উত্তেজিত হই—তখন সেই দানশীলতা আত্মত্যাগ নামে অভিহিত হয়।

অবশ্য এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে ; পরন্তু, ন্যায়-ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যের নিয়ম যেরূপ সুনির্দ্দিষ্ট ও দুর্গম্য, দানধর্ম্মের কর্ত্তব্যও সেইরূপ। দান কি ?—না অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার। ত্যাগের নিয়ম, কিংবা আত্মবিসর্জ্জনের মূলসূত্র কেহ কি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতে পারে ? কিন্তু ন্যায়ের মূলসূত্রটি সুস্পষ্ট :—অন্যের অধিকারকে সম্মান করা। দানধর্ম্মের কোন নিয়মও নাই, কোন সীমাও নাই। ইহা সকল বাধ্যতাকে অতিক্রম করে। উহার স্বাধীন চেষ্টাতেই উহার সৌন্দর্য্য।

কিন্তু একটি কথা এইখানে স্বীকার করা আবশ্যক :—দানধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও কতকগুলি বিপদ আছে। দানধর্ম্ম যাহার উপকার করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চেষ্টার স্থলে আপনার চেষ্টাকে স্থাপন করিবার দিকে তাহার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কখন কখন, দানধর্ম্ম সেই দান-

পাত্রের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ করে, সে একপ্রকার তাহার বিধাতাপুরুষ হইয়া দাঁড়ায় ঃ—মানুষের পক্ষে যাহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। অন্যের প্রয়োজন সাধন করিতে গিয়া, দানধর্ম্ম তাহাদের প্রভু হইয়া বসে এবং তাহাদের স্বাভাবিক অধিকারগুলির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেও পারে—এইরূপ আশঙ্কা হয়। অবশ্য অন্যকে কোন কাজে প্রবৃত্ত কিংবা কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত করা নিষিদ্ধ নহে। অনুনয় বিনয়ের দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। আবার যদি কেহ অপরাধের কাজ কিংবা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াও সে কাজ হইতে আমরা তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারি। যখন কেহ কুপ্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগে নীয়মান হইয়া তাহার স্বাধীনতা হারায়, তাহার ব্যক্তিত্ব হারায়, তখন তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবারও আমাদের অধিকার আছে।

কেহ আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকেও আমরা এইরূপে বল পূর্ব্বক নিবারণ করিতে পারি। যখন আমরা কাহারও সম্বন্ধে আত্মকর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে পরকীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করা আবশ্যক মনে করি, তখন দেখিতে হইবে তাহার কতটা স্বাধীনতার শক্তি আছে; কিন্তু ইহা কি করিয়া নিশ্চিত রূপে জানা যাইবে? যখন কোন দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির উপকার করিতে গিয়া, আমরা তাহার আত্মাকে একেবারে দখল করিয়া বসি, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে আমরা আরও বেশী দূরে যাইব না?—যাহার উপর আমাদের প্রেমের প্রভুত্ব, সেই ব্যক্তির উপর হইতে প্রেম চলিয়া গিয়া, অবশেষে তাহার স্থলে আমাদের প্রভুত্বের প্রেম আসিয়া পড়িবে না—ইহা কে বলিতে পারে? অনেক সময়, পরসম্পত্তি দখল করিবার উদ্দেশে, দানধর্ম্ম একটা সূচনামাত্র, একটা ছলমাত্র হইয়া থাকে। দয়ার উত্তেজনায়, অবাধে দান করিবার অধিকার আমাদের তখনই হয় যখন আমরা ন্যায়ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইয়া আপনার উপর দৃঢ় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

অন্যের অধিকারকে সম্মান করা, এবং অন্যের উপকার করা,—যুগপৎ ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল হওয়া—ইহাই সামাজিক ধর্ম্মনীতি; এই দুই উপাদানেই সামাজিক ধর্ম্মনীতি গঠিত। (ক্রমশঃ)

জাতিভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বন্ধনী-(Ligament)-সম্বদ্ধ অস্থিপরম্পরা দ্বারা শরীরের একটা সামান্য আকৃতি জন্মে, বিশেষ আকৃতি অর্থাৎ ভেদপরিচায়ক আকৃতি জন্মে না। তাহা পেশীসন্দর্ভের দ্বারাই জন্মিয়া থাকে। অভ্যন্তরস্থ ঐ আকৃতির নাম কঙ্কাল। দেহে দেহে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা মাংসময়ী পেশীর বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ বশতঃ। পেশীরই সন্নিবেশ (সাজান) বিশেষে দেহের সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য সংঘটন হয় এবং এ, সে, তুমি, আমি ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান জন্মে। সেই জন্য, পেশীশূন্য কঙ্কাল দেখিলে, যে ব্যক্তির কঙ্কাল সে ব্যক্তি কি আকৃতির মনুষ্য ছিল তাহা সহজে বুঝা যায় না। পেশী সন্নিবেশের ঐ শক্তি আপামর সাধারণ সকলেরই জানা আছে। যেমন, ব্যক্তিভেদে পেশী সন্নিবেশ বিভিন্ন, তেমনি জাতিভেদেও পেশী সন্নিবেশ বিভিন্ন; পরন্তু সে বিভিন্নতা সক-

লের উপলব্ধি গোচর হয় না। কারণ এই যে, পেশীর সন্নিবেশন ও তাহার স্বভাবাদি বিষয়ে অধিকাংশ লোকই অব্যুৎপন্ন; তাই তাহারা জাতিভেদে পেশী সন্নিবেশের প্রভেদ দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা এই রহস্যে ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা জাতিভেদে পেশীসন্নিবেশের প্রভেদ অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারেন। একজন ব্রাহ্মণকে যবন বেশে ও একজন যবনকে ব্রাহ্মণ বেশে সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন করিলে, তাঁহারা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন—এই লোকটা ব্রাহ্মণ ছিল ও ঐ লোকটা যবন ছিল। বীরাচারী তান্ত্রিকদিগের একটী কার্য্য দেখিলে সিদ্ধান্ত হইবে, জাতিভেদে অস্থিপ্রভৃতিরও বিভিন্নভাব জন্মে। আমাদের এই দেশে এখনও অনেক বীরাচারী তান্ত্রিক আছেন, তাঁহারা পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরি উপবেশন করতঃ জপ ধ্যানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রস্তুত করিতে চণ্ডাল-কঙ্কালের মস্তক লাগে। তাঁহারা যে চষক অর্থাৎ মদ্যপানের পাত্র ব্যবহার করেন, তাহাও চণ্ডালের মাথার খুলি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত সম্প্রদায়ের সাধকেরা কঙ্কালচ্যুত শত শত শুষ্ক নরমস্তকের মধ্য হইতে যেটী চণ্ডালের মস্তক সেইটীই চিনিয়া লয়েন। একদা এক সাধককে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন, মৃত মস্তক দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি—এটী চণ্ডালের মাথা, এটী চণ্ডালের মাথা নহে।

কোন্ লক্ষণে তাঁহারা বুঝেন, তাহা আমরা জানি না। ডাক্তারেরা যেমন, উর্ব্বস্থি দেখিয়া বুঝিতে পারেন,—এই উর্ব্বস্থি স্ত্রীলোকের ও এই উর্ব্বস্থি পুরুষের, তেমনি তান্ত্রিক সাধকেরাও বুঝিতে পারেন—এই মুণ্ড চণ্ডালের ও এই মুণ্ড ব্রাহ্মণের।

এ দেশের বাস্তুশাস্ত্রে একটী বিধান আছে। বিধানটীর নাম শল্যোদ্ধার বিধি। বিধানের বিবরণ এই যে, যে স্থানে মৃত্তিকার মধ্যে গর্দ্দভের, বানরের, কুক্কুরের, বিপ্রজাতীয় মানবের ও তদ্বিজাতীয় মানবের অস্থি থাকে, সে স্থানে তদুপরি গৃহ নির্ম্মাণ করিলে গৃহপতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অমঙ্গল হইতে থাকে। অস্থিভেদে অমঙ্গলের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। অমঙ্গল বাক্য দৃষ্টে গণকেরা গণনার দ্বারা জ্ঞাত হন, গৃহের অমুকস্থানে এত হাত মাটীর নীচে অমুক জাতীয় অস্থি আছে, তাই এই সকল অমঙ্গল হইতেছে। পরে সেই স্থানে খনন করিয়া অস্থি তুলিয়া ফেলা হয়, তখন গৃহস্থের অমঙ্গল স্রোত বিনিবৃত্ত হয়। এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদিত হইতে প্রবন্ধ লেখক দেখিয়াছেন। যদিও ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে অস্থির আকারগত কোন রূপ বৈলক্ষণ্য আমরা দেখিতে পাই না, অথবা বুঝিতে পারি না, তথাপি, সে সকলের শক্তিগত বৈলক্ষণ্য থাকা শল্যোদ্ধার বিধান দৃষ্টে অনুমিত হয়। যখন গৃহের অমুক স্থানে এত হাত মাটীর নীচে অমুকের অস্থি আছে, এ গণনা সকল সত্য হইতে দেখি, তখন আমরা ব্রাহ্মণাদি জাতির পরস্পর পার্থক্য থাকা অবিশ্বাস করিতে পারি না।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিবেক নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সাত্ত্বিক দেহ ষড়্‌বিধ, রাজস দেহ সপ্তবিধ ও তামস দেহ নানাবিধ। তন্মধ্যে মনুষ্য জাতীয় সাত্ত্বিক দেহের অন্য নাম আর্ষ-দেহ। যদিও সমুদায় দেহই অস্থি মজ্জা মাংস প্রভৃতির দ্বারা রচিত, যদিও প্রত্যেক দেহেই শোনিত ও পিত্ত প্রভৃতি

ধাতু আছে, যদিও দেহে দেহে যকৃৎ প্লীহা ও হৃদয় প্রভৃতি যন্ত্র আছে, দেহে দেহে শিরা ধমনী ও স্নায়ু প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, তথাপি ঐ সকল পদার্থের স্বভাব ও সন্নিবেশাদি সকল দেহে ঠিক সমান বা একরূপ নহে। দেহে দেহে ও অংশে অংশে প্রভেদ যুক্ত। যেমন দেহে দেহে প্রভেদ যুক্ত তেমনি জাতিভেদেও প্রভেদযুক্ত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতীয় দেহের শিরা সন্নিবেশাদি যেরূপ, সে সকলের কার্য্যকারিতা যেরূপ, ক্ষত্রিয় দেহে ঠিক সেরূপ নহে। কোন না কোন অংশে অতীব দুর্লক্ষ্য প্রভেদ বিদ্যমান থাকে। পুরাণলেখক ঋষি কল্কীপুরাণের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এইরূপ একটি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। "নাড়ী প্রকৃতিস্ত্রিবৃৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতীয় দেহের অভ্যন্তরগত নাড়ী প্রতানে ত্রিবৃৎপ্রকৃতি থাকা দৃষ্ট হয়। এই ত্রিবৃৎপ্রকৃতি কি? তাহা আমরা জানি না, বুঝিও না। সামান্যতঃ অনুমানে বোধ হয়, ব্রাহ্মণজাতীয় দেহের শিরাজাল ও স্নায়ুমণ্ডল যেরূপে, অথবা যদ্রূপ সংস্থানে অবস্থিত, অন্যজাতীয় দেহের অভ্যন্তরস্থ শিরাজাল ঠিক্ সেরূপ সংস্থানে সজ্জিত ও অবস্থিত অর্থাৎ সন্দর্ভিত নহে। কোননা কোন রূপে, কোননা কোন অংশে, বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ থাকে। ইহাই যদি প্রাগুক্ত ঋষির অভিহিত "নাড়ীস্থ প্রকৃতিস্ত্রিবৃৎ" কথার অর্থ হয়, আর উহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে ও মান্য করিতে বাধ্য যে, জাতিভেদ কথা কেবলমাত্র সমাজবন্ধনের জন্য সমাজস্থ লোকের কল্পিত নহে। অবশ্যই উহার প্রাকৃতিকত্ব কোন না কোন অংশে আছে অদ্যপি তাহা জনসাধারণের অজ্ঞাতে রহিয়াছে। অতএব, মনুষ্যের জাতিভেদ, এ কথা অশ্ব ডিম্বাদি কথার ন্যায় কেবলমাত্র জন কল্পনা প্রসূত নহে বলিয়া মনে হয় ও অনুমিত হয়। উহা প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি প্রসূত। প্রকৃতিই সেই, সেই প্রকারের প্রভেদ জন্মায়। যাঁহারা অনন্যচিত্তে প্রকৃতি-পুস্তক পাঠ করেন, তাঁহারা বলেন ও বুঝেন, মনুষ্য জাতির অবান্তরে বিশেষ বিশেষ জাতিভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিষয়ের ঋষি-সম্মত নিকর্ষ এই যে, মনুষ্যজীব সামান্যতঃ এক হইলেও ইহাদের অন্তর্গত প্রভেদ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। আর্য্য ও অনার্য্য। আর্য্য জাতির মধ্যে প্রাকৃতিক ভাবান্তর বা প্রভেদ প্রধানতঃ চার প্রকার এবং অনার্য্য জাতির অবান্তর ভেদ অনেক। এদেশের পুরাতন গণকাচার্য্যেরা কোষ্ঠী-গণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহ ব্রাহ্মণজাতির, মঙ্গল ও সূর্য্যগ্রহ ক্ষত্রজাতির, চন্দ্র বৈশ্য জাতির, বুধ শূদ্রজাতির ও শনি অন্ত্যজ জাতির অধিপতি। এইরূপ জাত্যধিপতি কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণজাতীয় দেহের সহিত বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের যেরূপ ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধ, ক্ষত্রাদিজাতীয় দেহের সহিত সেরূপ ফলদাতৃত্ব-সম্বন্ধ নহে। এতদনুসারে তাঁহারা যে কোষ্ঠীতে ফলাফল হওয়ার কথা বলেন, সে সকল প্রায়শঃ সত্য বৈ মিথ্যা হয় না। গণনার সত্যতা দৃষ্টে আমাদের মনে হয় বর্ণিত প্রকারের জাতিভেদ প্রকৃতি কর্ত্তৃকই ব্যবস্থিত, লোক কল্পনায় ব্যবস্থিত নহে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে অকৃতদার ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন সন্তানের বর্ণসঙ্করত্ব জন্মে কি না। এ প্রশ্নের সমাধান অন্য প্রস্তাবে অনুসন্ধেয়।

যাঁহারা জাতি নির্ব্বাচক ঋষি, তাঁহারা বলেন, ব্যভিচার, ঋতুদোষ, জাতীয় ধর্ম্মের

ও কর্ম্মের পরিত্যাগ ও উৎকট সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে সঙ্করবর্ণ অর্থাৎ বিকৃত জাতির উৎপত্তি হয়।• জাতিগত বিকৃতি প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত থাকে, পরে সেই বিকৃতির অনুবৃত্তি হওয়ায় ক্রমে তাহা বংশগত হইয়া পড়ে। পরন্তু ইদানীং কালে তাহার আর নির্ব্বাচন হয় না। না হইলেও বুঝিতে হইবে, চিরকালই বিশেষতঃ এখন বিখ্যাত বর্ণসঙ্কর ও প্রচ্ছন্ন বর্ণসঙ্কর, এই দ্বিবিধ বর্ণসঙ্কর জনসমাজে বাস করিত ও করিতেছে। "প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ।" কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে লেখা আছে, কলিশেষে পৃথিবী প্রখ্যাত ও প্রচ্ছন্ন এই দ্বিবিধ বর্ণসঙ্করে পরিপূর্ণা হইবে। প্রস্তাবের শেষ নিকর্ষ এই যে, যদিও আমরা শাস্ত্র ও যুক্তি অমান্য ও অগ্রাহ্য করি, তথাপি জাতি বিষয়ে একটী প্রত্যক্ষীকৃত পরীক্ষা স্বীকার করিতে বাধ্য। পরীক্ষাটি এই :—

দেখা যায়, দীর্ঘকাল কলসে প্রপূরিত থাকিলে গঙ্গাজল ব্যতীত আর সমুদায় জলে কীট জন্মে। এক স্থানে ও একই সময়ে, কোন এক শুদ্ধজাতীয় মানব এক কলসী ও অস্পৃশ্যজাতীয় মানব এক কলসী গঙ্গাজল আহরণ করিয়া রক্ষিত করুক। তিনি চার মাস বা ততোধিককাল পরে দেখিবেন, অস্পৃশ্য জাতির সংস্থাপিত কলসে কীট জন্মিয়াছে, পরন্তু স্পৃশ্যজাতির আহৃত কলসে কীট জন্মে নাই। এই ঘটনা দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, মানব জাতি এক হইলেও তাহাদের অবান্তরে অত্যন্ত প্রভেদ আছে। যাঁহারা ঐরূপ কীট জন্ম পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, গঙ্গা জল কেন স্রোতের জলেও কীট জন্মে না। তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ—পরীক্ষা করুন দেখিতে পাইবেন, এক মাত্র গঙ্গাজল ব্যতীত, আর সব জলে কীট জন্মে। এই প্রসঙ্গে আমরা স্পর্শ ঘটিত দুই চারিটী বিষয়বিকারের উল্লেখ করি, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারিবেন, বিশেষ বিশেষ পদার্থের বিশেষ স্পর্শ বিশেষ বিশেষ পদার্থে কোন না কোনরূপ বিকার উৎপাদন করে।

কোন্ পদার্থের কিরূপ স্পর্শ, কোথায় কিরূপ ক্রিয়া ও বিক্রিয়া জন্মায়, তাহা আমরা জানি না। আমরা কেন, বোধ হয় কোনও মনুষ্য স্পর্শরহস্যের সমগ্র মহিমা জ্ঞাত নহেন। লজ্জালু নামক উদ্ভিদ্ বায়ু প্রভৃতি নির্জীব পদার্থের তাড়না অনায়াসে সহ্য করে, ভেক ও জলৌকা প্রভৃতি সজীব পদার্থেরও আক্রমণ সহ্য করে, অথচ মনুষ্য জীবের অতি যৎসামান্য স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। স্পর্শমাত্রেই সংকুচিত ও ম্রিয়মান প্রায় হইয়া পড়ে।

কেন্নো-নামক কীটজাতীয় জীব আপন ইচ্ছায় বেড়ায়, তৎকালে তাহাদের গাত্রে নানা প্রকার পদার্থ স্পৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাদের কোন প্রকার বিকৃতি জন্মে না। কিন্তু যদি দৈবাৎ মনুষ্য কর্তৃক স্পৃষ্ট হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা গাত্র সংকোচ দ্বারা কুণ্ডলীকৃত হইয়া পড়ে।

গোয়ালারা বলে, দধি পাতার পর কিছু সময় তাহা ছুঁইতে নাই। ছুঁইলে অর্থাৎ স্পর্শ করিলে, দধি ভাল হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। ইহা ছাড়া আরও অনেক স্পার্শিক বিকারের স্থান আছে, সে সকল দেখিলে ও শুনিলে যবনস্পৃষ্ট গঙ্গাজলে কীটোৎপত্তি হওয়ার সংবাদ অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। শেষ কথা এই যে, গঙ্গাজলের ঐ তথ্য টুকু মুনি ঋষিদিগের অভিমত জাতিভেদের প্রাকৃতিকত্ব পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ।

পূর্ব্বকালে, বর্ণিত পাঁচ বর্ণের পরস্পর ব্যাভিচারে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহারা পৈত্রিক ও মাতৃক জাতীয় লক্ষণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল অর্থাৎ কোন কোন অংশে কিছু কিছু বিকৃত হইয়াছিল। তাই তাহারা বর্ণশঙ্কর জাতি বলিয়া তৎকালের লোক সমাজে প্রথিত হইয়াছিল। ব্যভিচারজাত মনুষ্যের সাঙ্কর্য্য ভাব প্রথমতঃ ব্যক্তিগত থাকে। তৎপরে ক্রমিক সন্তান পরম্পরা ধারা সেই সাঙ্কর্য্য প্রবাহিত হইয়া বংশগত হইয়াছিল। ক্রমে সেই সকল সঙ্কর জাতির বিশেষ বিশেষ শ্রেণী পৌর্ব্বকালিক সমাজের বিচারে অবধৃত হইয়াছিল; পরন্তু এখন আর তাহা হয় না। অর্থাৎ এখন যতই বিকৃত জন্ম হউক না কেন, তাহা হইতে এখন আর কোনরূপ অভিনব জাতির বা অভিনব শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হয় না। এই বিষয়ে আমরা এইরূপ বুঝি যে, যখন গো অশ্ব কুকুর প্রভৃতি পশুজাতীয় জীবে, পারাবত প্রভৃতি পক্ষিজাতীয় জীবে ও কাইন্ প্রভৃতি মৎস্যজাতীয় জীবে বিজাতীয় সঙ্গম জনিত বৈলক্ষণ্য জন্মিবার নিয়ম দৃষ্ট হয়, বীজ ক্ষেত্রের ব্যভিচারে শস্য ফলাদিরও ভাবান্তর জন্মিবার নিয়ম দৃষ্ট হয়, তখন যে ঐরূপ একটা নিয়ম মনুষ্য জীবেও আছে, সে পক্ষে সংশয় নাই। তবে কি না, ঐরূপ জাত্যন্তরাপত্তি-নিয়ম পশ্বাদি জীবে যতটা বিস্পষ্ট, মনুষ্য জীবে ততটা বিস্পষ্ট নহে এইমাত্র প্রভেদ।

পুরাণ পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বকালে বেণ রাজার রাজ্যশাসনকালে এই ভারতবর্ষে বিস্তর বর্ণসঙ্কর জাতি জন্মিয়াছিল। যথাঃ—

"অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিঃ প্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥"

শ্লোক কয়েকটীর সারার্থ এই যে, পশুর ধর্ম্ম দ্বিচারিণীত্ব। মনুষ্যের পক্ষে তাহা অতি গর্হিত। পুরাকালে বেণ রাজা মৃতপতিকা নারীদিগকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইতেন। তাই তৎকালে বিস্তর বর্ণসঙ্কর জাতি জন্মিয়াছিল। সেই হইতে সাধু লোকেরা এইরূপ বলিয়া আসিতেছেন যে, মৃতপতিকা নারীকে পত্যন্তর গ্রহণ করান অতীব গর্হিত।

এস্থলে "পতি মরিলে পত্যন্তর গ্রহণ" এই প্রসঙ্গে অন্য একটী কথা উত্থাপিত হইল। বেণ রাজার সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, আজকাল দেখা যায়, প্রায় সেইরূপ চেষ্টা হইতেছে। হয় হউক, ভালই, পরন্তু শাস্ত্রের দোহাই কেন? শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ঐ কার্য্য করিতে হইলে, আরও চারিটী স্থলে পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া গণ্য হইবে। পত্যন্তর গ্রহণের শাস্ত্র ত এই:—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

নষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘকাল অদর্শন। মৃত অর্থাৎ মরিয়া যাওয়া। প্রব্রজিত অর্থাৎ গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করা। ক্লীব অর্থাৎ রতিশক্তি নষ্ট হইয়া যাওয়া। পতিত অর্থাৎ মহাপাপজনক মদ্যপানাদি, অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও দীর্ঘকালব্যাপী ম্লেচ্ছসংসর্গাদি করা। পতি এই পাঁচ প্রকারের কোন এক প্রকার হইলে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ ও অন্য পতি গ্রহণ করিবেক। পরাশর ঋষির ব্যবস্থা চালাইতে হইলে, সমুদায় স্থলে বচনের দোহাই দিতে হইবে। নচেৎ কেবলমাত্র বিধবাকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইলে শাস্ত্র মান্য করা হইবে না।

এই প্রস্তাবের সকল অংশে আমরা সায় দিই না।

সহ সং।

প্রকাশ রূপ।

কার শক্তি বিশ্ব-মূলে থাকি বিদ্যমান,
জল স্থল শূন্যোপরি জাগাইছে প্রাণ।
ফুটাইছে জীবনের অনন্ত মুকুল,
চরাচর বিশ্ব যার সৌরভে আকুল।
কার তেজ রস রূপে ব্যাপিয়া ভুবন,
সঞ্চারিত করি সবে অমৃত-চেতন,
খুলি দেয় মরমের নিভৃত দুয়ার
তুলিয়া বিচিত্র সুরে চেতনা ঝঙ্কার।
কার যোগে মুক্তি-লোকে প্রবেশি মানব,
জীবনের সর্ব্ব ভার করিয়া লাঘব,
ব্যাপ্ত করে আপনারে চরাচর ময়
নাহি থাকে বাধা তার নাহি থাকে ভয়।
কোথা সে প্রকাশ রূপ আদি অন্ত হীন
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার বক্ষ মাঝে লীন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

১

তুমি দেব দয়াময় করুণা নিলয়,
সূর্য্যমুখী রবি পানে যথা চেয়ে রয়।
যেমতি সতীর প্রাণ রহে পতি পানে,
তেমনি রহিও জাগি ভক্তের পরাণে।

তোমারে কাতরে নাথ ডাকি অনিবার,
সুখ, দুঃখ, শান্তি, শ্রান্তি, বাসনা আমার
সকলি মিলিয়া যেন তব পানে ধায়,
তুমি হও সরবস্ব এ দীন হিয়ার।

যেন ধর্ম্ম ভক্তি মোরে নাগিনীর পাশে
বাধেনাক, মোর এই শোণিতে নিঃশ্বাসে
যেন প্রবাহিত হয়, সরল সুন্দর
হয় যেন জগদীশ বিশ্ব চরাচর।

শুদ্ধ নিরমল হোক হৃদয় আকাশ,
তুমি তাহে দীপ্ত রবি রহ সুপ্রকাশ।

২

দয়া কর জগদীশ দয়া কর মোরে,
তুমি মোর এক মাত্র সার।
হৃদয়ের মাঝে মোর মনের মন্দিরে,
আর কারো স্থান নাই আর।
তোমারে স্থাপিয়া চিত্তে নিখিল দেবতা
দিবা নিশি পূজিব চরণ,
কণ্ঠের মালিকা দলে তুমি যে মুকুতা
তোমারে করিব আভরণ।
সেই কণ্ঠ-হার শুধু জ্যোতিরাশি ভরা
হৃদয়ে করিবে ঝলমল,
ওই জ্যোতি সুধা পিয়ে আমি আত্মহারা
তোমাতেই রহিব বিভল।

৩

শতেক সুখের মাঝে সহস্র বন্ধনে,
নিশি দিন রাখি তোমা জাগায়ে স্মরণে।
শত সুখ হতে তুমি সুখ শ্রেষ্ঠতর,
জীবনে মরণে করি তোমাতে নির্ভর।
এক মাত্র শিক্ষদাতা ভরসা আমার,
তুমিই দেবতা মম ধ্যান ধারণার।
কর শুভ্র পুণ্যময় এ মোর হৃদয়,
সমস্ত জীবন মোর হোক তোমাময়।
আমার আপন শক্তি জ্ঞান আলো দিয়া,
কভু কি রাখিতে পারি এই ক্ষুদ্র হিয়া?
অনন্ত শকতিময় তব জ্যোতি দানে,
কেবল রক্ষিতে পার দুর্ব্বল সন্তানে।
জগদীশ তব শক্তি তব দয়া দিয়া,
কর পরিপূর্ণ এই ক্ষুদ্র দীন হিয়া।

৪

জীবন স্বরূপ হও জীবন আমার,
তুমি মোর হও প্রাণ মন।
শুধু ধর্ম্ম ভক্তিবলে মানেনাক আর
এ অশান্ত হৃদয় এখন।
তব অনুরক্ত ভক্ত, হব এ সাধনা
মেটেনাক তাহে শুধু আর,
তাই মোর এই সাধ এই আরাধনা
তুমি হও জীবন আমার।
জীবনের বায়ু যেন, নিঃশ্বাসের সম
মিলাইয়া যেও এই বুকে,
গোপন হৃদয়তলে আত্মা যেন মম
তাহলে রহিব সদা সুখে।

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

অধ্যেতার নিবেদন।*

আমরা মানুষ। মানুষ বলিলেই মনে একটি উচ্চভাবের উদয় হয়। পৃথিবীতে আরও অসংখ্য প্রকার জীব আছে। বৃহদাকার হস্তী হইতে চক্ষুর অগোচর জীবাণু, কাহারও কথা মনে হইলে কোন রূপ মহদ্ভাবের ত উদয় হয় না। সকল দেশ ও সকল যুগ মনুষ্য জন্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আসিতেছে। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ মানুষের জ্ঞান আছে। জ্ঞান বলে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া পঞ্চ ভূতকেও অনেক পরিমাণে আপনার আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের দয়া আছে। দয়া বৃত্তির পরিচালনা করিয়া মানুষ পরোপকারের, দরিদ্র ও আর্ত্তের সেবার কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ না এই মর্ত্তলোকে স্থাপন করিয়াছে। এই সকল সন্দর্শন করিলে মনে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হয়! এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গুণ আছে যাহার জন্য মানুষ এত বড়। সে সকল অদ্যকার আলোচ্য বিষয় নহে। ধর্ম্ম লইয়া মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ধর্ম্মের জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অন্য কোন জীবের ধর্ম্মে অধিকার নাই। ব্রহ্মকে জানা, জানিয়া তাঁহার কার্য্য করা এবং প্রীতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উপহারে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করা কেবল মানুষেরই অনন্যসাধারণ অধিকার। ক্ষুদ্র মনুষ্য সেই অনন্ত অবিনাশী সারাৎসার দেবদেব মহাদেবকে জানিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে এবং তাঁহার সহবাসে থাকিয়া ভূমানন্দ সম্ভোগ করিতেছে। একি মহৎ অধিকার!! মানুষ ভিন্ন আর কোন জীবই তাহাদের স্রষ্টা ও পরিপোষণ-কর্ত্তাকে জানিতে পারে না। কি কর্ত্তব্য কি পরিহার্য্য তাহা বুঝিবার তাহাদের শক্তি নাই। তাহাদের কোনও দায়িত্ব নাই—পাপ পুণ্য নাই—দণ্ড পুরস্কার নাই। না জানিয়া, অন্ধ-শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা কার্য্য করে। লোভে আকৃষ্ট ও ভয়ে বিতাড়িত হয়। তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা সকল পালন করিবার এবং তাঁহার পূজা করিবার মহোচ্চ অধিকার তিনি কেবল মানুষকেই দান করিয়াছেন। এই জন্যই মনুষ্য জীব-শ্রেষ্ঠ, আর আর সকলই নিকৃষ্ট জীব।

এই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দুর্লভ মানব-জীবন লাভ করিয়া কত আকুল নরনারী সেই ব্রহ্মকে জানিবার ও ধরিবার অভিপ্রায়ে যুগে যুগে নানা প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া দেবতা হইয়া গিয়াছেন। কেহ বা ঈশ্বরকে কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা জানিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন, আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কোন সাধক তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্রণিধান করিয়া সেই স্বরূপের সাধনা করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিগণ জ্ঞান-যোগে তাঁহাকে "সত্যং শিবং সুন্দরং" বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন। ব্রহ্মের যে ভাবে ঋষিরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সত্যং শিবং সুন্দরং বলিয়াছেন, ভিক্টর কুজেঁর হৃদয়তন্ত্রে সেই সুর বাজায় তিনি

---

* বিগত ৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অষ্ট-পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রবাবু উপাসনা করেন এবং শাস্ত্রী মহাশয় বেদী হইতে ব্যাখ্যান দেন। বেদীর নিম্নদেশ হইতে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক যে উপদেশ পাঠ করেন, তাহা "অধ্যেতার নিবেদন" বলিয়া প্রকাশিত হইল।

The True, the Beautiful, the Good, বলিয়া উঠিলেন। ঈশা তাঁহাকে জগৎ পিতা বুঝিয়া পুত্র ভাবে তাঁহার সাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেম ভক্তিতে তাঁহার ভজনা করিয়া নিজে ভগবৎ প্রেমে মত্ত হইয়া সমগ্র বঙ্গভূমিকে প্রেম ভক্তিরসে মাতাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা পরমাত্মাকে স্বামী ও জীবাত্মাকে পত্নী ভাবিয়া মধুর ভাবের সাধন করিয়াছেন। (Husband God and wife soul)। প্রোফেসর নিউম্যান বলিয়াছেন জীবাত্মা পরমাত্মাকে বিবাহ করিবে। পাণ্ডবেরা ভগবানের সখ্য ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সখা বলিয়া ডাকিয়াছেন। যোগী বুদ্ধদেব অষ্টসোপান মার্গ দিয়া সাধনা দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ভক্ত রাম-প্রসাদ ব্রহ্মের মাতৃভাবে বিমুগ্ধ হইয়া "মা" মন্ত্রের সাধনা করিয়াছেন। আস্তিকের—"জয় জগদীশ" রব, শৈবের "শিব শম্ভু" ধ্বনি, বৈদান্তিক ঋষিদের গগনস্পর্শী "সত্যং শিবং সুন্দরং" মন্ত্রের উচ্চারণ, ঈশার বিশ্বাসপূর্ণ "পিতা পিতা" বলিয়া ডাক, প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের হৃদয়ভেদী "দয়াল হরি" নাম গান সহ নৃত্য ও ক্রন্দন, পাণ্ডবদের সহৃদয় "সখা" সম্বোধন, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাক যোগ সাধন, শাক্ত রাম প্রসাদের ব্যাকুল কাতর প্রাণে "মা মা" শব্দ, সত্য সত্যই মানুষের গণ্ডদেশে অশ্রুসিক্ত এবং প্রাণকে উদ্বেলিত ককরে। এই সকল সাধন প্রণালী সাধকের হৃদয়কে উৎফুল্ল করে, মৃত আত্মায় জীবন সঞ্চার করে এবং নিরাশা ও অবিশ্বাসকে দূর করিয়া দেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সকল সাধনের মধ্যে কোনটিকেই পরিত্যাগ করেন না। সকলকেই সাধনের সহকারী করিয়া লন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানকে প্রহরী রাখিয়া সতত সাবধানে থাকিতে বলেন, যাহাতে কোনও প্রকার কুসংস্কার ও ব্যভিচার আসিয়া সাধনাকে কলুষিত না করে। একটি সুন্দর গান আছে—

বাউলের সুর। একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে॥
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয় বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা,
তোমার এ নহে সম্ভব, এ কি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।
ওহে, শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে;
তুমি হবে কেউ আমার
আপনার হতেও আপনার (তোমার পানে)
আপনার না হলে মন কি টানে॥

অদ্য ভগবানের মাতৃভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবার ইচ্ছা। তাহা বড় দুরূহ ব্যাপার নহে। আজীবন যাঁহার স্নেহে লালিত পালিত ও রক্ষিত হইতেছি, তাঁহার মাতৃভাব দেখা সুকঠিন নহে। এক অক্ষরের "মা" মন্ত্র বড়ই মিষ্ট। ইহার মধ্যে সকলই আছে। পিতা শব্দে মনে তাঁহার কঠোর শাসনের ভাব আসিতে পারে, তাঁহার শাসন ও দণ্ডের কথা অন্তরে জাগিতে পারে, তাঁহার ত্যজ্যপুত্র হইবার আশঙ্কা মনে আসিতে পারে, কিন্তু "মা" নাম বড়ই অমৃতপূর্ণ। স্নেহময়ী জননীর কথা মনে হইলে, সন্তানের আত্মা মাতৃপ্রেমে গদগদ হয়। যতই দুঃখ, যতই ক্লেশ, যতই যন্ত্রণা আসুক না, মায়ের কোলে বসিলে সব জুড়ায়—সকল জ্বালার শান্তি হয়। মা কোনও সন্তানকেই ত্যাগ করেন না। তিনি আড়ালে থাকিয়া সকলই বিধান করিতেছেন। কেহ তাঁহাকে চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পায় না। লুকাইয়া থাকিয়া তিনি সকলকে স্নেহে লালন পালন করেন। এমন মাতা আর কোথায় পাইব। অবাধ্য দুর্ব্বিনীত সন্তানের পাপ মুখে দুই বেলা

অন্ন-পান তিনি তুলিয়া দিতেছেন; কেমন করিয়া তাহাকে সৎ পথে ফিরাইয়া আনিবেন, সতত তাঁহার চেষ্টা করিতেছেন। এমন প্রেমময়ী দয়াময়ী মা আর কোথায় মিলিবে। স্বস্থ্যে বা সম্পদে যে তাঁহাকে ডাকে না, তাহাকেও রোগে বা বিপদে ফেলিয়া সংশোধন করিতেছেন, অথচ রোগ শয্যার পার্শ্বে থাকিয়া তিনি শুশ্রূষা করিতেছেন এবং বিপদে কাণ্ডারী হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। এ কেমন মা! শোক সাগরে ডুবাইয়া নিজের দিকে টানিয়া আনেন, অথচ তিনিই আবার সান্ত্বনা দেন। তাঁহার চরণে ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্য ভক্তের মাথায় আরও বোঝা চাপান। আমরা সংশয়াপন্ন। আমরা মনে করি মায়ের একি ব্যবস্থা। কিন্তু ভক্ত বুক পাতিয়া তাঁহার আঘাত সহ্য করেন, মাথা পাতিয়া তাঁহার বোঝা বহন করেন। শোকাশ্রু দিয়া তাঁহার পদসেবা করেন। এমন মা ত আর দেখি না। মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি অমৃতেতে লইয়া যান। দুঃখী পাপী তাপী সকলে মায়ের কোলে যাইয়া শান্তি লাভ করে। আমরা তাঁহার বিধান বুঝিয়া উঠিতে পারি না, মনে করি তাঁর একি অবিচার। বুঝি না "কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।" নিজ কোলে বসাইয়া স্বায়ী ব্রহ্মানন্দ দান করিবার জন্য তিনি উৎসুক। এমন মা আর কোথায় পাইব। আহা! বিপদে শোকে মুহ্যমান হইয়া, পাপে তাপে মলিন হইয়া যদি মা মা বলিয়া ডাকিতে পারি, সকল ভাবনা তিরোহিত হয়। যদি রোগশয্যায় মাতাকে দেখিতে পাই এবং মৃত্যুর সময় মাতার কোলে ঝাঁপ দিতে পারি, তাহা হইলে আর ভয় থাকে না। জীবনে মরণে, ইহ-পরলোকে তিনিই আমাদের আশ্রয় গতি ও মুক্তি। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই মাতৃপ্রেমের ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাই। তাঁহার সেই অতুলন স্নেহ নানা আকার ধারণ করিয়া তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে। সূর্য্যের রজত কিরণে তাঁহারই করুণা, চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কাঞ্চন-জ্যোৎস্নায় তাঁহারই প্রেম, বায়ুতে তাঁহারই কৃপা, মেঘে তাঁহারই অমৃতবারি বর্ষণ, এই সকলেতেই তাঁহার অনুপম কৃপা। জরায়ুশয্যায় অবস্থিতি কালে সেই স্নেহই জীবের সম্বল ও একমাত্র ভরসা। মাতৃক্রোড়ে শিশুর স্তন্যপান, সেই বিশ্বজননীকেই দেখাইয়া দেয়। দম্পতির পবিত্র প্রণয়ে তাঁহারই প্রেমের পরিচয়। ভ্রাতা ভগিনীর ও বন্ধুর অকৃত্রিম অনুরাগ সেই প্রেমেরই ছায়া মাত্র। পশুদিগের সন্তান পালনে, পক্ষীর শাবককে আহার দানে সেই পরমমাতার প্রেমের চিহ্ন পাই। পৃথিবীর পিতা মাতা সেই পরমমাতারই প্রতিনিধি। তিনিই এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া মাতৃরূপে জীবের সকল প্রকার অভাব মোচন করিতেছেন।

এই উৎসবক্ষেত্রে সেই পরম মাতা বর্ত্তমান। জ্ঞাননেত্রে একবার তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এই সকল ভক্তবৃন্দের মুখশ্রীতে সেই পরম মাতা দেদীপ্যমান। সকলের প্রাণের অভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণকে অবলোকন করিতে হইবে। আমাদের বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে ও অধোতে, অনন্ত আকাশে সেই পরম মাতার সত্তা; আমরা সেই অনন্ত সত্তা-সাগরে—অনন্ত রূপ সমুদ্রে অবগাহন করিয়া রহিয়াছি। মানুষ তাঁহার বড় প্রিয় সন্তান। তিনি আমাদিগকে জ্ঞান ও বিবেকে সুসজ্জিত করিয়া, স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন যে তাঁহাকে জানিয়া বুঝিয়া দেখিয়া প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা দিয়া তাঁহার

পূজা করিব। স্বাধীন মানুষের স্বেচ্ছাদত্ত প্রেমবিন্দু তিনি বড়ই ভাল বাসেন। তিনি আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের স্রষ্টা পাতা পরিপোষণ-কর্ত্তা পরিত্রাতা হইয়া আমাদের নিকট একটু প্রীতি একটু ভক্তি একটু কৃতজ্ঞতা চাহিতেছেন। আর আমরা কি তাঁহাকে তাহা দিতে কাতর হইব? আজ সেই পরম-মাতা আমাদের দ্বারে উপস্থিত। আর কিছুই চান না। কেবল এক বিন্দু প্রেম, এক বিন্দু কৃতজ্ঞতা চাহিতেছেন। তাহাও না দিয়া তাঁহাকে কি ফিরাইয়া দিব? যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সকল ঐশ্বর্য্যের স্বামী, যাঁহার সদাব্রত আমরা চিরজীবন উপভোগ করিতেছি, তিনি আমাদের দ্বারে উপনীত! যাঁহার ভাণ্ডার অন্ন পানে পরিপূর্ণ, ভিক্ষার্থী হইয়া তিনি আমাদের হৃদয়-কুটীরে দণ্ডায়মান। আমরা প্রেমের একমুষ্টি ভিক্ষা না দিয়া রিক্তহস্তে কি তাঁহাকে বিদায় দিব? কখনই না। আমাদের প্রেম ভক্তির যাহা কিছু আয়োজন আছে, তাহা তাঁহাকে দিতে কৃপণতা করিব না। আমাদের মধ্যে যিনি বিনা আয়োজনে আসিয়াছেন, এইক্ষণেই ভক্তিপুষ্পহার গাঁথিয়া হৃদয়-থাল ভরিয়া মায়ের চরণে অর্পণ করুন।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের নিকট কত ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। সেই জন্য সাধকেরা নানা সময়ে নানা নামে তোমাকে ডাকিয়া থাকেন। আমরা এখন তোমার মাতৃভাব দেখিয়া আজ তোমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। হে বিশ্বজননী! হে জগন্মাতা! হে আমাদের প্রতিজনের মা! আমরা তোমার অতি দীন হীন কাঙ্গাল সন্তান। আমরা সাধন জানি না, ভজন জানি না। আমাদের এমন কোন সম্বল নাই, যাহা দিয়া তোমাকে পরিতুষ্ট করিতে পারি। সকল সময় ত তোমাকে দেখিতে পাই না। আজ শুভ মুহূর্ত্তে এখানে তোমার দর্শন পাইব, এই আশায় বহু যত্নে কয়েকটি প্রীতি-কুসুম আনিয়াছি। প্রেমাশ্রুতে তোমার পদ প্রক্ষালন করিয়া, ভক্তিচন্দনে সেই ফুল চর্চ্চিত করিয়া আজ তোমার চরণে অঞ্জলি দিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া গ্রহণ কর এবং আমাদিগকে কৃতার্থ কর—ধন্য কর। করজোড়ে অবনত মস্তকে তোমার নিকট এই প্রার্থনা।

উপদেশ।

ভবানীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ। হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎই বর্ত্তমান ছিলেন। এই কথা বলিয়া বেদের ঋষি পুনরায় বলিলেন ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ তিনি একই অদ্বিতীয়। এই অকাট্য সর্ব্বজন সম্মত সত্য ঋষির অন্তর্ভেদ করিয়া কেমন সরল সহজ ভাবে বহির্গত হইল। সৃষ্টির বিচিত্রতা দর্শন ও সৃষ্টির তত্ত্ব-রহস্য অনুভব করিয়া পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া গেলেন যে, না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যিনি তত্ত্বদর্শী, তিনিই জানেন যে কারণ সৎ না হইলে কার্য্যরূপ সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সৎ বলিলে সৃষ্টি-স্থিতির অতীত বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু কেবল এই সৎবস্তুর উপলব্ধি মাত্রেই সাধকের প্রাণের পিপাসা মিটে না। তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং সেই পুরুষের উপাসনা করিয়া মুক্তির প্রার্থী হইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবের মুক্তির জন্য সেই মহান্ পুরুষের উপাসনা বিধি প্রচলিত করিয়াছেন। কিন্তু এই পুরুষ কল্পনা-প্রসূত কোন মূর্ত্তি হইলে চলিবে

না। যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, যিনি সৃষ্টির কারণ, যিনি সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছেন, যিনি সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত তিরোভাব কালে, খণ্ড প্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ে যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সকলে অমৃত পান করে, তাঁহাকে চাই। তাঁহাকে না পাইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িবেন না, ব্রাহ্মধর্ম্মের আগমন সিদ্ধ হইবে না। মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য মেঘ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইলে সে যেমন সেই সূর্য্যই, তেমনি মোহাচ্ছন্ন বৈদিক যুগের ঋষিদিগের পরিদৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রান্তি জাল-ভেদ করিয়া যে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা যথার্থই ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা সত্য। এ পরম সত্যকে যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, যদি আমাদের বিশ্বাস তাহাতে না যায়, যদি আমাদের গৃহে পরিবারের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা না দিতে পারি, তবে সত্যই আমাদের দুর্ভাগ্য। ভারতভূমি ধর্ম্ম-প্রসূ বলিয়া পৃথিবীতে যে গৌরব লাভ করিয়াছে তাহা একন্য নহে যে, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে সাধারণ ধর্ম্মনীতি বর্ত্তমান, যে, সত্য কথা বল, পরদ্রব্য হরণ করিও না, হিংসা করিও না; কেন না ইহা সকল জাতিরই ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যদিগের হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে, সমাজে শৃঙ্খলারক্ষা করিবার জন্য, পুণ্য ও পবিত্রভাবে সংসার ধর্ম্ম পরিচালনার জন্য। ইহাতে সংসার গতি নিবারণ হয় না, ইহাতে শাশ্বত আনন্দময় মুক্তি লাভ হয় না। ভারতের গৌরব এখানে নহে, ব্রাহ্মের গৌরব এখানে নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন মুক্তি—যে মুক্তি লাভ করিলে মানবের সংসার গতি নিবৃত্ত হয়, পুনঃ পুন জন্মগ্রহণের জ্বালা নিবারণ হয়। পুণ্যেন পুণ্যংলোকং নয়তি পাপেন পাপং। পুণ্যের দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় আর পাপ দ্বারা পাপলোক। কিন্তু পুণ্যের দ্বারা যতই উন্নত লোক প্রাপ্ত হই না কেন, তাহা তো লোক ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেখানেও যন্ত্র ধারণ করিতে হয়। যন্ত্রের যে দুঃখ তাহার আস্বাদন আমরা এই পৃথিবী লোকেই লাভ করিলাম, তবে আর কেন লোক-কামনা? এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম লোক-কামনা পরিহার করিতে বলিতেছেন এবং সেই মহান্ পুরুষের উপাসনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার উপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মই আমাদের লোক। ঋষিরা তো পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন—

> স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
> যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং।
> উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে
> শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥

যাঁহাতে আশ্রিত হইয়া এই সুন্দর বিশ্বজগৎ শোভাধারণ করিতেছে, সাধক সেই ব্রহ্মলোককে জানেন। যাঁহারা নিষ্কামভাবে সেই পুরুষের উপাসনা করেন সেই ধীরেরা জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ব্রহ্ম-পুরুষের উপাসনায় মুক্তি হয়। ব্রহ্ম-পুরুষের লক্ষণ কি? এই কথা বুঝিবার পূর্ব্বে মানব-পুরুষের লক্ষণ কি তাহা আমাদিগের বুঝিতে হইবে। মানব পুরুষ চক্ষুর দ্বারা দেখে, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে, নাসিকার দ্বারা আঘ্রাণ লয়, জিহ্বার দ্বারা রসাস্বাদন করে, মনের দ্বারা মনন করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্মে নিয়োগ করে। মানব-পুরুষ নিজের শরীরের—নিজের সংসারের কর্ত্তা। সে ইন্দ্রিয়গণ-গুণে গুণান্বিত, আর ব্রহ্মপুরুষ? ব্রহ্মপুরুষ "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।" সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশক কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। বিশ্বের

কর্ত্তা, বিশ্বের নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় এবং সকলের সুহৃৎ। আপনার কর্ত্তৃত্ব ভাব দ্বারা বিশ্বকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে হইবে, আপনার প্রভুত্বের ভাব দ্বারা বিশ্বপ্রভুর প্রভুত্ব বুঝিতে হইবে, আপনার আশ্রিত বাৎসল্যের ভাব দ্বারা এবং হৃদ্‌গত সৌহার্দ্দের দ্বারা সেই বিশ্ব কারণ এবং বিশ্ববন্ধুকে বুঝিতে হইবে। যে হেতুক "সনো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনি আমাদের বন্ধু তিনি আমাদের জনয়িতা এবং তিনিই বিধাতা। তাঁহাকে ছাড়িয়া কি আমাদের কোন কাজ চলে? ইহা পরম সত্য যে, তিনি আমাদের চক্ষুর চক্ষু বলিয়াই চক্ষু দেখে, কর্ণের কর্ণ বলিয়াই কর্ণ শ্রবণ করে, মনের মন এবং প্রাণের প্রাণ বলিয়াই মন মনন করে, প্রাণ প্রাণন করে ও আমরা বাঁচিয়া থাকিয়া সংসারে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হই। এবং "নহিত্বদারে নিমিষশ্চনেশে" তাঁহা হইতে ক্ষণ মাত্র দূর হইলেই আমাদের জীবন অচল হয়, জীবন শূন্য হয়। তবে কি আমরা এমন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কল্পনা প্রসূত মৃৎ পাষাণেই তাঁহার পূজা করিব? প্রখর বুদ্ধি ও শক্তি সম্পন্ন ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যদিগকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পূজা করিব? এত হতচেতন, এত মোহ মুগ্ধ হইয়া আমরা কি সংসার স্রোতেই চিরকাল ভাসমান থাকিব? না। "উত্তিষ্ঠত" উঠ "জাগ্রত" জাগ এবং প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকটে গিয়া জানিতে চেষ্টা কর। তুমি যে মনে করিয়াছ অতি সহজেই ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে, বিনা সাধনে, বিনা শিক্ষায় ব্রহ্মজ্ঞানের পথে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে, তাহা হইবে না; যে হেতুক, "ক্ষুরস্যধারা নিশিতাদুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়োবদন্তি"। তত্ত্বদর্শীরা বলিয়াছেন যে, এপথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় শাণিত এবং অতি দুঃখে অতিক্রমনীয় বলিয়া অত্যন্ত দুর্গম।

দেখিতে পাই যে বহু পরীক্ষোত্তীর্ণ বা বহু শাস্ত্রগ্রন্থী জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া তর্ক বলে স্বমত স্থাপনেই গৌরব বোধ করেন, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রহ্মপরায়ণ ধীর পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, "হবে কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তাঁহাকে না পাই"। তাঁহাকে পাওয়া চাই, তবে জীবন কৃতার্থ হইবে, তবে মুক্তির সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে। মুক্তির জন্য আত্মজ্ঞান চাই, আত্মজ্ঞানই জ্ঞান, আত্মজ্ঞানই আলোক যাহাতে তাঁহাকে দেখা যায় এবং পাওয়া যায়। এই খানেই সেই বিন্দু—সেই জ্ঞান-বিন্দুর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতেছে, যে জ্ঞান পূর্ণতায় বিন্দু নহে, অনন্তত্বে বিন্দু নহে, শক্তিতে বিন্দু নহে, ঘনতায় বিন্দু নহে, কিন্তু যাহাতে সমস্ত বিশ্ব নিঃশেষিত রহিয়াছে, যাহা সকল বৈচিত্রের এক আয়তন, সকল শক্তির এক উৎস, সকল জ্ঞানের এক প্রতিষ্ঠা। তাঁহাকে বিন্দুই বল বা মহৎই বল তাঁহাতে সকল দিগন্ত অন্তবৎ হইয়া প্রবিষ্ট রহিয়াছে, সকল বিশ্ব-শোভা তাঁহাতেই প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। তিনিই সৎ—তাঁহাতেই সৃষ্টি, তাহাতেই স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া পরিবর্ত্তনশীল জগতের বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতি মনের ধারণা স্থির করাও যা, আর মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করাও তাহা। এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়াই মহাতত্ত্বজ্ঞ উদ্দালক ঋষি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং।" ইনিই সকল জীবাত্মার মধ্যস্থিত এক পরমাত্মা। এই পরমাত্মার উপাসনা বিধি

প্রচলিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। ইহার মূলে মঙ্গল, ইহার মধ্যে মঙ্গল, ইহার অন্তে মঙ্গল। যদি মঙ্গল চাও তবে মঙ্গলময়ের শরণাপন্ন হইতে কালবিলম্ব করিও না। যদি বল এই মঙ্গলময়ের উপাসনা করিলে কি আমার অন্ন বস্ত্রের দুঃখ ঘুচিবে, ব্যাধি কি আমাকে আক্রমণ করিবে না, জরা কি আমার শরীরকে জীর্ণ করিবে না, মৃত্যু কি আমাকে লইয়া পলায়ন করিবে না? ইহার উত্তর এই যে, হাঁ, তাহারা সবই সব করিবে কিন্তু "রসপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ইহাদের যে রস অর্থাৎ জ্বালা সেই পরম পুরুষকে দেখিবা মাত্র নির্ব্বাণ পাইবে। চিত্তে তিনি ভীষণং ভীষণানাং রূপে, চিত্তে তিনি কর্ত্তারূপে, চিত্তে তিনি গতি রূপে, চিত্তে তিনি শান্তিরূপে আনন্দ রূপে বর্ত্তমান, আর তুমি তাঁহাতে ডুবিয়া রহিয়াছ। তোমার উপর দিয়া সংসারের যত তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে তোমাকে আঘাত না করিয়া। এমন শান্তির আলয়, মঙ্গলের আলয় আর কি আছে, যেখানে সব কুহক নিরস্ত হয়? আহা, ভাগবৎ কি পরম হিতকরী উপদেশই দিয়া গিয়াছেন—

> "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞ স্বরাট্।
> তেনে ব্রহ্ম হৃদায় আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
> তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
> ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

যিনি সৃষ্টবস্তু মাত্রেই বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে এবং অবস্তুতে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তৎ সমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে না, সুতরাং যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং তেজ, জল বা মৃত্তিকাদিতে অন্যবস্তুর যেমন ভ্রম হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যভাব হইতে স্বত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি, ভূত ইন্দ্রিয় ও দেবতা বস্তুত মিথ্যা হইয়াও সত্য রূপে প্রতীত হইতেছে, অথবা তেজে জল ভ্রমাদি যে রূপ বস্তুত অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা এবং যিনি আপনাতে আপনি বিরাজমান, যাঁহাতে সমস্ত কুহক নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সেই ধীশক্তি পরম পুরুষকে ধ্যান করিবার অধিকার তোমার, সত্যং জ্ঞানমনন্তং মন্ত্রে পরমাত্মাতে চিত্ত সমাধান করিবার অধিকার তোমার। বল এই সকল অধিকার হইতে আমরা কি বঞ্চিত থাকিব। পরমাত্মজ্ঞানের দীপশিখা কি আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করিয়া অন্ধকার দূর করিব না? সেই সত্য স্বরূপকে আমাদের গৃহদেবতা করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যায় তাঁহার পূজা করিব না? দেবগণ এবং ঋষিগণ অনিমিষ লোচনে যাঁহার প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া বিমুগ্ধ রহিয়াছেন, সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে আমরাও তাঁহারই অমৃত পান করিয়া অমর হইব, ইহাই আমাদের আশা এবং ইহাই আমাদের অধিকার। হৃদ্‌পদ্মাসনস্থ সেই পরব্রহ্মকে জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া প্রীতি-পুষ্পে তাঁহার পূজা করিলে মনুষ্যের মুক্তি হয়, তাঁহার আখ্যানে শাশ্বত জীবন লাভ হয়। নানক বলিয়াছেন, "আখাজীবা বিসরে মর যাও" তাঁহার আখ্যানেই জীবন এবং তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেই মৃত্যু।" আওখন আখা সাঁচা নাম সাঁচা নামকি লাগে ভুক্, ও খাবে সো তরিয়াবে দুখ।" যদি কাহারও

আখ্যান করিবে, তবে সেই সত্য নামেরই আখ্যান কর। যদি সত্য নামের সুধা হয়, তবে তাহা খাও, খাইলে সব দুঃখ দূর হইবে। যাঁহার নাম সত্য, তিনিই সত্য পুরুষ। এই পুরুষে বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা স্থিতি করিতেছেন।

> বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
> প্রাণাভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
> তদক্ষরং বেদয়তে যস্ত সৌম্য
> স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ॥

হে সৌম্য, জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ ও ভূত সকল যাঁহাতে স্থিত; সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সবই জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন।

অদ্য আমাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম ব্রহ্মোৎসবের রজনী। অদ্য এখানে দীপাবলীর শোভা, পুষ্প-স্তবকের বিকশিত মাধুরী দেখিতেছি, ঐ মধুর ব্রহ্মসঙ্গীতে কর্ণ শীতল হইতেছে। আর এই বিদ্বন্মণ্ডলীর মুখশ্রীতে কি শোভা, কি প্রতিভা পরিলক্ষিত হইতেছে। তথাপি কে যেন গোপন স্বরে বলিতেছে, ইহাতে প্রাণ কৈ? যিনি মানবকে ধী প্রদান করেন, তিনি যদি ধী দ্বারা পরিদৃষ্ট না হইলেন, তবে সে মানবকে প্রাণবন্ত বলিতে পারি না, যিনি প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ এবং আত্মার শান্তি, তিনি যদি তাহাতে বিরাজ না করিলেন তবে সে প্রাণ মন আত্মাকে জীবন্ত বলিতে পারি না। এক দিন যাহা ছিল পর দিন যদি তাহা না থাকে, তবে তাহাকে প্রাণবন্ত বলিতে পারি না। এক দিন ছিল যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আসিয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মের উপাসনা ও ব্রহ্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এক দিন ছিল যখন এই গৃহ হইতেই ব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রশ্ন উঠিত যে, ১, অন্তর্দৃষ্টি কি? বুঝাইয়া দাও। ২, সাধারণ মনুষ্য জাতির মধ্যেই আত্মজ্ঞান আছে, ইহা সপ্রমাণ কর। ৩, আত্মজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কি রূপ সম্বন্ধ। ৪, সেই ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান-জ্যোতি নির্ব্বাণ হয় কিসে? পাপাচরণ দ্বারা, অসদ্ভাব দ্বারা, কুতর্ক দ্বারা, এই স্থানটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও। ৫, অন্তর্বাহ্যে বিশ্বরূপ কার্য্যের আলোচনা কি? ৬, আত্মার পরিমিত ভাব হইতে কোন পরিমিত আশ্রয়কে মনে না হইয়া অনন্ত অপরিমিতকে মনে হয় কেন? আর ব্রহ্মচারীগণ এইরূপ কঠিন ধর্ম্মবিজ্ঞান সকলের সহজ উত্তর দানে আচার্য্যকে পুলকিত করিতেন। আজ কৈ সে ধর্ম্ম বিজ্ঞান, কৈ সে প্রবীন ব্রহ্মচারীবর্গ যাঁহারা আর্য্যকুলতিলকরূপে এই ব্রহ্মমন্দিরে আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় ইহাকে জীবন্ত করিয়াছিলেন? কোথায় বা নবীন ব্রহ্মচারীবর্গ যাঁহারা প্রাচীনদিগের স্থান অধিকার করিয়া এই ধর্ম্ম মন্দিরের স্তম্ভরূপে ইহাকে ধারণ করিয়া থাকিবেন। এখনো যে দুই একটি ক্ষীণ দীপ-শিখা এই গৃহে আলোক প্রদান করিতেছেন তাঁহারা তো নির্ব্বাণ প্রায়। সেই নিরাশার মধ্যেও আশা এই যে সেই প্রাচীন ব্রহ্মচারীবর্গের এক জন বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী এই উৎসবের উৎসাহদাতা হইয়া অদ্যকার উৎসবে আমাদিগকে উৎসাহ দান করিলেন। পূর্ব্বকার ব্রহ্মচারীগণের সংক্ষেপ নাম—শি, ক, মল্লিক; ব্র, না, চক্রবর্ত্তী; র, মা, ঘোষ; শী, চ, মুখোপাধ্যায়; প্রি, না, মল্লিক। ইঁহাদের এখনো যাঁহারা এই ভবধামে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, যদি তাঁহাদের সমবেত হস্ত পুনরায় এই ব্রহ্মকার্য্যে নিযুক্ত হয়, আমাদের আশা জাগ্রত হইবে, এই ব্রাহ্মসমাজ প্রাণবন্ত হইবে। ব্রাহ্মসমাজের

প্রথম প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় সমুদ্র পারে এবং তথা হইতে ব্রহ্মধামে যাইবার পর যত দিন না তাহার দ্বিতীয় প্রবর্ত্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়া ইহার কর্ণধার হইলেন, ততদিন যেমন আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট চির ঋণী, সেইরূপ এই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সকল সুহৃৎ যখন কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন, তখন ইহার সূত্রকে যিনি ধারণ করিয়া এখনো জীবিত রহিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিকটে তদ্রূপ ঋণী। তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ অতি বৃদ্ধ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি প্রয়াণের পথে পদার্পণ করিয়া ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এস ভাই, আজ আমরা তাঁহার জন্য সমস্বরে এই কল্যানবাণী উচ্চারণ করি যে—

"স্বস্তিবঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।"

এই অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী সেই জ্যোতির্ম্ময়ধামে যাইবার পথে তোমার কল্যাণ হউক।

নানা কথা।

দেবালয়। বিগত ১৩ আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে দেবালয়ের সাপ্তাহিক উপাসনায় পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপাসক সংখ্যা নর-নারীতে প্রায় চল্লিশ জন হইয়াছিল। "ঈশ্বর জাগ্রত সত্য" এই মর্ম্মে শাস্ত্রী মহাশয় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে জ্ঞানযোগে আমরা যে সত্যকে দর্শন করি, তিনিই ব্রহ্মপুরুষ। এই ব্রহ্ম-পুরুষের উপাসনাতেই মুক্তি। ইহার প্রমাণ স্বরূপ উপনিষদের আপ্ত-বাক্য সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে তার্কিক বাগ্মীদিগের আপাত মনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকের বিশ্বাসচ্যুতি ঘটিতে পারে, কিন্তু যিনি জ্ঞানের সাধনায় উপনিষদের মহান্ সত্যের ভাব হৃদগত করিতে পারেন, তাঁহার পতনের সম্ভাবনা নাই। এই উপদেশ সকলের যে হৃদ্য হইয়াছিল, উপাসনা শেষে সকলেরই ভক্তি-বিগলিত মুখের ভাবে ও ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছিল।

নূতন পুস্তক।—আমরা শ্রীযুক্ত ইন্দুব্রহ্মস্বামী মহাশয়ের রচিত ধর্ম্ম-সমাজ-প্রসঙ্গ নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আছে। উহা যশোহর জেলার শ্রীরামহর গ্রামে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য। মূল্য ॥০, ছাত্রদিগের জন্য ।০ আনা।

নূতক পত্রিকা।—ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়-বান্ধব নামক একখানি মাসিক পত্র ও সমালোচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে; উহা ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রকাশিত। পোদ জাতি আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাদের উৎকর্ষ সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। এই বিশাল হিন্দু জাতির মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে, তাহারা সকলে যদি স্ব স্ব উন্নতিলাভের জন্য সচেষ্ট হন, তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতি অচিরে সংসাধিত হয়। কেবলমাত্র তর্কসঙ্কুল পূর্ব্ব উচ্চ আভিজাত্যের স্পর্দ্ধা করিলে ফলোদয় নাই। পোদ জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আমরা কামনা করি। এই পত্রের বার্ষিক মূল্য মাশুল সহ এক টাকা মাত্র।
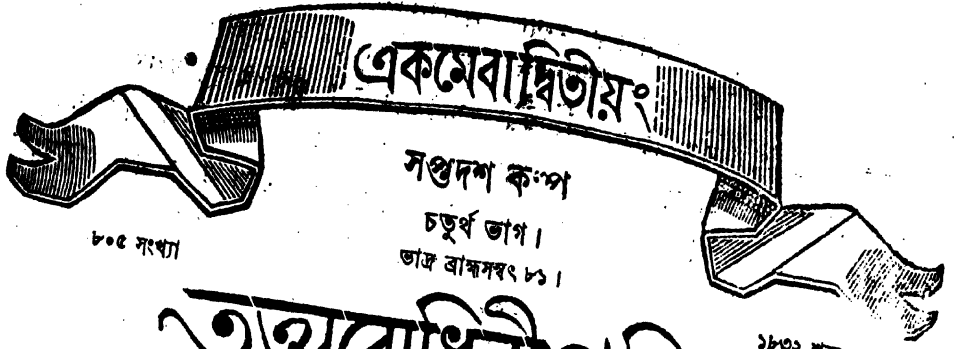
সপ্তদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
৮০৫ সংখ্যা
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা
১৮৩২ শক

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল

মঙ্গল।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)

আমরা সামাজিক নীতির কথা বলিতেছি, কিন্তু সমাজ জিনিসটা কি তাহা এখনও বলা হয় নাই। আমাদের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক্।

সর্ব্বত্রই দেখা যায়, সমাজ বিদ্যমান। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে মানুষ মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। সমাজ একটি সার্ব্বভৌম তথ্য, অতএব সমাজের একটা সার্ব্বভৌম পত্তন ভূমি থাকা আবশ্যক।

সমাজের উৎপত্তির মূল কি, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা এখন প্রবৃত্ত হইব না। গত শতাব্দীর দার্শনিকেরা এই প্রশ্নটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। যে প্রদেশটি তমসাচ্ছন্ন, সেখান হইতে কি প্রকারে আলোক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? একটা অনুমানের আশ্রয় লইয়া কিরূপে বাস্তব তথ্যের হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার হেতু নির্দ্দেশ করিবার জন্য, একটা আনুমানিক আদিম অবস্থায় আরোহণ করিবার প্রয়োজন কি? বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার অবিসম্বাদিত প্রকৃতি ও লক্ষণগুলি কি আলোচনা করিতে পারা যায় না? যাহার পূর্ণ অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, তাহা অঙ্কুরাবস্থায় কিরূপ ছিল,—অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া, সমাজের মূল-উৎপত্তির সমস্যায় হস্তক্ষেপ করার একটা সঙ্কট আছে। সমাজের উৎপত্তির মূল কেহ কি অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছে? যাঁহারা বলেন পাইয়াছেন তাঁহারা করেন কি?—না, তাঁহাদের কল্পনা-প্রসূত আদিম সমাজের আদর্শ-অনুসারে তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন; রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের হস্তে নির্দ্দয়রূপে সমর্পণ করেন। কেহ বা কল্পনা করেন,—সমাজের আদিম অবস্থা একটা বলপ্রয়োগের অবস্থা, জবরদস্তির অবস্থা; এবং এই অনুমান হইতে সূত্রপাত করিয়া তাঁহারা বলেন, "জোর যার মুলুক তার", এবং এই রূপে যথেচ্ছারকে তাঁহারা একটা পূজ্য আসন প্রদান করেন। আবার কেহবা মনে করেন,

—সমাজের আদিম রূপটি পরিবারের মধ্যে অধিষ্ঠিত, এবং তাই তাঁহারা রাজশক্তিকে পিতৃস্থানীয় ও প্রজামণ্ডলীকে সন্তানের স্থানীয় মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষে, সমাজ যেন একটি নাবালক, তাহাকে পিতৃশাসনের অধীনে, বরাবর থাকিতে হইবে, এবং যে হেতু, গোড়ায় পিতাই সর্ব্বময় কর্ত্তা, অতএব তাঁহার এই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব বরাবর বজায় রাখিতে হইবে। আবার কেহ কেহ ইহার বিপরীত সীমায় গিয়া উপনীত হন; তাঁহাদের মতে, সমাজ একটা চুক্তির ব্যাপার; এই চুক্তির বন্দোবস্তে, সর্ব্বজনের কিংবা অধিকাংশের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তাঁহারা ন্যায়ধর্ম্মের সনাতন নিয়মকে এবং ব্যক্তির নিজস্ব অধিকারকে, জনতার চির-চঞ্চল ইচ্ছার হস্তে সমর্পণ করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সমাজের শৈশবদশায়, শক্তিমান ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব, ন্যায়ত পুরোহিত সম্প্রদায়েতেই কর্ত্তৃত্বের প্রকৃত অধিকার বর্ত্তে; ঈশ্বরের গূঢ় উদ্দেশ্য তাঁহারাই অবগত আছেন এবং তাঁহারাই ঐশ্বরিক শাসনকর্ত্তৃত্বের একমাত্র প্রতিনিধি। এইরূপে, একটা দার্শনিক ভ্রান্ত মত, শোচনীয় রাষ্ট্রনীতিতে উপনীত হয়; একটা অনুমান হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহাদের মতবাদ উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা যথেচ্ছাচারিতায় আসিয়া পর্য্যবসিত হয়।

যে অতীতকাল চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহার কোন চিহ্নমাত্র নাই, সেই অতীতের অন্ধকারের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের অন্বেষণ করিয়া, সেই তথ্যের উপর প্রকৃত রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকে কখনই দাঁড় করান যাইতে পারে না। প্রকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

যেখানেই সমাজ আছে কিংবা ছিল—সেইখানেই সমাজের নিম্নলিখিত পত্তন-ভূমিটি দেখিতে পাওয়া যায়:—(১) মানুষ মানুষের সঙ্গ চায়, মানুষের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক সহজ সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে; (২) ন্যায় ও অধিকার সম্বন্ধে একটা স্থায়ী ধারণা আছে।

অসহায় দুর্ব্বল মানব যখন একাকী থাকে, তখন তাহার মনোবৃত্তির পুষ্টিসাধনের জন্য, তাহার জীবনকে বিভূষিত করিবার জন্য, এমন কি তাহার প্রাণধারণের জন্য, অন্য-মানুষের সাহায্য আবশ্যক বলিয়া তাহার অন্তরে একটা গভীর অভাব অনুভূত হইয়া থাকে। কোন বিচার না করিয়া, কোন প্রকার বন্দোবস্ত না করিয়া, সে তাহার সদৃশধর্ম্মী জীবদিগের নিকট হইতে বাহুবল, অভিজ্ঞতা, ও প্রেমের সাহায্য দাবী করিয়া থাকে। শিশু যখন মাকে না চিনিয়াও, মাতৃসাহায্যলাভের জন্য কাঁদিয়া উঠে, তখন তাহার সেই প্রথম ক্রন্দনেই সামাজিক সহজ-সংস্কারের ঈষৎ পরিচয় পাওয়া যায়। অনুকম্পা, সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি যে সকল ভাব অন্যের জন্য প্রকৃতি-দেবী আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন, সেই সকল ভাবগুলির মধ্যে এই সামাজিক সহজ-সংস্কারটি বিদ্যমান। ইহা স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণের মধ্যে, স্ত্রীপুরুষের মিলনের মধ্যে, পিতামাতার অপত্য স্নেহের মধ্যে, এবং অন্যান্য সকল স্বাভাবিক সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত। বিধাতা বিজনতার সহিত বিষাদের সংযোগ ও সজনতার সহিত হর্ষের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন;—তাহার কারণ, মানুষের সংরক্ষণ ও সুখসাধনের জন্য, জ্ঞান ও নীতির পরিপুষ্টির জন্য, সমাজ নিতান্তই আবশ্যক।

কিন্তু মানুষের অভাব ও সহজ সংস্কার

হইতে যে সমাজের সূত্রপাত হয়, ন্যায় বৃত্তিই তাহার পূর্ণতা বিধান করে।

একজন মানুষকে যখন আমরা সম্মুখে দেখি, তখন কোন বাহ্য নিয়মের আবশ্যক হয় না, কোন চুক্তি বন্দোবস্তের আবশ্যক হয় না,—সে মানুষ, অর্থাৎ,সে বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বাধীন জীব, এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হয়; তাহলেই আমরা তাহার অধিকার গুলিকে সম্মান করি—সেও আমার অধিকারগুলিকে সম্মান করে। আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের পরস্পরের কর্ত্তব্য ও অধিকার সমান। সে যদি এই অধিকার-সাম্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বকীয় বলের অপব্যবহার করে, তাহলে আমিও আত্মরক্ষার অধিকার ও তাহার নিকট হইতে সম্মান আদায় করিবার অধিকার জারি করিতে প্রবৃত্ত হই। এবং যদি আমাদের দুইজনের অপেক্ষা বলবান আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি,—যাহার এই বিবাদ কলহে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই,—এইসময়ে আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে,—তখন সেই তৃতীয় ব্যক্তি বল প্রয়োগের দ্বারা, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, এমন কি, অন্যায়াচরণের জন্য অত্যাচারীর প্রতি দণ্ডবিধান করা তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। ইহাই সমাজের পূর্ণ আদর্শ; এবং ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য, শাসন ও দণ্ড এইগুলি সমাজের অন্তর্নিহিত মুখ্যতত্ত্ব।

ন্যায়পরতাই স্বাধীনতার প্রতিভূস্বরূপ। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, পরন্তু যাহা আমার করিবার অধিকার আছে তাহা করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রচণ্ড আবেগের স্বাধীনতা ও খেয়ালের স্বাধীনতার পরিণাম কি?—না, যাহারা খুব দুর্ব্বল, তাহারা বলবানের অধীন হয়, এবং যাহারা খুব বলবান তাহারা স্বকীয় উচ্ছৃঙ্খল বাসনার বশীভূত হইয়া পড়ে। প্রচণ্ড আবেগকে দমন করিয়া ও ন্যায়ের অনুগত হইয়াই মানুষ স্বকীয় অন্তরাত্মার মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। উহাই আবার প্রকৃত সামাজিক স্বাধীনতারও আদর্শ। সমাজ আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে—এই যে একটি মত, ইহার ন্যায় ভ্রান্ত মত আর দ্বিতীয় নাই। স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা দূরে থাকুক, সমাজই স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, পরিপুষ্ট করে; সমাজ স্বাধীনতাকে দমন করে না, প্রত্যুত মনের প্রচণ্ড আবেগকে দমন করে। সমাজ যেরূপ স্বাধীনতার কোন হানি করে না, সেইরূপ ন্যায়েরও কোন হানি করে না। কেননা, সমাজ আর কিছুই নহে—ন্যায়ের ভাব, বাস্তবে পরিণত হইলেই সমাজ হইয়া দাঁড়ায়।

ন্যায়, স্বাধীনতাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমাজকেও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে। মানসিক শক্তি ও দৈহিক বলসম্বন্ধে সকল মনুষ্যের মধ্যে সমতা না থাকিলেও, তাহারা সকলেই স্বাধীন জীব;—এই স্বাধীনতার হিসাবেই সকল মনুষ্যই সমান, সুতরাং সকলেই সম্মানের যোগ্য। যখনই মানুষের মধ্যে পবিত্র নৈতিক পুরুষের লক্ষণ উপলব্ধি করা যায়, তখনই মানুষ মাত্রই একই অধিকার সূত্রে ও সমান পরিমাণে সম্মানার্হ বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্বাধীনতার সীমা স্বাধীনতার মধ্যেই বিদ্যমান; অধিকারের সীমা কর্ত্তব্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত। স্বাধীনতা ততক্ষণই সম্মানের যোগ্য হয় যতক্ষণ অন্যের স্বাধীনতার হানি না করে। তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাহা অবাধে করিতে পার—শুধু এই একটি মাত্র করারে যে, তুমি আমার স্বাধীনতা

আক্রমণ করিবে না। কেননা তাহা হইলে, স্বাধীনতার সাধারণ অধিকারসূত্রেই, আমার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমি তোমার বিপথগামী স্বাধীনতাকে দমন করিতে বাধ্য হইব। সমাজ, প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রতিভূস্বরূপ; অতএব যদি একজন অপরের স্বাধীনতাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে স্বাধীনতার নামেই তাহাকে দমন করা যাইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত, ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা একটি পবিত্র জিনিস; এমন কি, তোমার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে, কোন একটা উদ্ভট উপধর্ম্মকেও তুমি পোষণ করিতে পার; কিন্তু যদি তুমি কোন দুর্নীতিমূলক ধর্ম্মমত প্রকাশ্যে প্রচার করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার সহরাষ্ট্রিকদিগের স্বাধীনতা ও বিবেক-বুদ্ধির প্রতি আক্রমণ করা হইবে। তাই এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার নিষিদ্ধ। এইরূপ দমনের আবশ্যকতা হইতেই দমনের সুব্যবস্থিত প্রভুশক্তির আবশ্যকতা প্রসূত হয়।

ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, এই প্রভুশক্তি কতকটা আমার মধ্যেও আছে ঃ—কারণ, আমাকে অন্যায়রূপে কেহ আক্রমণ করিলে, আমারও আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান নহি, দ্বিতীয়তঃ আপনার কার্য্য সম্বন্ধে কেহই অপক্ষপাতী বিচারক হইতে পারে না; যাহাকে আমি বৈধ আত্মরক্ষার চেষ্টা বলিয়া মনে করি, তাহা হয়ত অন্যের প্রতি অত্যাচার বা জবর্দ্দস্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

অতএব প্রত্যেকের অধিকার রক্ষার জন্য এমন একটা অপক্ষপাতী প্রভুশক্তির প্রয়োজন যাহা ব্যক্তিবিশেষের সমস্ত শক্তি হইতে উচ্চতর।

এই প্রভুশক্তি, এই অপক্ষপাতী তৃতীয়, যাহা সকলের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য আবশ্যকীয় ক্ষমতার দ্বারা সুসজ্জিত,—এই প্রভুশক্তিকেই রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্তি বলা যায়।

রাজশক্তিই সকলের ও প্রত্যেকের অধিকারের প্রতিনিধি। যে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার, ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে সমর্থিত হইতে পারে না—তাহা এমন একটা সর্ব্বোচ্চ প্রভুশক্তির হস্তে সমর্পিত হওয়া আবশ্যক, যে শক্তি সাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে, নিয়মিতরূপে ও ন্যায্যরূপে বল প্রয়োগ করিতে পারে।

গুহাহিত।

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন—"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং"—অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা কিছু প্রকাশিত তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ় যা গভীর তাকে উপলব্ধি করবার জন্যে আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা' যদি না থাকতো তা হলে সে দিকে আমরা ভুলেই মুখ ফিরাতুম না; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে বলেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ করে' কেবল বাইরের জিনিষে সন্তুষ্ট থাকেনি। তাই সে চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্চে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্চে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে বের করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল? যা কিছু পাচ্চি তার

মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্চিনে, যা' পাচ্চিনে তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে—এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল ?

পশুদের মনে ত এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারই মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্চে—মুহূর্ত্তকাল জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে, যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম কর্‌তে পারচে না বলে' তার মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না—এমন কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে দেখ্‌তে পাচ্চিনে কিন্তু আরও আছে, শোনা যাচ্চে না কিন্তু আরও আছে।

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেল্লেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সে রকম নয়—এ আচ্ছন্ন বলে গুপ্ত নয়, এ গভীর বলে'ই গুপ্ত—সুতরাং একে যখন আমরা জান্‌তে পারি তখনো গভীর থাকে। গোরু উপরের থেকে ঘাস্ ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটী চিরে সেই ঘাসের মুথা উপড়ে খেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নীচেকার মুথার প্রকৃতিগত কোন প্রভেদ নেই, দুইটি স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই সমান রকমেই পেট ভরে। কিন্তু মানুষে গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে প্রকাশ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে, সাদৃশ্য নেই। তা' খনির ভিতরকার খনিজের মত তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিষ নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চেয়ে বেশি মূল্যবান্ রত্ন বলে'ই জানে।

তার মানে আর কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে, তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এই জন্যেই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এই জন্য মানুষ—আকাশে তারা আছে—কেবল এই টুকু মাত্র দেখেই মাটীর দিকে চোখ ফেরায় নি—এই জন্যে কোন্ সুদূর অতীতকালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরুপ্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথ রাত্রের আকাশপৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্করহস্য পাঠ করে' নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ নিদ্রাহীন নেত্রে যাপন করেছে;—তাদের যে মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারো সে দিকে তাকাবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না। এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ কর্‌তে কর্‌তে মানুষ যে কেবল সত্যকেই উদ্ঘাটন করেছে তা বলতে পারি নে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এক-কে আর বলে জেনে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠ্‌তে হয় তার সীমা নেই, কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে ত একেবারে মিথ্যা বলে' উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে যে সত্য বলে' গ্রহণ করেছি

তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূত প্রেত কত অদ্ভূত কাল্পনিক মূর্ত্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগ্‌লি ওঠে তার থেকেই জাল ফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেল্‌চে তার থেকে এ পর্য্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা এইটেই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার;—আফ্রিকার বন্য বর্ব্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয় পাই তখন তাদের অদ্ভূত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্ত্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, এ-কে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মান্‌তে চায় না। এখানে সমুদ্র পর্ব্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না, বারম্বার নিস্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না—এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারে।

মানুষ যে দ্বিজ তার জন্মক্ষেত্র দুই-জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করচে, সেজন্য তাকে চতুর্দ্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয়। তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয় কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জ্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি—এমন কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড় করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে গোপনের দিকে গভীরতার দিকে মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখনই মানুষ বড় হয়ে ওঠে, ভূমার দিকে অগ্রসর হয়, তখনি মানুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম যা প্রত্যক্ষ তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না, এইজন্য কেবলমাত্র সেই দিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তাহ'লে দেখ্‌তে পাচ্চি মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত—সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত, তাঁর সঙ্গেই কারবার করে—সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক, সেইখানেই তার স্থিতি তার গতি; সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না—তাকে মাপ করে' ওজন করে' দেখবার কোনো উপায়ই নেই—তাকে যদি

কোন স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে' বসে, যদি বলে, কি তুমি পেলে একবার দেখি—তা হলে বিষম সঙ্কটে পড়্‌তে হয়। এমন কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আব্দার চলে না। আমরা দেখাতে পারি ভারী জিনিষ হাতে থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারি নে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে আমি সমুদ্র দেখ্‌ব, আমি হিমালয় পর্ব্বত দেখ্‌ব, তবে তাকে একথা বল্‌তে হয় না যে, আগে তোমার চোখ দুটোকে মস্ত বড় করে তোলো তবে তোমাকে পর্ব্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব—কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বল্‌তেই হয় একটু বোসো; গোড়া থেকে সুরু করতে হবে; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত কর তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ মেল্‌লেই চল্‌বে না, কান খুল্‌লেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। মূঢ় যদি বলে, না, আমি সাধনা করতে রাজি নই, আমাকে তুমি এ সমস্তই চোখে দেখা কানে শোনার মত সহজ করে' দাও,—তবে তাকে, হয়, মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয়, তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে' গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং" বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখা শোনার সামগ্রী করে' বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আব্দার আমাদের খাট্‌তেই পারে না। এই আব্দার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেক সময় খুঁজে থাকি—কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজ করে দিচ্চি; বলে', সেই যিনি "নিহিতং গুহায়াং" তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন খুসি এক রকম করে' দাঁড় করিয়ে দেন তাহলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন। এ রকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বল্‌বার কথা যে, মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর বলে'ই তাঁকে চায়—সেই গভীর আনন্দ আর কিছুতে মেটাতে পারে না বলে'ই তাঁকে চায়—চোখে দেখা কানে শোনার সামগ্রী জগতে যথেস্ট আছে—তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা ত দিন রাত ঘুরে বেড়াচ্চে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে সমস্ত কিছু চায় না বলে'ই একাগ্রমনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে'ই তাঁর সাধনা কর, এবং যখন তাঁকে পাবে তোমার "গুহাশয়" রূপেই তাঁকে পাবে—অন্যরূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না; সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্চে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্চে তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না—তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্চে। যিনি ভূমা, সর্ব্বত্রই তিনি গুহাহিতং,—কি সাহিত্যে, কি ইতিহাসে, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়া র মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—এই কথাটি যে মানুষ বল্‌তে পেরেছে এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এই জন্যেই সে গভীরকে

চায়—তবু যদি তুমি বল আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও তবে তুমি আর কিছুকে চাচ্চ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনচি, অনায়াসে বুঝচি, তার মত কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতি প্রত্যক্ষ গোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজ দেখাশোনার আবরণ ভেদ করে'ই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা কিছু পাওয়ার মত পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্ম্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ করে' তবে কর্ত্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধা তৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মত সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এই জন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্চে—বারম্বার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে পারচে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্ম্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে। ভালবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করচে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য্য হোক্ এ-কে সে কোনো মতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না; তাকে বল্‌তেই হবে যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন—কেননা, তাঁর পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি।

জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে মানুষের পক্ষে সর্ব্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্ম্ম সর্ব্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম করে' গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে' থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা করে' আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে একথা বলে না, টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে,—টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মত সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উল্টা কথা বল্‌তে যাব! কেন বল্‌ব তাঁকে আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই! কেন বল্‌ব আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ করে তাঁকে হাতে হাতে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব।

না, কখনো তা আমরা চাই নে। তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে' সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে' একটু একটু করে' বিকশিত হয়ে উঠ্‌চে। হে গূঢ়! তুমি গূঢ়তম বলে'ই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্ম্মকে গভীর হতে গভীরতরে

আকর্ষণ করে' নিয়ে যাচ্চে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্চে, তার বন্ধন আল্‌গা করে দিচ্চে, তার জীবন মরণের তুচ্ছতা দূর করচে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম স্বর আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আস্‌চে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্তই তোমার ঐ অনির্ব্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্চে। মানবচিত্তের এই আকাঙ্খার আবেগ এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে' চলেছ। হে গুহাহিত তোমার গোপনতার শেষ নেই বলে'ই জগতের যত প্রেমিক যত সাধক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; এমন মধুর করে' তাঁরা দুঃখকে অলঙ্কার করে' পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে' বরণ করেছেন। তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটচে—তারা, বল তেজ সম্পদ সমস্ত হারিয়েছে—তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলি ছোটো ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্ব্বল কল্পনা করে' তোমাকে যারা সুলভ করতে চেয়েছে তারা মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ গৌরবকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে' দিয়েছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু,—প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।" তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে' না দেখি। তোমাদের ঐ পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে ততই তার কাব্য সঙ্গীত ললিতকলা অনির্ব্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠচে, ততই তার জ্ঞান, সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম্ম, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য-সীমা অতিক্রম করচে—তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠচে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চল্‌ব—আমার সমস্ত যাত্রাসঙ্গীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্য্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে,—পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে কোনো ছোটোকে কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে—আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে' যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে' না দেয়।

সৃষ্টির বিশালতা।

ভূতলের কোন স্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া যদি তাহাকে ক্রমেই গভীরতর করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। ইহার পরও গভীর করিতে থাকিলে গর্ত্তটি ভূপৃষ্ঠের অপর প্রান্তে গিয়া শেষ হয়। তখন আর সেটি গর্ত্ত থাকে না, একটা আট হাজার মাইল দীর্ঘ ঋজু সুড়ঙ্গে পরিণত হয়। ইহার এক প্রান্তে মুক্ত

আকাশ, অপর প্রান্তেও মুক্ত আকাশ, এবং ঠিক মাঝে পৃথিবীর কেন্দ্র অবস্থান করে।

এখন সুড়ঙ্গে একখণ্ড পাথর ফেলিয়া দিলে তাহার অবস্থা কিপ্রকার হয় বিবেচনা করা যাউক।

পৃথিবীর আকার গোল বলিয়া ইহার আকর্ষণী শক্তি কেন্দ্রেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই প্রস্তরখণ্ডটি কেন্দ্রের দিকেই ছুটিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়াই ইহা স্থির থাকিবে না। ভূতল হইতে কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতে যে বল সঞ্চার করিয়াছে তাহাই উহাকে কেন্দ্র ছাড়াইয়া সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে উপস্থিত করাইবে। কিন্তু এখানেও জিনিসটি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইবে না। কেবল ক্ষণিকের জন্য স্থির থাকিয়া সেটি আবার কেন্দ্রের দিকে নামিতে আরম্ভ করিবে। ঘড়ির দোলক (Pendulum) যেমন অবিরাম চলাফেরা করে, প্রস্তর-খণ্ডটিকে সেই প্রকার-দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। কোন প্রকার বাধা না পাইলে উহা চিরকাল সুড়ঙ্গ-পথে পৃথিবীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ক্রমাগত যাওয়া আসা করিতে থাকিবে।

জিনিসকে যতই ঊর্দ্ধ্ব হইতে ফেলা যায় ভূতলে পড়িবার সময় তাহার বেগ ততই বাড়িয়া চলে। এই বেগবৃদ্ধির নিয়ম নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়। গতিবিজ্ঞানের ইহাই প্রথম সূত্র। সুতরাং সুড়ঙ্গপথের সেই প্রস্তর-খণ্ডটি পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইলে যে, কত বেগবান্ হইবে তাহা আমরা সহজেই স্থির করিতে পারি। এই প্রকার হিসাবে দেখা গিয়াছে কেন্দ্রে পৌঁছিলে উহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় পাঁচ মাইল হইয়া দাঁড়ায়।

এখন মনে করা যাউক, ভূগর্ভে যত শিলামৃত্তিকা প্রভৃতি লঘু-গুরু পদার্থ আছে তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ যেন আমরা স্থানান্তরিত করিয়া, বাকি একভাগকে কোন গতিকে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছি। বলা বাহুল্য এই অবস্থায় সেই প্রস্তর খণ্ডটি তাহার ভ্রমণ পথটিকে কখনই ত্যাগ করিবে না। নূতন ব্যবস্থায় তাহার বেগের পরিমাণ কমিয়া যাইবে মাত্র।

আর একবার কল্পনা করা যাউক, যেন পৃথিবীর সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পরস্পরের দূরত্বের অনুপাতকে ঠিক রাখিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। ব্যাসের পরিমাণকে হঠাৎ লক্ষ লক্ষগুণ বড় করিয়া পৃথিবীকে ফাঁপাইয়া তুলিলে, সে যতটা স্থান অধিকার করিত এখন সেই বিচ্ছিন্ন শিলা এবং মৃৎপিণ্ডগুলি ঠিক সেই স্থানই জুড়িয়া থাকিবে।

শতকরা ৯৯ ভাগ মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করায় সেই সুড়ঙ্গের শিলাখণ্ডের বেগ অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। এখন আবার অবশিষ্ট অংশগুলি দূরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়, উহার বেগ আরো কমিয়া আসিবে, কিন্তু সুড়ঙ্গ দ্বারা যে পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, উহা কোনক্রমে তাহা ত্যাগ করিবে না।

আমাদের সূর্য্য যে নক্ষত্র পুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক তাহা যে কত বৃহৎ, সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী নিউকুম্ব সাহেব, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। নিউকুম্বের বিশেষ পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। ইনি জ্যোতিষিক গণনার যে সকল কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, অদ্যাপি গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নির্ণয়ে তাহাই অবলম্বিত হইতেছে। যাহা হউক, যে অসংখ্য মহাসূর্য্যের ন্যায় নক্ষত্রগণ কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া

এই মহাকাশে বিচরণ করিতেছে তাহাদেরই সমবেত আকর্ষণের পরিমাণ নির্ণয় করা নিউকুম্ব সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একবারে বৃহৎ ব্যাপার লইয়া হিসাবে বসিলে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। ক্ষুদ্রকে লইয়া কোন একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে, তাহাকেই টানিয়া বৃহতের দিকে অগ্রসর হইলে অনেক সময় হিসাবের সুবিধা হয়। নিউকুম্ব সাহেব আমাদের পরিচিত ব্রহ্মাণ্ডটিকে পঞ্চাশ কোটি সূর্য্যের ন্যায় নক্ষত্র দ্বারা গঠিত বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং যে মহাশূন্যের এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক-রশ্মি পৌঁছিতে ত্রিশ হাজার বৎসর অতিবাহিত করে এ প্রকার একটা স্থানে* ঐ মহাসূর্য্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তা'র পর আমাদের উদাহরণের সেই প্রস্তর খণ্ডটির ন্যায় কোন একটা সূর্য্যকে এই পঞ্চাশ কোটি সূর্য্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া সেটি মহাকাশে দোলকের ন্যায় যাওয়া আসা করিতে করিতে কতটা বেগ অর্জ্জন করিবে হিসাব করিয়াছিলেন। ভূগর্ভের সুড়ঙ্গে প্রস্তরখণ্ডের বেগ কেন্দ্রের নিকটে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল হইতে দেখা গিয়াছে। পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে যে মহাসূর্য্যকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহার চরম বেগ নিউকুম্ব সাহেবের হিসাবে সেকেণ্ডে পঁচিশ মাইল হইতে দেখা গিয়াছিল।

যে জিনিস কোন শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ঘণ্টায় এক মাইল বেগে চলিতেছে, তাহাকে দুই মাইল বেগে চালাইতে হইলে শক্তির পরিমাণকে চারিগুণ করিতে হয়। তিন গুণ বেগে চালাইতে হইলে শক্তির মাত্রাকে নয়গুণ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি পঞ্চাশ কোটি সূর্য্য সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের মধ্যস্থ কোন নক্ষত্রকে সেকেণ্ডে ২৫ মাইল বেগ দিতে পারে। সুতরাং যে নক্ষত্রটি মহাকাশের ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে দুইশত মাইল বেগে চলাফেরা করিতেছে, তাহা যে কতগুলি নক্ষত্রের টানে পড়িয়া এই বেগ অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন হয় না। দুই শত মাইল বেগ পঁচিশ মাইল বেগের ঠিক আট গুণ। কাজেই কোন জ্যোতিষ্কে এই বেগ উৎপন্ন করিতে হইলে পঞ্চাশ কোটির চৌষট্টিগুণ অর্থাৎ ৩২০০০,০০০,০০০ তিন হাজার দুইশত কোটি সূর্য্যের সমবেত আকর্ষণ আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

নক্ষত্রগুলিকে আমরা অতি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর ন্যায় দেখি বটে, কিন্তু ইহারা সত্যই ক্ষুদ্র পদার্থ নয়। সকলেই এক একটি সূর্য্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন ও বৃহৎ, কোন কোনটি আমাদের সূর্য্য অপেক্ষাও অনেক বৃহৎ। তা ছাড়া ইহাদের মধ্যে কোনটিই নিশ্চল নয়, প্রতি সেকেণ্ডে শত শত মাইল বেগে আমাদের উদাহরণের সেই দোলক প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় মহাকাশকে ভেদ করিয়া ইহারা যাওয়া আসা করিতেছে। আমাদের সূর্য্যটি সেই অসংখ্য তারকাগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তারা। নানা গ্রহচন্দ্র ও ধূমকেতুতে পরিবৃত থাকিয়া ইহা প্রতি সেকেণ্ডে তের মাইল বেগে অভিজিৎ (Vega) নামক নক্ষত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ যতগুলি নক্ষত্রের বেগের পরিমাণ অনুমান করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই

* প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে আলোক ধাবিত হয়। যে দূরত্ব অতিক্রম করিতে এই আলোকই ত্রিশ হাজার বৎসর অতিবাহন করে তাহা কত বৃহৎ, পাঠক অনুমান করুন।

বেগ প্রতিসেকেণ্ডে দুইশত মাইলের অধিক বলিয়া মনে হয়। স্বাতী (Arcturus) নামক নক্ষত্রটি সেকেণ্ডে ৫৪ মাইল বেগে ধাবমান হইতেছে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আরো একটি নক্ষত্র দুইশত মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক বেগে তাহার গন্তব্য দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং আকাশের যে সকল মহাসূর্য্যের সমবেত আকর্ষণে নক্ষত্রগুলির বেগ দুই শত মাইলের অধিক হইতেছে, তাহাদের সংখ্যা যে পূর্ব্বোক্ত তিন হাজার দুই শত কোটির অনেক অধিক তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

খালি চক্ষুতে আমরা ছয় হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাই না। যে সকল জ্যোতিষ্ক অতি দূরে থাকিয়া তাহাদের ক্ষীণ আলোক নিয়তই পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করিতেছে, আমাদের দুর্ব্বল দর্শনেন্দ্রিয় তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। কাজেই অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রসকল আমাদের চক্ষুর অগোচরেই রহিয়া গেছে। ফোটোগ্রাফের কাচে আকাশের ছবি উঠাইলে, এই শ্রেণীর অনেক দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের চিত্র কাচে ফুটিয়া উঠে। এই প্রকারে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্গণ দশ কোটির অধিক নক্ষত্রের সন্ধান পান নাই। তিন হাজার দুইশত কোটি নক্ষত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নিউকুম্ব সাহেব যে গণনা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রে আবিষ্কৃত এই দশ কোটি নক্ষত্র কত তুচ্ছ পাঠক অনুমান করুন! অনন্ত মহাকাশের যে একটু স্থানে কোটি কোটি মহাজ্যোতিষ্ক আমাদের সূর্য্যের সহিত অবস্থান করিতেছে, নিউকুম্ব সাহেব এই গণনায় কেবল তাহারি একটু পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। আকাশের অপর অংশের সংবাদ জ্যোতিঃশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। মনুষের ইন্দ্রিয়গুলি এতই দুর্ব্বল এবং পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রসকল এত অক্ষম যে, এই ক্ষুদ্র সৌর জগতেরই সংবাদ এখনো সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। সুতরাং আমাদের এই নক্ষত্রপুঞ্জের বাহিরে কোন্ নীহারিকারাশি কোন্ মহাসূর্য্যকে প্রসব করিতেছে তাহা আমরা অনুমানই করিতে পারি না! অনন্ত মহাকাশ ও অনন্ত সৃষ্টির কথা মনে করিলে যে আনন্দময়ের ইচ্ছায় এই জড় ও শক্তি লীলা বিশ্ব ব্যাপিয়া অনাদি কাল ধরিয়া চলিতেছে, এক তাঁহাকেই চিন্তা করিয়া স্তব্ধ থাকা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় থাকে না।

আচার নিয়ম।

আর্য্যাবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কোন ভূখণ্ডে আচারের জন্য কোনরূপ নিয়ম বা পদ্ধতি, অথবা কোনরূপ শাস্ত্র সংকলিত হয় নাই। কেবল মাত্র এই আর্য্যাবর্ত্তেই আচার প্রতিষ্ঠার জন্য নানা প্রকার বিধি-নিষেধ-ঘটিত শাস্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে। যে সময়ে এই দেশে চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে অদ্য যাবৎ এই দেশে আচার-নিয়মের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ-ভাবে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত আছে। সে নিয়ম কেহ প্রতিপালন করুক বা না করুক, তদ্‌ঘটিত আদেশের অর্থাৎ বিধি নিষেধের বিলোপ এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। যাঁহারা আচার নিয়ন্তা ঋষি, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন ও কার্য্যতঃ দেখিয়াছিলেন, যেমন তদ্বির না করিলে শস্য ফলাদির ও পশু পক্ষী প্রভৃতির জাতিভাব ঠিক থাকে না; অধিকন্তু বিকৃত হইয়া যায়, আর তদ্বির করিলে ঐ সকলের পর পর উৎকর্ষ হইতে থাকে, তেমনি, মনুষ্যদিগেরও জাতিভাব, বিনা তদ্বিরে বিকৃত হইতে থাকে এবং তদ্বির রাখিলে তাহা ঠিক থাকিতে পারে।

শস্য ফলাদির পক্ষে যেমন পরকীয়ভাষা তদ্বির, তেমনি, মানবীয় জাতিভাবের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় আচার প্রায় সমানার্থক শব্দ। তাই আমরা "তদ্বির কর," এরূপ না বলিয়া 'আচারনিষ্ঠ হও" এইরূপ বলিয়া থাকি।

কেহ কেহ ভাবেনও বলেন, আচার শাস্ত্রটা কেবল কুসংস্কারাবিষ্ট পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভণ্ডামীর উপকরণ মাত্র। কিন্তু ঐ কথা আমাদের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমাদের মনে হয়, মানবগণের শারীর-প্রকৃতি জাতীয়-প্রকৃতি ও দেশ-প্রকৃতি সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া বুধগণের মনে যে সকল হিত অহিতের বিষয় উপলব্ধ হইয়াছিল, এ দেশের আচার শাস্ত্রে সেই গুলিই বিধি-নিষেধ দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। দেখাও যায়, এ দেশে এমন কতকগুলি রোগ জন্মে, যাহা দেশান্তরে জন্মে না। এমন কি সে দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে সে সকল রোগের নাম প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত নাই। পরন্ত এ দেশের আচার-শাস্ত্রে এ ন সকল বিধি ও নিষেধ আছে যাহা পালন করিলে, সেই সকল রোগের দোষ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এমনও দেখা যায়, কোন কোন সংক্রামক রোগের প্রাবল্য কালে অধিকাংশ আচারবান্ লোক সেই সেই রোগের সংক্রমণ হইতে নিস্তার পায়। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, আচার শাস্ত্রের সমগ্র বিষয় কুসংস্কারাবিষ্ট লোকের বৃথা কল্পিত নহে। অল্প একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এ দেশের আচার শাস্ত্রের কতক কতক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য, কতক জাতীয় উৎকর্ষের জন্য, কতক বা সমাজহিতের জন্য এবং কতক পশু-পক্ষ্যাদির ন্যায় যাদৃচ্ছিকতা নিবারণের জন্য সংকলিত। যে শাস্ত্রকে আমরা এখন স্মৃতি বলি, তাহাই আমাদের অভিহিত আচার শাস্ত্রের সার সংকলন। বধুগণ স্মৃতিবাক্য সকলকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া বলেন যে, ইহার কতক বাক্য দৃষ্টার্থ, কতক অদৃষ্টার্থ ও কতক দৃষ্টাদৃষ্ট উভয়ার্থ। এই তিনের মধ্যে যাহাকে উভয়ার্থ বলা হইল, বোধ হয় তাহাই আমাদের বর্ণিত জাতীয় ভাবের সংরক্ষক, সংস্কারক ও উৎকর্ষ-কারক। সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রকে আচারশাস্ত্রের নামান্তর বিশেষ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

আচারশাস্ত্রে একটী নিষেধ বাক্য আছে, বাক্যটীর ভাষা অর্থ—প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিতে যথাক্রমে পঞ্চদশ দ্রব্য ভক্ষণ করিও না। ঐ নিষেধ বাক্য বোধ হয়, পশ্চাৎ ব্যক্তব্য কারণে প্রচারিত। ৪।৫টী পরিণত বার্ত্তাকু ছেদন করিয়া খুব ভাল অনুবীক্ষণ যোগে দেখিবে। পরে দেখিতে পাইবে, কোন না কোনটীর রসে যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম এক প্রকার কীটাণু ভাসমান্ আছে। সেই কীটাণু বার্ত্তাকু রসে, ত্রয়োদশী তিথিতে উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।* কীটাণু ভক্ষণে দুর্লক্ষ্য অপকারের সম্ভাবনা, বোধ হয় তাহাতেই ত্রয়োদশী তিথিতে বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অনুসন্ধান লভ্য ঐ সকল নিগূঢ় বিষয় যিনি বিদিত হন, তিনি আচারনিষ্ঠতার সুফল ও ভ্রষ্টাচারের কুফল আছে বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য।

আচার নিষ্ঠতার দ্বারা মানবীয় জাতিভাবের উৎকর্ষ ও আচারভ্রষ্টতার দ্বারা তাহার অপকর্ষ জন্মে, এ তথ্য মনুমহর্ষিরও উপদিষ্ট। মনুমহর্ষি বলিয়া গিয়াছেন—

"অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাৎযুগাৎ।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।"

বীজ, ক্ষেত্র, কর্ম্ম, এই তিনের সমবায়ে ও উৎকর্ষাপকর্ষে জায়মান্ শস্য ফলাদির উৎকর্ষাপকর্ষ হয়। ঐরূপ বীজ, ক্ষেত্র, কর্ম্ম, এতৎ ত্রিতয়েরও তারতম্য ও উৎকর্ষাপকর্ষে মনুষ্যজাতিরও উৎকর্ষাপকর্ষ সংঘটন হয়। কোন নীচ জাতীয় মানব যদি ক্রমিক সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট আচারে কাল কর্ত্তন করে, তাহা হইলে সেই নাম জায় মূল মানবের অধস্তন সপ্তম সন্তান শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে। ঐ প্রকারে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত, তথা ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

"ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈব চ।"

ক্ষত্রসন্তানের পক্ষেও বৈশ্যসন্তানের পক্ষেও ঐ রূপ নিয়ম। এই বিষয়ে একটী পৌরাণিক সংবাদ এই যে, বিশ্বামিত্র ঋষি আগে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে তপস্যার প্রভাবে (তদ্‌বির করিয়া) ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠের প্রতি তাঁহার ঘোরতর ঈর্ষা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির পর ঈর্ষা ও অভিমান বশতঃ ব্রাহ্মণ্য দেখাইবার উদ্দেশে বশিষ্ঠ সমীপে আগমন ও হস্তোত্তলন পূর্ব্বক নমস্কার করিয়াছিলেন। নমস্কার ও প্রতিনমস্কার সম্বন্ধে রীতি ও শাস্ত্র এই যে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে প্রতিনমস্কার করিবেন, আর ক্ষত্রিয়াদি নমস্কার করিলে আশীর্ব্বাদ করিবেন। বশিষ্ঠ প্রতিনমস্কার না করিয়া পূর্ব্বের মত আশীর্ব্বাদই করিলেন। ইহাতে বিশ্বামিত্র বুঝিলেন, বশিষ্ঠ আমার ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিলেন না। পরে তিনি প্রতিবিধান মানসে পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার তাঁহার উপাস্য দেবতা তদীয় প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রের ক্ষোভ বিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন, তুমি আবার যাও, এবার তুমি অভিসম্পাত করিও, তাহাতে বশিষ্ঠের মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। অনন্তর বিশ্বামিত্র এবার হৃষ্ট হইয়া অভিসম্পাতের সংকল্প বহন পূর্ব্বক বশিষ্ঠ সকাশে আসিলেন ও পূর্ব্বের মত নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। পরন্তু বশিষ্ঠ এবারও প্রতি নমস্কার করিলেন না, পূর্ব্বের ন্যায় আশীর্ব্বাদই করিলেন। বশিষ্ঠের তাদৃক্ ব্যবহারে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও অভিসম্পাতের ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু এবার সে ক্রোধ ও সে ইচ্ছা সে অভিমান সমস্তই

* পরীক্ষা সাপেক্ষ। সহ সং।

বিদ্যুতের ন্যায় উদয় মাত্রে বিলীন হইয়া গেল। তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার মনে ব্রাহ্মণোচিত সাত্ত্বিকী বৃত্তি ক্ষমার আবির্ভাব হইল। রাজসী বৃত্তি ঈর্ষাদি ক্রোধাদির অভিভব হইয়া গেল। তখন তাঁহার, বশিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারজনিত অসন্তোষ বিদূরিত হইল। ভাবিলেন, কেন আমি বৃথা ঈর্ষা দ্বেষ হিংসার কার্য্য করিয়া পাপে লিপ্ত হইয়াছি। বশিষ্ঠ আমার ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করুন বা না করুন, আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অল্প-ক্ষণ এইরূপ চিন্তার পর তিনি পুনর্নমস্কার করিয়া যথাগত স্থানে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে বশিষ্ঠ এবার তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, এবং বলিলেন নমস্কার মহাশয়! নমস্কার! বুঝিলাম, আপনি এখন যথার্থ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। যখন প্রথম আসিয়াছিলেন, তখন আপনার অন্তরে অল্প একটু ক্ষত্র-প্রকৃতির প্রতি-চ্ছায়া ছিল। ক্ষণমাত্র হইল সে টুকুও গিয়াছে।

স্কন্দ-পুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে লিখিত আছে, দাক্ষিণা-ত্যের কতকগুলি শূদ্র ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামের সহায়তা করায় পরশুরাম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া-ছিলেন। যদিও তাহারা বিশ্বামিত্রের ন্যায় তদ্দেহেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি, তদবধি তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিক রূপে ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণসংসর্গ করিয়াছিল। পরে তাহাদের অধস্তন পুরুষেরা সকলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। অদ্যাপি তদ্বংশধরেরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করিতেছে। কখন কখন মনে হয় বটে, ব্রাহ্মণ একটা ব্যবহারিকী সংজ্ঞা মাত্র, পরন্তু তাহা অনুসন্ধান মূলক। অনুসন্ধানে জানা যায়, বিলক্ষণ বুঝা যায়, যাহারা ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাহাদের বাহ্যিক মুখ কান্তি, শ্রী-সৌষ্ঠব ও আভ্যন্তরীণ শিরা স্নায়ু ধমনী মর্ম্ম মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই ভিন্ন স্বভাবান্বিত ও ভিন্ন প্রকার শক্তিসমন্বিত। আহার বিহার সংসর্গ ও মানসী শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা দেহের অন্তর্বাহ্য পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অংশ গঠিত ও অপকৃষ্ট অংশ অন্তর্হিত, আবার অপকৃষ্ট অংশ গঠিত ও উৎকৃষ্ট অংশ অস্ত হইয়া থাকে।

গর্ভাবাস কালেই মনুষ্যদিগের জ্ঞানের ইচ্ছার ও ক্রিয়ার বীজ তাহাদের দেহের যথাযথ স্থানে প্রকৃতি কর্ত্তৃক উপ্ত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে সকল আগন্তুক উপায়ে অর্থাৎ আহার বিহার সংসর্গ ও শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে অঙ্কুরিত ক্রমে অঙ্কুরিত ও ক্রমে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে। সুতরাং বুঝা যায়, আহার বিহার সংসর্গ শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষা দীক্ষা-দির অনুরূপ জ্ঞানশক্তির ইচ্ছাশক্তির ও কার্য্যশক্তির বীজ সকল অন্যথা অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় ও সে সকলের বিস্তৃতিও অন্যথা অন্যথা ভাবে হইয়া থাকে। এই দৃষ্ট নিয়মটী আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মণের শূদ্র হওয়া ও শূদ্রের ব্রাহ্মণ হওয়া দূরে থাকুক, মানুষের পশু হওয়া ও পশুর মানুষ হওয়াও সুসম্ভব। ক্ষেত্র যেমন তেমনিই থাকে, পরন্তু তদুৎপন্ন শস্যাদি অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে বুঝা উচিত যে, মানুষের পৈত্রিক আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না, পরন্তু তদন্তর্গত প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিনটীকেই আমরা অন্তর্গত প্রকৃতি বলি। কোন এক সময়ে আমি একখণ্ড মাসিক পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। যদি ঐ প্রবন্ধে প্রকাশ্য বিষয়টী সত্য হয়, তাহা হইলে সেই ঘটনাটি আমার সিদ্ধান্তের উত্তম উদাহরণ হইবে। মাসিক পত্রিকাটীর নাম "প্রবাহ"। প্রবন্ধের প্রথমেই লেখা আছে এ প্রবন্ধ একটী বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদ পত্রের অনুবাদ। সুতরাং তাহা এখনকার লোকের বিশ্বাস্য। প্রবন্ধটীর নাম (The wolf-man) অর্থাৎ ব্যাঘ্র পালিত মনুষ্য। প্রব-ন্ধের সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ—

"পশ্চিম প্রদেশস্থ সেনাবিভাগের কোন এক উচ্চ পদস্থ সাহেব এক দিন এক অরণ্যে শীকার করিতে গিয়াছিলেন। সহসা এক দুর্গম স্থানে গিয়া দেখিলেন, একটা অদ্ভুত জানোয়ার বাঘের মত থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। জন্তুটীর আকৃতি অর্থাৎ দেহের গঠন মনুষ্যের মত, অথচ সে থাবা পাতিয়া বসিয়া বাঘের মত জিহ্বা বাহির করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে বাঘের মত গোঙরাই-তেছে। আরও দেখিলেন, ইহার সৃক্কনী দিয়া অজস্র লালা নির্গত হইতেছে। ইহার চক্ষু গোল, দীপ্তিশালী ও রক্তবর্ণ এবং নখ বক্রীভূত ও প্রখর। সাহেব এই অদ্ভুত জন্তু দেখিয়া সহসা ভীত হইলেন বটে, কিছুক্ষণ পরে তিনি ভয় পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি ইহাকে ধরিবার উপায় কি, ভাবিতে লাগিলেন। সাহেব নিকটস্থ হইতে না হইতে সে সাহেবকে আক্রমণে উদ্যত হইল। কিন্তু সাহেব অনেক কৌশলে তাহার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সমভিব্যাহারী লোকজনের সাহায্যে তাহাকে ধৃত করিলেন।

পরে পিঞ্জর রুদ্ধ করিয়া তাহাকে আপনার অবস্থিতি স্থানে আনয়ন করিলেন। প্রচার হইলে, এই অদ্ভুত জীব দেখিবার নিমিত্ত নানাস্থান হইতে নানা লোক আগমন করিতে লাগিল। দর্শকেরা সকলেই অনুমান করিয়াছিল, জন্তুটা প্রকৃত মনুষ্য নহে, পরন্তু ব্যাঘ্রপালিত মনুষ্য। ক্রমে সে ভাত রুটী খাইতে শিখিয়াছিল, শান্ত হইয়াছিল এবং মনুষ্যের মত কথাও কিছু কিছু বুঝিতে ও

বলিতে শিখিয়াছিল, এবং মনুষ্যের ন্যায় অল্প অল্প হাঁটিতেও শিখিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু কাল পরে সে রক্তামাশয় রোগে মারা গেল। ভবিষ্যতে সে কিরূপ হইত তাহা জানিতে পারা গেল না। তৎকালের লোক সকল এই জন্তুর বর্ণনায় এইরূপ জল্পনা করিত যে এক শ্রেণীর বাঘ আছে, তাহারা সুযোগ পাইলে মনুষ্য-শিশু গো-বৎসাদি পশু মুখে লইয়া পলায়ন করে। বোধ হয় এই শ্রেণীর কোন বাঘিনী কর্ত্তৃক কোন মনুষ্য-শিশু উক্ত ক্রমে নীত হইয়াছিল, এবং কোন দুজ্ঞে্য় কারণে শিশু তৎকর্ত্তৃক ভক্ষিত না হইয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাই সে মানুষ হইয়াও মনুষ্যত্বে বঞ্চিত ও ব্যাঘ্র-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সংবাদ পত্রের প্রচারিত এই ব্যাঘ্র পালিত মনুষ্যের ইতিহাস যদি সত্য হয়, তাহাতে বোধ হয় প্রাগুক্ত কারণে জাত্যান্তরাপত্তি হওয়ার কথা অসম্ভবপর হইবে না।

জগত-জননী।

জগত-জননী হে ভারতভূমি
রাখিয়াছ তুমি কি ধন অন্তরে।
যাহারি কারণে দারুণ পীড়নে
রহিয়াছে প্রাণ এতকাল ধরে।

মানব জাতির কি নিগূঢ় কথা,
আছয়ে তোমার মরমেতে গাঁথা,
কি ধন গোপনে রেখেছ যতনে
মানব সন্তানে বিলাবার তরে।

নানা দিকে দিকে এ মানবগণ,
করিছে কতই জ্ঞান আহরণ,
এই জ্ঞান ধন করি উপার্জ্জন
মিলিত হইবে তোমার মাঝারে।

সর্ব্ব-জ্ঞান-খনি যে পরশমণি,
মিলাবে যাহাতে সবাকারে তুমি,
সে অমূল্য মণি অন্তরেতে তুমি
মানব-জননী রহিয়াছ ধরে।

এ বারতা যবে জানিবে জগত,
বুঝিয়ে তোমার করম মহত,
হেরিয়ে তোমায় বিদরি হৃদয়
ভাসিবে ভাসাবে সবে আঁখিধারে।

করিবারে এই মণির রক্ষণ,
গোপনেতে তুমি জাগ অনুক্ষণ,
তব জাগরণ জানে কোন জন
আছে কত তপ তাহার ভিতরে।

জানিও মানব বিনা তপস্যায়,
হতে নারে কভু হেন জ্ঞানোদয়,
তব তপ ফল এই জ্ঞান বল
রয়েছে সঞ্চিত তোমার মাঝারে।

জগত যে দিন হইবে সক্ষম,
এই জ্ঞান-মণি করিতে ধারণ,
তব আত্ম ধন পরম রতন
প্রকাশিবে তুমি ল'য়ে নিজ করে।

আত্মার প্রকাশে ভেঙ্গে মোহ-কারা
আনন্দিত হবে সসাগরা ধরা
সে আনন্দ ধারা করে' মাতোয়ারা
ডুবাবে মানবে অমৃতের ধারে।

অন্তরে বাহিরে আত্মার প্রকাশ
তব কীর্ত্তি এই অপূর্ব্ব বিকাশ
থাকিবেক মাতঃ হইয়ে গ্রথিত
মানবেতিহাসে জলদ অক্ষরে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

আমি আর শুনিবনা কাহারো বচন,
আর কিছু লক্ষ্য করি যাবেনা জীবন।
জগদীশ প্রেমময়, তব রূপে এ হৃদয়
পূর্ণ করে জেলে থাক মোহিয়া নয়ন।
তুমি শিক্ষাময় গুরু, তোমারি চরণ
ধ্যান ধারণার লক্ষ্য, আকাঙ্খা স্বপন।
যে পথে যাইবে লয়ে, যাব সেই পথ দিয়ে
যাতনা দুঃখের থাক্ কণ্টক ভীষণ।
ওগো দেব দয়াময় নিখিল রঞ্জন,
দিও দীনে ওই তব কমল চরণ।
আমার এ মন প্রাণ সর্ব্বস্ব করেছি দান
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা হউক পূরণ

বিমল প্রভাত শুভ্র পূরব গগনে
রাঙা রবি আলো দেয় কনক কিরণে।
বিহগের মধু ছন্দে, মধুর কুসুম গন্ধে
কি অমৃত ঢালিতেছে এ বিবশ প্রাণে।
শীতল বাতাস বয়, শান্ত স্থির সমুদয়
ধরণী করিছে পূজা যেন এক মনে
জগদীশ প্রেমময় এ চিত্ত চঞ্চল হয়?
দয়া করে স্থির করি লও তব পানে।
বিশ্ব-রাগিনীর সুরে, মোর এই মর্ম্ম-পুরে
জাগাইয়া দাও তব মহিমার গানে।

মোর এই প্রাণমন, করি দিব সমর্পণ

তোমার অতুল ওই কমল চরণে

দীননাথ দয়া করে লেও দীন জনে

প্রভাতের ফুল।

কি সুন্দর কি মাধুরী অমূল্য অতুল।
ক্ষুদ্র বৃক্ষ ভরিয়াছে শুভ্র ফুল দলে,
সুরভি নিঃশ্বাস বহে সমীর হিল্লোলে।
খুলিল পূরব দ্বার, প্রভাত তপন,
ঢালিয়া আলোক ধারা, করে সচেতন
অচেতন ধরণীরে, বিহঙ্গের দল
আনন্দে বিভুর নাম গাহিছে কেবল।
সাজায়ে ফুলের ডালা ক্ষুদ্র বৃক্ষ রাশি,
কাহার পূজার তরে উঠিল বিকাশি।
ক্ষুদ্র পুষ্প তবু তার সৌরভ মধুর,
শুভ্র পবিত্রতাময়, হৃদি অন্তঃপুর
অমনি পবিত্র আর, অমনি নির্ম্মল
কর্‌হ, পূজায় তব নির্ম্মাল্য কেবল।

বসন্তের পাখী।

কি সুধা ঢালিছ তুমি ওঅলক্ষ্যে থাকি
ওই মধু কণ্ঠস্বরে বিমোহিত মন,
কোন সুধা-স্রোতে প্রাণ হতেছে মগন।
কে দিল ওকণ্ঠে সুধা ডাক পাখী কারে?
অদৃশ্য আছেন যিনি অনন্ত মাঝারে।
ওনির্ম্মল নীলাকাশে তরুণ তপন,
মায়াযন্ত্র পরশিয়া দিতেছে চেতন
সুপ্ত ধরণীরে, সেই স্পর্শে ফুলদল,
হাসিয়া মেলিছে আঁখি পবিত্র সরল।
ওআকুল কণ্ঠে পাখী ডাক শুধু তাঁরে,
মথিয়া আকুল হৃদি মধুর ঝঙ্কারে।
আমিও আকুল কণ্ঠে ওই সুধাস্বরে
যেন ডাকিবারে পারি অনন্ত ঈশ্বরে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানা-কথা।

সদনুষ্ঠান।—কাশ্মীরের মহারাজা ভারতেশ্বরের সমগ্র ভারতীয় স্মৃতিসংরক্ষণ জন্য অধুতে দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিতে ও পঞ্জাবে ভারতেশ্বরের স্মৃতি সংরক্ষণ-ফণ্ডে পনের হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(এডুকেশন গেজেট।)

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১২৫৮দ৵৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৪৯৪ ⁄৬
সমষ্টি	...	৪৭৫২দ৶৯
ব্যয়	...	১৭৩১৷৵
স্থিত	...	৩০২১৷⁄৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৪২১৷⁄৯

৩০২১৷⁄৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৬৭৭৷৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৫০দ⁄০
পুস্তকালয়			৮৫। ৯
যন্ত্রালয়		...	৪০৫ ৶
ব্রঃ সঃ স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন			৩০ ৶৬
ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইট্‌			১০৲
সমষ্টি		...	১২৫৮দ৵৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১০৭১৷৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৫। ৩
পুস্তকালয়	...	২৫ ⁄৬
যন্ত্রালয়	...	৪৩২দ৶৩
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১০৫।৶৬
ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইট	...	১।৵০
সমষ্টি		১৭৩১৷৵

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्वविन् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)

অতএব রাজশক্তি সমাজ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু এই সম্বন্ধে দুই লেখক-সম্প্রদায়ের দুই বিভিন্ন মত; এক সম্প্রদায় রাজশক্তির নিকট সমাজকে বলি দান দিতে চাহেন, আর এক সম্প্রদায় মনে করেন, রাজশক্তি সমাজের শত্রু। যদি রাজশক্তি সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ না হয়, তাহা হইলে সে শক্তি শুধু ভৌতিক শক্তি মাত্র,—সে শক্তি শীঘ্রই বলহীন হইয়া পড়ে; আবার, রাজশক্তির অবিদ্যমানে, সকলের সহিত সকলের যুদ্ধ বাধিয়া সমাজ, একটা বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। সমাজ রাজশক্তিকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে, এবং রাজশক্তি সমাজকে সর্ব্বত্র বিপদ হইতে রক্ষা করে। প্যাস্‌কাল যে বলিয়াছেন, "যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহাকে বলবান করিতে না পারিয়া, যাহা বলবান তাহাকে ন্যায়সঙ্গত করা হইয়াছে"—এ কথা ঠিক্ নহে। প্যাস্‌কালের কথার স্থূল মর্ম্ম এই যে,—বাহুবলের দ্বারা বলীয়ান ন্যায়ই রাজশক্তি।

যে রাষ্ট্রনীতি, কর্ত্তৃত্বশক্তি ও স্বাধীনতাকে পরস্পর-বিরোধী মনে করিয়া, মূলত বিভিন্ন মনে করিয়া, রাজশক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেয়, সে রাষ্ট্রনীতি প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি নহে। আমি অনেকসময় এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রভুতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক্ তত্ত্ব, এবং প্রভুশক্তির বৈধতা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্যই প্রভুর সৃষ্টি। ইহা একটা বিষম ভুল। সহসা মনে হইতে পারে, এই কথার দ্বারা প্রভু-তত্ত্বকে স্থাপন করা হইতেছে; কিন্তু তাহা দূরে থাক, প্রভুত্বের যে সুদৃঢ় ভিত্তি সেই ভিত্তিটিকেই প্রভুত্ব হইতে অপসারিত করা হইতেছে। প্রভুত্ব—অর্থাৎ বৈধ ও নৈতিক প্রভুত্ব—উহা ন্যায় ছাড়া আর কিছুই নহে; এবং ন্যায়ও, স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ ঐ দুইটি বিভিন্ন ও বিপরীত তত্ত্ব নহে, উহা একই তত্ত্ব। সকল অবস্থাতেই,

সকল প্রয়োগস্থলেই উহাদের সমান ধ্রুবত্ব—সমান মহত্ত্ব।

কেহ কেহ বলেন প্রভুশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে ঃ অবশ্য ঈশ্বরের নিকট হইতেই আসিয়াছে; ভাল—স্বাধীনতা কোথা হইতে আসিয়াছে? পৃথিবীতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সবই ত ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। স্বাধীনতা হইতে উৎকৃষ্ট জিনিস আর কি আছে?

প্রভুশক্তির মূল ভিত্তিটি জানিতে পারিলে, প্রভুর বল আরও বৃদ্ধি পায়। প্রভুর আজ্ঞা পালন করা সহজ হয়, যদি জানিতে পারি, ঐ আদেশ পালনে আমার হীনতা হইবে না, প্রত্যুত আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

এই আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দাসত্বের সাদৃশ্য ধারণ না করিয়া, স্বাধীনতার অপরিহার্য্য নিয়মরূপে, স্বাধীনতার প্রতিভূরূপে প্রকাশ পাইবে।

রাজশক্তির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ও চরম লক্ষ্য কি?—না, সার্ব্বজনিক স্বাধীনতার রক্ষক যে ন্যায়ধর্ম্ম সেই ন্যায়ধর্ম্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং অন্যের স্বাধীনতাকে দমন করিবার অধিকার কাহারও নাই। অতএব, মিথ্যাকথন, অমিতাচার, অপরিণামদর্শিতা, বিলাসিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি চারিত্রদোষ যতক্ষণ না অন্যের অনিষ্টজনক হয়, ততক্ষণ রাজশক্তি তাহার জন্য কাহাকে দণ্ডিত করিতে পারে না। আবার রাজশক্তিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যেও বদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে।

সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ-সরকারও একটি নৈতিক পুরুষ; ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় তাহারও একটা হৃদয় আছে; তাহার উদারতা আছে, সাধুভাব আছে, বদান্যতা আছে। এমন কতকগুলি বৈধ ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত তথ্য আছে যাহার কোনরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, যদি প্রজার অধিকার সংরক্ষণই রাজসরকারের একমাত্র কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। যাহাতে প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়, তাহাদের ধর্ম্ম-নীতি দৃঢ়ীভূত হয়,—জনসমাজের ও বিশ্বমানবের স্বার্থের উদ্দেশে—তৎপ্রতি রাজসরকারের কিয়ৎপরিমাণে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সেই জন্য কখন কখন, মানুষের হিতকল্পে, রাজসরকারের বলপ্রয়োগ করিবারও অধিকার আছে। কিন্তু এই বলপ্রয়োগে বিশেষ বিবেচনা ও বিজ্ঞতা আবশ্যক—কেননা, অপব্যবহারে এই বলপ্রয়োগ অত্যাচারে পরিণত হইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাক, রাজসরকার কিরূপ নিয়মে রাজশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। যে শক্তি রাজসরকারের হস্তে বিশ্বস্তভাবে অর্পিত হইয়াছে, রাজসরকার যদৃচ্ছাক্রমে কি সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন? সদ্যোজাত সমাজেই,—শাসনতন্ত্রের শৈশব দশাতেই, সেই শক্তির এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই শক্তির প্রয়োগে মানুষ নানা প্রকারে বিপথগামীও হইতে পারে,—এক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, আর এক, বলের আতিশয্য প্রযুক্ত। অতএব এমন একটি নিয়ম চাই যাহা মানুষের নিজের চেয়ে উচ্চতর, এমন একটি সর্ব্বজন-বিদিত বিধি চাই, যাহা প্রজাগণের পক্ষে উপদেশস্বরূপ হইতে পারে এবং যাহা রাজসরকারের পক্ষে যুগপৎ আটক ও আশ্রয় উভয়ই হইতে পারে। এই নিয়ম-বিধিকেই আইন বলে।

আইনের আইন—সেই সর্ব্বোচ্চ আইন কি?—না স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়ধর্ম্ম; উহা লিখিত হয় না; উহার বাণী প্রতিজনের

অন্তরে শ্রুত হয়। স্বাভাবিক ন্যায়ধর্ম্ম অমুক অমুক স্থলে কি আদেশ করে, লিখিত আইন তাহাই অসম্পূর্ণরূপ প্রকাশ করে মাত্র।

উত্তম আইনের প্রধান লক্ষণ, অপরিহার্য্য লক্ষণ এই যে উহাতে একটা বিশ্বজনীন ভাব থাকে। যত প্রকার অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, সেই প্রত্যেক অবস্থাতে ন্যায়ধর্ম্মের আদেশ কি হইতে পারে, তাহাই সাধারণভাবে নির্দ্ধারণ করা আইন-প্রণেতার প্রথম কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, ঐরূপ কোন একটি অবস্থা উপস্থিত হইলে তিনি সেই নির্দ্দিষ্ট আদেশ অনুসারেই দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সেই অবস্থায় বিচার করিতে সমর্থ হন।

যে সকল নিয়ম কিংবা আইন ব্যক্তিগণের সামাজিক সম্বন্ধ নিয়মিত করে, সে সমস্তের সমবায়কে সামাজিক ব্যবহার বলে, সামাজিক ব্যবহার স্বাভাবিক সম্বন্ধজনিত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত; স্বাভাবিক অধিকারই উহার ভিত্তি, উহার মানদণ্ড, উহার সীমা। সমস্ত সামাজিক বিধিব্যবস্থার প্রধান নিয়ম এই যে, উহা স্বাভাবিক বিধি-ব্যবস্থার বিরোধী হইবে না।

কোন নিয়মই আমাদের স্কন্ধে একটা মিথ্যা অধিকার চাপাইতে পারে না, কিংবা একটা সত্য অধিকার হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারে না।

আইনের শাসনশক্তি কিসে প্রকাশ পায়?—না, দণ্ডবিধানে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাপের ধারণা হইতে দণ্ড নিঃসৃত হইয়াছে। বিশ্বশাসনতন্ত্রে ঈশ্বর স্বয়ং সকল প্রকার অপরাধের জন্য দণ্ড বিধান করেন। সমাজ-তন্ত্রে রাজসরকার, শুধু সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্যই দণ্ডবিধানের অধিকার পাইয়াছেন; রাজসরকার তাহাদিগকেই দণ্ড দেন, যাহারা অন্যের স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে। অতএব যে কোন দোষ ন্যায়ধর্ম্মের বিরোধী নহে এবং স্বাধীনতার ব্যাঘাতকারী নহে, সেই দোষের জন্য সমাজ কোন প্রতিশোধ লয় না। তা ছাড়া, দণ্ডবিধানের অধিকার ও প্রতিশোধ লইবার অধিকার এক নহে। মন্দ কাজের প্রতিশোধ লইবার জন্য মন্দ কাজ করা, চক্ষের বদলে চক্ষু ও দন্তের বদলে দন্তের দাবী করা,—ইহা জ্ঞানালোকবর্জ্জিত একপ্রকার বর্ব্বরোচিত ন্যায়বিচার। কেননা, তুমি আমার যে অনিষ্ট করিয়াছ, তোমার অনিষ্ট করিয়া আমি সে অনিষ্টকে কখনই অপসারিত করিতে পারি না।

অত্যাচারপীড়িত ব্যক্তির কষ্ট হইয়াছে বলিয়া অত্যাচারীকে যে তাহার অনুরূপ কষ্ট দিতে হইবে, একথা ঠিক্ নহে, পরন্তু যে ব্যক্তি ন্যায়কে লঙ্ঘন করে, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে সমুচিত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে—ইহাই দণ্ডের প্রকৃত নীতি। দণ্ড ক্ষতিপূরণ নহে। যদি আমি অজ্ঞাতসারে তোমার কোন ক্ষতি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী। তাহাতে কোন দণ্ড বর্ত্তে না, কেন না, এস্থলে আমি জ্ঞাতসারে অপরাধ করি নাই। কিন্তু আমি যদি কোন বদমাইসির কাজ করিয়া থাকি, আর সে কাজে যদি কাহারও ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য ত দায়ী আছিই, তাহা ব্যতীত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাকে উপযুক্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত দণ্ডনীতি।

উদ্ভিদের আত্মরক্ষা।

মানুষের আকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষের মত সংসারে টিকিয়া থাকা যায় না। ঘরে বাহিরে আমাদের যে সকল শত্রু আছে, তাহাদের আক্রমণ হইতে আমরা যদি নিজেকে রক্ষা করিতে পারি, তবেই এই বিশাল জগতের এক প্রান্তে আমাদের স্থান হয়। নচেৎ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

যে গৃহস্থ নিজের ঘটিবাটিগুলাকে না সামলাইয়া এবং টাকা কড়ির বাক্স খুলিয়া অবারিতদ্বারে গৃহে সুখে নিদ্রামগ্ন থাকে, প্রভাতে তাহার যথাসর্ব্বস্ব তো পাওয়াই যায় না, সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামীর জীবনান্তেরও সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। এ প্রকার গৃহস্থ সংসারে বা সমাজে টিকিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই বাহিরের শত্রুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাড়িখানিকে ঘেরিয়া রাখিতে হয়। টাকা কড়ির বাক্সে একটা তালা লাগাইতে হয়। টাকা অধিক থাকিলে প্রহরীর ব্যবস্থা করিতে হয় এবং হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিলে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দু' একখানা অস্ত্র শস্ত্রও নিকটে রাখারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। এ ছাড়া শত্রুদমনের জন্য মানুষকে অধিক কিছু করিতে হয় না।

প্রকৃতির সহিত মানুষের খুবই বৈরিতা আছে। বাতাস একটু ঘন হইলে তাহাতে শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কাজেই শরীর টিকে না। সেই বাতাসই একটু পাতলা হইলে হাঁফ লাগে। মানুষ রুদ্ধশ্বাস হইয়া মরিয়া যায়। যে সকল ব্যাধির জীবাণু ঝাঁকে ঝাঁকে চারিদিকে ঘুরিয়া-বেড়াইতেছে, কোন গতিকে তাহারা দেহে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এ সকলই সত্য। কিন্তু ইহাদের দমনের জন্য মানুষকে একটুও চেষ্টা করিতে হয় না। যে জগদীশ্বর এই সকল প্রবল শত্রুর মধ্যে মানুষকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বহস্তে সুব্যবস্থা করিতেছেন। ভগবানের বাণী ও প্রকৃতির নির্দ্দেশ না মানিয়া জীবনযাত্রার উপায়টাকে আমরা যখন অত্যন্ত কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলি, তখনই প্রকৃতি আমাদের বৈরী হয়। যে সকল রক্তপিপাসু শত্রুদল চারিদিকে থাকিয়াও পূর্ব্বে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না, তাহারাই আমাদিগকে ছদ্মবেশে আবৃত দেখিয়া তখন সংহারকার্য্য সুরু করিয়া দেয়।

এক মানুষ লইয়াই জগৎ নয়। কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সহস্র সহস্র অপর প্রাণীও মানুষের ন্যায় জাতিবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। ঠিক আমাদেরি মত উহাদের সুখদুঃখ ও ভয়ক্রোধের অনুভূতি এবং বৈরিতা ও সখ্যতা বুঝিবার শক্তি আছে। শত্রুর পীড়ন হইতে ত্রাণ পাইয়া সহজে জীবনটাকে কাটাইবার জন্য যে টুকু বুদ্ধির আবশ্যক, ভগবান্ ইহাদিগকেও তাহা মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। জীবরাজ্যের আর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, উদ্ভিদ জাতীয় সহস্র জীব ভূতলকে ছাইয়া রহিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া শতবর্ষজীবী মহাতরু সকলেই এই বৃহৎ খণ্ড-রাজ্যের প্রজা। মানুষ ও ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় ইহারা সুখদুঃখ ভয়ক্রোধ অনুভব করিতে পারে কি না জানি না। তবে যে স্থূল বুদ্ধিদ্বারা বন্য পশুরা নিভৃত স্থানে গুহা রচনা করে এবং পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সুখে জীবনটাকে

কাটাইয়া দেয়, সে বুদ্ধিটুকু যে উদ্ভিদের নাই তাহা সুনিশ্চিত। যে অনাথ ও নিঃসহায়, এক ভগবানই তাহার সহায় হন। তাঁহারি দূত প্রকৃতি সহস্র উপায়ে তাহাকে জীবিত রাখে। বহু শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত অসহায় উদ্ভিদগুলিকে প্রকৃতি কি কৌশলে রক্ষা করে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারি কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

প্রাণীদিগের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগের শরীরেই কতকগুলি সুব্যবস্থা থাকে। কচ্ছপ ও শম্বুক জাতীয় প্রাণীর দেহ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত হইলেই, নিজের দেহকে সেই সহজ বর্ম্মের মধ্যে লুকাইয়া ফেলে। মধুমক্ষিকার বিষাক্ত হুল, হরিণ ও গো-জাতির শৃঙ্গ আত্মরক্ষারই অস্ত্র। উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও এই প্রকার তাহাদের দেহেই বর্ত্তমান। মানুষ বা অপর প্রাণীদিগের শত্রু এক প্রকারের নয়। এজন্য শত্রুর প্রকৃতি বুঝিয়া ইহাদিগকে নিরাপদ থাকিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। উদ্ভিদ্‌গণও ঠিক সেই প্রকারে বিশেষ উপায়ে বিশেষ বিশেষ শত্রুর উপদ্রব নিবারণ করে। যে সকল বৃক্ষের পাতা সুস্বাদু, ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাহাদের পরম শত্রু। ইহাদের আক্রমণ নিবারণের জন্য পাতাগুলিকে শুঁয়ো দ্বারা আবৃত থাকিতে দেখা যায়। কচি পাতা স্বভাবতঃই পুরাতন পাতা অপেক্ষা কোমল। কাজেই কচি পাতাগুলিকে কীট পতঙ্গের উপদ্রব অধিক সহ্য করিতে হয়। এই কারণে যে সকল বৃক্ষের পত্রে বিকৃত স্বাদ নাই, তাহাদের নবপত্রগুলি পরীক্ষা করিলে লম্বা লম্বা অনেক শুঁয়ো দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এমন বিচিত্র ভাবে পাতার উপর সজ্জিত থাকে যে, কোনক্রমে ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাহাদিগকে ঠেলিয়া পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে উদ্ভিদ-দেহে আত্মরক্ষার অনুকূলে যে সকল পরিবর্ত্তন আসে, তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়?

গত শতাব্দীতে ডারুইন্, হক্‌সলি, স্পেন্সার ও ওয়ালেস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটি লইয়া খুবই আলোচনা করিয়াছিলেন। আজকাল আবার মেণ্ডেলের শিষ্যবর্গ ও ডেভ্‌রিজ্ প্রমুখ অনেকে সেই ব্যাপারটিকেই নূতন ভাবে আলোচনা করিতেছেন। এই সকল আলোচনা হইতে উদ্ভিদ্‌দেহের পরিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান কতকটা বুঝা যাইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহার মূলে এত রহস্য রহিয়া গিয়াছে যে, যদি কেহ ব্যাপারটিকে অব্যাখ্যাত বলিয়া প্রচার করেন তবে অধিক কিছুই বলা হয় না।

যাহা হউক এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক। ইহঁাদের বক্তব্যের স্থূল মর্ম্ম এই যে, একই পিতামাতার সন্তানদিগের মধ্যে যেমন নানা রূপান্তর দেখা যায়, সেই প্রকার বীজ হইতে যখন নূতন বৃক্ষ জন্মায়, তখন সকল সময় তাহাদের আকার প্রকার ঠিক মূল বৃক্ষের অনুরূপ হয় না। কোন গাছের পাতা যদি লম্বা থাকে, কখন কখন তাহারি চারায় অপেক্ষাকৃত গোলাকার পাতা দেখা যায়। মূল বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট ও বৃহৎ হইলে হয় ত তাহারি একটি চারার ফল ক্ষুদ্র ও বিস্বাদ হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তনগুলির কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে প্রকৃতির খেয়াল (Freaks) বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। খেয়ালই হউক বা উদ্দেশ্যমূলক হউক,

এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তন যে আসৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত খেয়াল-পরিবর্ত্তনগুলিতেই উদ্ভিদের নানা অঙ্গের স্থায়ী পরিবর্ত্তনের মূল দেখিতে পাইয়াছেন। আত্মরক্ষার উপযোগী যে সকল সুব্যবস্থা উদ্ভিদ-দেহে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদেরও মূলে ঐ খেয়াল বর্ত্তমান। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, যে উদ্ভিদের সুস্বাদু পাতাগুলিকে পতঙ্গে নষ্ট করিতেছে, খেয়ালে পড়িয়া তাহার কোন এক সন্ততি যদি কয়েকটি শুঁয়ো লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে এই খেয়াল তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল হইয়া পড়ে। কীট পতঙ্গ ইহার পাতাগুলিকে আর নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই গাছটি নিরুপদ্রবে বাড়িয়া নিজের বীজ দ্বারা শুঁয়োযুক্ত অনেকগুলি নূতন চারা উৎপন্ন করিবার সুযোগ পাইয়া যায়। অবশেষে বংশধরগণের মধ্যে প্রত্যেকে সেই শুঁয়োর সাহায্যে জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া এমনটি হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন ইহাদিগকে সেই কীটবিদ্ধ মূলবৃক্ষের সন্তান বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

আমরা কেবল শুঁয়োযুক্ত উদ্ভিদের অভিব্যক্তির একটা উদাহরণ দিলাম। প্রত্যেক উদ্ভিদে আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্য যেসকল সুব্যবস্থা আছে, তাহার সকলই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিতেছেন। যে সকল উদ্ভিদ গোমহিষাদির ভক্ষ্য, তাহাদের কোন বংশধর কেবল শুঁয়োযুক্ত হইয়া জন্মিলে সংসারে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তনে উভয়ের ভক্ষ্য ভক্ষক সম্বন্ধ লোপ পায় না। কিন্তু উহাদেরি বীজ কোন বিশেষ মৃত্তিকায় পড়িয়া কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় যদি তিক্ত বা উগ্রগন্ধযুক্ত দেহ লইয়া অঙ্কুরিত হয়, তবে পশুদিগের সহিত সংগ্রামে ইহাদের আর পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশের বেল, লেবু ও তুলসীর পাতার উগ্রগন্ধ এবং প্রথমোক্ত দুইটি উদ্ভিদের কাঁটার উৎপত্তি পশুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বেল ও লেবু গাছের নীচেকার ডালগুলিতেই অধিক কাঁটা দেখা যায়। অনেক সময় উঁচু ডালে মোটেই কাঁটা থাকে না। সুতরাং পশুদিগের উপদ্রব শান্তির জন্যই যে ক্রমে এই সকল উদ্ভিদ-দেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

আমাদের দেশের ময়না গাছ পাঠক হয়ত দেখিয়া থাকিবেন। ইহার প্রত্যেক ডালের প্রত্যেক গ্রন্থিতে লম্বা লম্বা কাঁটা সজ্জিত থাকে। মনে হয়, কোনকালে বন্য পশুগণ পাতা খাইতে গিয়া উহার ডালগুলিকে ভাঙিয়া ফেলিত। কাজেই এই উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ডালের সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ কাঁটা বাহির করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। খেজুর গাছের পত্রশীর্ষের কাঁটাগুলি যে পশু তাড়াইবার মহাঅস্ত্র, তাহা একবার দেখিলেই বুঝা যায়। কাঁটাগুলি ধারাল সূচের ন্যায় প্রত্যেক পাতার অগ্রভাগে সাজানো থাকে। ইহা দেখিয়া কোন পশুই আহারের চেষ্টায় বৃক্ষ স্পর্শ করে না। ফল পাকিলে পক্ষিগণও কাঁটা ঠেলিয়া সহসা সেগুলিকে নষ্ট করিতে পারে না।

উদ্ভিদের শত্রু কেবল ভূপৃষ্ঠেই বিচরণ করে না। মাটির তলেও ইহাদের শত্রু আছে। মূল ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষগুলিকে মারিয়া ফেলা ইহাদের প্রধান কাজ। কাঁটা বা শুঁয়োদ্বারা এই সকল শত্রুকে তাড়ানো

যায় না। কাজেই শত্রুদমনের জন্য অপর কোন সুকৌশলের আবশ্যক। উদ্ভিদসকল অন্য কোন উপায় না পাইয়া নিজের মূলগুলিকে অত্যন্ত বিস্বাদ এবং কখন কখন বিষাক্ত করিয়া পোকার উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করে। ওল ও কচুর মূল সত্যই বিষাক্ত। পোকার উৎপাত এগুলিতে কদাচিৎ দেখা যায়।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাশালী, তাহারি চারিদিকে অনেক অতিথি আসিয়া জোটে। এই প্রকার আশ্রয়াকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রায়ই অক্ষম ও দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়। কোন গতিকে পরের স্কন্ধে ভরদিয়া দিনযাপন করা তাহাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। উদ্ভিদদিগের মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষায় নিপুণ, তাহারাই অনাদৃত অবস্থায় মাঠে ঘাটে জন্মায়, এবং নিজেকে নিজেই নানা উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া যথাকালে মরিয়া যায়। বেড়ার গায়ে আমরা যে শেয়ালকাঁটা ইত্যাদি গাছ লাগাই, তাহা বাগানের গন্ধরাজ ও মল্লিকা গাছ অপেক্ষা অনেক উন্নত। শেয়ালকাঁটা তাহার কাঁটার সাহায্যে নিজেকে নিজে সর্ব্বদাই রক্ষা করে, কিন্তু এক ঝাড় মল্লিকাকে মাঠের মাঝে পুতিয়া দিলে সেগুলি কখনই আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে না। যাহা হউক উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী, তাহাদিগকে দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সাদাসিধে ও আড়ম্বরহীন হইলেও আশ্রিত প্রতিপালন ব্যাপারে ইহারা সহৃদয় মানুষের মতই উদার। শেয়ালকাঁটা, বুনো খেজুর বা বড় বড় কাঁটার ঝোপগুলির তলা খুঁজিলে অনেক নিঃসহায় ও দুর্ব্বল উদ্ভিদ্‌কে সেখানে জন্মাইতে দেখা যায়। আত্মরক্ষার উপযোগী কোন ব্যবস্থাই ইহাদের দেহে থাকে না। কাজেই কাঁটাঝোপের ন্যায় কোন নিরুপদ্রব স্থান মনোনীত করিয়া না লইলে ইহাদের জীবন সংশয় হইয়া পড়ে।

বিছুটি গাছের পাতায় যে লম্বা লম্বা শুঁয়ো জন্মায়, তাহা সত্যই বিষাক্ত। কোন গতিকে পাতা গায়ে ঠেকিলেই গা ফুলিয়া উঠে। এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি বিছুটির নিকটে আসিতে পারে না বটে, কিন্তু গো-মহিষাদি বড় বড় জন্তু শুঁয়ো দেখিয়া একটুও ভয় পায় না। কাজেই এই সকল প্রণীদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাদিগকে অপর আর একটা কিছু করিতে হয়। পল্লীগ্রামের বন জঙ্গলে পাঠক যদি বিছুটির গাছগুলিকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখিবেন, দুর্গম কাঁটা-ঝোপের তলই ইহাদের জন্মস্থান। কেবল বিছুটি নয়, অনেক দুর্ব্বল উদ্ভিদকে ঠিক এই প্রকারেই মহতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কাঁটাঝোপ আমাদের হিসাবে অতি নিকৃষ্ট উদ্ভিদ হইলেও উদ্ভিদজগতে তাহারা অগতির গতি স্বাবলম্বী মহৎ জীব।

মানুষ ভগবানের নিকট হইতে যে একটু বুদ্ধি পাইয়াছে, তাহারি সাহায্যে সে এখন অপর জীব হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের চলাফেরা, আচারব্যবহার, আহারবিহার প্রভৃতিতে যে কৃত্রিমতা আছে, তাহাই যেন ঐ স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। মানুষ নিজে যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে ভগবানই জানেন; কিন্তু ইহারা কতকগুলি নিকৃষ্ট জীবের উপর আধিপত্য করিয়া যে তাহাদের ধ্বংসের পথ নিয়তই পরিষ্কার করিতেছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিড়াল কুকুর ঘোড়া গোরু ইত্যাদি প্রাণীগুলিকে

মানুষ তাহার কৃত্রিম জীবনের গণ্ডীর ভিতর টানিয়া লইয়া সেগুলিকে এখন এত অসহায় করিয়া তুলিয়াছে যে, এখন জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনটির পূরণের জন্য উহারা মানুষের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে।

শৃঙ্গ গো-মহিষাদি পশুর আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। মানুষ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শৃঙ্গহীন পশু উৎপন্ন করিতেছে। কুকুর যে সকল গুণ পাইয়া এপর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছিল, মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহা একে একে হারাইতে বসিয়াছে। কাজেই যদি কোন কারণে আজ হঠাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতির উচ্ছেদ হয়, তবে অপর জীবদিগের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত পশুদিগের বংশলোপ অনিবার্য্য হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক।

মানুষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনেক উদ্ভিদ্‌কেও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ কাঁটায় ঢাকিয়া কাঁটানটে গাছগুলি এপর্য্যন্ত বেশ নিরুপদ্রবে জীবন যাপন করিতেছিল। মানুষ কাঁটা ভাঙিয়া তাহাদিগকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যে, এখন এক শ্রেণীর নটে গাছে আর কাঁটা জন্মায় না। কাঁটানটের এই নিষ্কণ্টক বংশধরগুলিকে বাগানের বাহিরে পুতিয়া দিলে, তাহারা বোধ হয় এক দিনের জন্যও পশুদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। গোলাপ গাছের পিতামহগণ যে খাঁটি বন্য ও স্বাবলম্বী ছিল, গায়ের কাঁটাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া উহাদের দুর্দ্দশা চরম-সীমায় পৌঁছিয়াছে। আজকাল নানা কৌশলে যে কাঁটাহীন গোলাপ গাছ উৎপন্ন করা হইতেছে, তাহাদের মত অসহায় উদ্ভিদ বোধ হয় আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাগানের বাহিরে এখন আর ইহাদের স্থান নাই।

প্রকৃত প্রার্থনা।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা এরূপ সাধকের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর, আমাদিগের ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জড় দেহের বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের জন্য যেমন শরীর মধ্যে বুভুক্ষাবৃত্তি দিয়াছেন, সেই প্রকার দেহাতীত চৈতন্যমাত্র অবিনাশী আত্মার উন্নতির জন্যও আত্মার মধ্যে ব্যাকুলতারূপ ক্ষুধা নিহিত করিয়া আপনার অসামান্য করুণার পরিচয় দিয়াছেন।

ক্ষুৎপিপাসা ভিন্ন জীব-দেহ অন্ন-পানাদি গ্রহণ করিতে পারেনা; পান ভোজনই শরীরের বৃদ্ধি ও বলপুষ্টির হেতু। কিন্তু অগ্নির অভাবে খাদ্যাদি পরিপাক প্রাপ্ত না হইলে এবং আহার্য্য বস্তু শরীর মধ্যে মিশ্রিত হইতে না পারিলে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে ধ্বংস মুখে পতিত হয়।

সেইরূপ আত্মাতে যদি অগ্নি না থাকে, তবে আত্মাও স্বীয় ক্ষুৎপিপাসার অভাবে আপনার আহারীয় বস্তুকে আহরণ করিতে অক্ষম হইয়া ক্রমশই হীন দশা প্রাপ্ত হয়।

যে বস্তু যে পদার্থ হইতে উৎপন্ন বা নির্ম্মিত, সে বস্তু সেই পদার্থ ভিন্ন পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। যাহার যাহা উপাদান, সেই উপাদানই তাহার সত্তা বা জীবন; আমাদের এই জড় শরীর যে

যে উপাদানে উৎপন্ন বা গঠিত, সেই সেই উপাদানই আমাদের দেহের আহার; উহা দ্বারাই দেহ রক্ষিত হয়।

সেইরূপ আত্মাও যে উপাদানে গঠিত, আত্মা সেই বস্তুকে আত্মার মধ্যে প্রাপ্ত না হইলে, আত্মারও বল পুষ্টির উপচয় হইতে পারে না। আত্মার উপাদানই আত্মার আহার।

শরীরস্থ অগ্নিই শরীরের উপাদান। ঐ অগ্নি ব্যায়ামাদি বা নিয়মিত পরিশ্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ আপন আপন শরীরকে চালনা পূর্ব্বক জঠর অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া সেই অগ্নিতে অন্নাদি আহুতি দিয়া স্বীয় স্বীয় শরীরের পুষ্টি সাধন করেন। জড়শরীর অন্নাদি আপন অগ্নিবলে পাক করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

আত্মা জড় নহে, সৎচিৎআনন্দ মাত্র। জীবাত্মা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারই সন্তান। পরমাত্মাই জীবাত্মার উপাদান; সুতরাং সত্য জ্ঞান আনন্দবস্তু, জীবাত্মার আহার। উহা দ্বারাই আত্মা নিত্য-কাল পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। জড় বস্তু—রূপ রসাদি-বিষয়ভোগ, আত্মার অন্নপান নহে; তাহা আত্মার পক্ষে অখাদ্য। সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরামাত্মাই আত্মার অন্ন এবং তিনিই আনন্দরূপে তাহার পানীয়। এই সত্যং শিব সুন্দরকে আপনাতে উপভোগ করিবার যে প্রবল আকাক্ষা, তাহাই আত্মার ক্ষুধা। জ্ঞানাগ্নিতেই চিন্ময় আত্মার বুভুক্ষাবৃত্তি প্রকাশিত হয়। জড় শরীরকে পরিশ্রম করাইলে যেমন জঠরাগ্নি প্রবৃদ্ধ হইয়া শরীরকে বল পূর্ব্বক আহার আহরণ করিতে প্রবৃত্ত করায়, সেই প্রকার জগতের সৃষ্টি স্থিতি পালন কার্য্যের আলোচনা, সাধুসঙ্গ সদালোচনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও বিচাররূপ ব্যায়ামের দ্বারা আত্মার জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনা হয়; এই জ্ঞানাগ্নি প্রবল হইলে, সকল জ্ঞানের সকল সত্যের মূল যে পরমাত্মা, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যে আত্মার মধ্যে প্রবল ব্যাকুলতা আইসে, তাহাই আত্মার ক্ষুধা। ক্ষুধাতেই আহার সংগ্রহের বাসনা হয়। যাহার যেমন ক্ষুধা তাহার তদ্রূপ ভোজনের আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষার তারতম্যানুসারে ভোজনও সেইমত হইয়া থাকে এবং পুষ্টিও তাহার তদনুরূপ হয়। এই যে আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই অক্ষম ব্যক্তির প্রার্থনার আবশ্যক হয়। যেখানে আকাঙ্ক্ষা সেই খানেই প্রার্থনার উদয়। যাহার যত অভাববোধ, তাহার তত আকাঙ্ক্ষা, এবং যাহার যত আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা, সেই পরিমাণে তাহার প্রার্থনারও গভীরতা। আমাদের আত্মার ক্ষুধা যত প্রবল হইবে, তাহার আহারের জন্য আকাঙ্ক্ষাও তত প্রবল হইবে। প্রবল আকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত দুর্ব্বল দরিদ্রগণের প্রার্থনা ভিন্ন বাসনা-পূরণের অন্য উপায় নাই। অক্ষমের একমাত্র প্রার্থনাই সম্বল। জীবাত্মা বড় অক্ষম। তাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই। পরমাত্মার শক্তিতেই সে চলে, পরমাত্মার শক্তিতেই বলে, তাঁরই শক্তিতে দেখে, তাঁরই শক্তিতেই ভাবে; অনন্ত শক্তিমানের শক্তিতেই সে শক্তিমান। সুতরাং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে তাঁহার বলেই বলীয়ান হইয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। প্রার্থনাই আমাদের সম্বল, প্রার্থনাই আমাদের বল। বিনা প্রার্থনায় কেহ কিছু পাইতে পারে না। প্রার্থনা শব্দের অর্থই ভিক্ষা করা, যাচ্ঞা করা বা চাওয়া; না চাইলে পায় না, যে চায়, সেই পায়। আকাঙ্খা না হইলে

কেহ চায় না; অভাব বোধ না হইলে কাহারও আকাঙ্খা হয় না। চির-সহচর পরমেশ্বরের সুখসঙ্গের অভাব বোধ হইল; সে অভাব পূরণ করিবার যে প্রবল ইচ্ছা, তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা। কেবলমাত্র কতকগুলি কবিত্বসংযুক্ত স্তুতি বাক্য প্রার্থনা নহে, হৃদয়ের আন্তরিক আকাঙ্খাই প্রকৃত প্রার্থনা। যেমন অন্তরে প্রেম না থাকিলে কোনও ব্যক্তিকে মহামূল্য রত্ন দান করিলেও তাহা প্রকৃত প্রেম নহে, কিন্তু অন্তরে প্রীতি থাকিলে, অথচ কিছু দান করিতে না পারিলেও তাহাকে প্রকৃত প্রীতি বলে, সেই প্রকার পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যে প্রাণের মধ্যে প্রবল আগ্রহ তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা। এই প্রার্থনা রূপ ক্ষুধার দ্বারা আত্মার আহার পরমাত্মা পরমান্ন স্বরূপে আত্মার সমীপে প্রকাশিত হয়েন, এই প্রার্থনার দ্বারাই তিনি লভ্য হয়েন; "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" পরমাত্মা কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা বা তর্ক-শক্তির দ্বারা অথবা উপদেশ শ্রবণের দ্বারা লভ্য নহেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" যিনি পরমাত্মার সহবাসের অভাব বোধে ব্যথিত হইয়া সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য শরীরে ক্ষুৎ-পিপাসাদ্দিতের ন্যায় ব্যাকুল ভাবে প্রবল আকাঙ্খা করেন, সেই প্রবল আকাঙ্খা-জনিত গভীর প্রার্থনাতে সচ্চিদানন্দস্বরূপে তিনি প্রকাশিত হয়েন; "তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্।"

তবে কি স্তব স্তুতি, তর্ক যুক্তি বা উপদেশাদি শ্রবণের প্রয়োজন নাই? আছে বই কি। এ সকল প্রথমাবস্থায় আত্মার বুবুক্ষা প্রবৃদ্ধি ও জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু যেমন অত্যধিক পরিশ্রমের সঙ্গে উপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজনাভাবে শ্রান্ত শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, সেইরূপ উপাসনার অভাবে কেবলমাত্র শুষ্ক তর্ক-বিতর্কে আত্মার ভাবও পরিশুষ্ক হইয়া যায়; এজন্যই কেবলমাত্র "বহু বচন, মেধা বা বহু শ্রবণের দ্বারা পরমাত্মা লভ্য নহেন" ইহা বলা হইয়াছে। নচেৎ এ সকলেরও প্রয়োজন আছে। এই সকল শ্রবণ বচনাদির দ্বারা পরমেশ্বরে আসক্তি জন্মায়। কিন্তু সকলেরই কিছু তীক্ষ্ণ মেধা, তর্কশক্তি বা বহু শ্রবণ নাই, তাহাদের উপায় কি হইবে? সে সম্বন্ধেও প্রেমময় পিতা তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে ত্রুটী করেন নাই। অনেক দিবসের অগ্নিমান্দ্যজনিত পুরাতন রোগী যেমন স্বীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্যায়ামাদির দ্বারা নষ্টাগ্নিকে পুনরুদ্দীপিত করিতে অশক্ত হইলে চিকিৎসক-প্রদত্ত কটু তিক্ত কষায়াদি ঔষধ সেবনে তাহা জাগ্রত হয়, সেই প্রকার বিবেকহীন বিচার-বুদ্ধিশূন্য জনগণের আত্মাতে ভগবৎ প্রাপ্তির আকাঙ্খা উদ্রিক্ত করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানই জগতের চিকিৎসক রূপে, বিপদ-আপদ রোগ-শোক দুঃখ-তাপ ঘৃণা-লাঞ্ছনা প্রভৃতি তিক্ত ঔষধের প্রয়োগে তাহাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা উদ্দীপিত করেন। জীবিতেচ্ছু রোগীগণকে যেমন চিকিৎসকের বশতাপন্ন হইয়া চিকিৎসককে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে হয়, তদ্রূপ আমাদেরও উচিৎ যে আমরা আমাদের পরম বৈদ্যের প্রদত্ত শোক দুঃখাদি তিক্ত ঔষধ গুলি তাঁহার শুভ ব্যবস্থা সম্ভূত ইহা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য সহকারে যেন তাহা সেবন করি ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা করি। সংসার সুখ অনিত্য সুতরাং কুপথ্য, কিন্তু তিনিই সুপথ্য এই জ্ঞানাগ্নির উদয় হইলে তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণের

মধ্যে প্রবল ক্ষুধা জাগরিত হইবে। তখন আমরা ক্ষুধার যাতনায় কাতর হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিব। যিনি ক্ষুধার পূর্ব্বে অন্ন, তৃষ্ণার পূর্ব্বে জল, বাসের পূর্ব্বে বসুমতী, প্রতিপালনের পূর্ব্বে পিতা মাতা এবং ব্যাধির পূর্ব্বে ঔষধের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য পরমামৃত পরমান্ন হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। সেই অমৃত পানে, মর্ত্ত্য আমরা অমর হইব। আহা তাঁহার কি অপরিসীম করুণা। আমাদিগকে অক্ষম দরিদ্র দেখিয়া বিনা মূল্যেই তিনি চিকিৎসা করিতেছেন; অযাচিত-ভাবে আমাদের ভবরোগ দূর করিয়া আপনিই সুপথ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আমাদের পিতা,আবার তিনিই আমাদের অন্ন; আমরা তাঁহা হইতে উৎপন্ন, আবার তাঁহাতেই জীবিত। আমাদের পিতাকে আত্মার অন্নরূপে পথ্যরূপে প্রার্থনা কর, বরণ কর। যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই সকলে বরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ বর্ত্তমানে অশ্রেষ্ঠকে কেহ বরণ করে না; যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বরণ করিতে হইলে, অপর সকলকে তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাকে বরণ করা যায় না। যেমন কোনও বিবাহার্থিনী কন্যা স্বয়ম্বরা হইলে, স্বয়ম্বর-সভায় সকলকে নিকৃষ্ট বোধে পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহাকেই বরণ করে, সেইরূপ আমাদেরও উচিত যে আমরা ধন-জন-যশ-মানকে অশ্রেষ্ঠ জানিয়া সেই ত্রিভুবন বরেণ্যকে আমরা বরণ করিয়া লই। রোগী যদি আরোগ্যকে বরণ করিতে করিতে কুপথ্যকেও বরণ করে, তাহা হইলে যেমন তাহার আরোগ্যের আশা থাকে না,সেইরূপ পরমেশ্বরকে বরণ করিতে গিয়া যদি ধন মান যশকেও বরণ করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পারি না। তাঁহাকে পাইতে হইলে ধন মানকে তুচ্ছ বোধ করিতে হইবে। সূর্য্যরশ্মি বহুদূর বিস্তৃত থাকিয়া নানা বস্তুতে বিভক্ত থাকায় যেমন তাহার তেজের হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সূর্য্য-কিরণ যেমন আতসী কাচ খণ্ডে বা সূর্য্যকান্তমণিতে ধারণ করিয়া একোমুখী করিলে তাহার তেজের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই প্রকার আমাদেরও আকাঙ্খা ধন-জন যশঃ-মান নানা বস্তুতে বিভক্ত হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। একারণ আমাদের আকাঙ্খার বল নাই; কিন্তু যদি আমাদের আকাঙ্খাকে পরমাত্মার দিকে একমুখী করিয়া রাখি,তাহা হইলে তিনি আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হইবেন। সকলের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র তাঁহাকে বরণ করিয়া লওয়াই তাঁহাকে প্রার্থনা। এই প্রার্থনাতেই তিনি আপন সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাধকের আত্মায় প্রকাশ করেন; যে সাধক অপর সকলকে অবর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র তাঁহাকেই বরণ করে, তিনিও তাহাকে বরণ করিয়া লয়েন এবং তাহাতে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাম্। ইহারই নাম প্রার্থনা। ক্ষুধা ভিন্ন তিনি আমাদের আত্মার রুচিকর হইবেন না বলিয়া, তিনি দয়া করিয়া আপনিই শোক তাপাদির দ্বারা ক্ষুধার উত্তেজনা করাইয়া আমাদের তৃপ্তিকারী হইতেছেন। যেমন তিনি শরীরের সুখের জন্য ক্ষুধা ও অন্ন দিয়াছেন, তেমনি তিনি আত্মার আনন্দের জন্য প্রার্থনা এবং আপনাকে দিতেছেন। তাঁহার প্রেমের পার নাই। কৃষক কৃষিকার্য্য করিয়া যেমন সেই কার্য্য দ্বারা শস্য প্রার্থনা করে, তন্ত্রীর বস্ত্র-বয়ন কার্য্যে যেমন তাহার বস্ত্রের প্রার্থনা প্রকাশ পায়,

সেই প্রকার আমাদের বাক্যের রচনা বা মনের ভাবমাত্র তাঁহার প্রার্থনা নহে। তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই তাঁহার প্রার্থনা প্রকাশ পায়। তিনি বাক্য নহেন; যে তাঁহাকে স্তব স্তুতিতে পাইব, তিনি শব্দ নহেন, যে বহু শ্রবণে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে; তিনি দৃশ্য নহেন যে তাঁহার রূপ ধ্যান করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব, এবং তিনি কোনও বিচার্য্য বিষয়ও নহেন যে তাঁহাকে তীক্ষ্ণ মেধার দ্বারা পাইব। কারণ দৃশ্যকে দর্শনের দ্বারা এবং শব্দকেই শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যিনি দৃশ্য স্পৃশ্যাদির অতীত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, সেই আত্মবস্তুকে আত্মার দ্বারাই পাওয়া যায়। আত্মদানই যথার্থ প্রার্থনা—যথার্থ বরণ। আপনাকে তাঁহাকে দিলে তিনিও আপনার হইবেন। আমরা তাঁহার হইলে তিনিও আমাদের না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আত্মসমর্পণই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। বহু বাক্য, বহু শ্রবণ বা তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা নহে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনাশ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।"

হে পরমাত্মীয় পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া তোমার কর; তাহা হইলেই আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিব।

প্রার্থনা।

হৃদয় আবেগে আর বাসনার স্রোতে,
প্রতি দিন কত বাধা পাই পথে যেতে।
সংসারের মোহ মায়া আচ্ছন্ন করিয়া,
সদা রাখিয়াছে এই দৈন্য-ভরা হিয়া।
দূর করি দাও দৈন্য ও পুণ্য পরশে,
ফুটাও আশার ফুল হৃদয় সরসে।
তোমারে করিতে পারি একমাত্র আশা,
তোমাতেই তৃপ্ত হয় সমস্ত পিপাসা।
জগৎ সংসার হয় সুন্দর মধুর,
পুণ্য ভরা, পাপ তাপ করে দিই দূর।
শুদ্ধ শান্ত নিরমল পবিত্র হইয়া,
তোমারে পূজিতে হয় উপযুক্ত হিয়া।
দীন আমি দীন-নাথ তোমার শরণ
লয়েছি, কাতরে দাও অভয় চরণ।

সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত থাকি নিরন্তর
করিতে তোমার পূজা নাহি অবসর।
হায়রে অবোধ মন বৃথা আশা লয়ে
অমূল্য সময় তব যেতেছে বহিয়ে।
প্রতি দিন কর আশা, আজ নয় কাল
বেলা কেটে যায় বৃথা বাড়িছে জঞ্জাল।
আপনার ভারে নত পড়িছ ধূলায়,
কাঁদিছে এ ক্ষুদ্র প্রাণ সংসার মায়ায়।
এখনো সময় আছে দেখরে চাহিয়া,
ভুলে যাও মায়া মোহ কর মুক্ত হিয়া।
ডাকরে একান্ত মনে দয়াল ঈশ্বরে,
পুণ্য প্রেম প্রীতিধারা জাগিবে অন্তরে।
হৃদয় কমল দলে ভক্তির আসনে
বসায়ে হৃদয়-নাথে পূজ একমনে।

জ্ঞানময় যত জ্ঞান লভি তোমা হতে,
সে জ্ঞানের সীমা আর কোথা এ জগতে।
কোনো ঋষি কোনো যোগী সাধ্য নাহি কার
কোনো ধর্ম্ম গ্রন্থে তাহা নহে শিখিবার।
তোমার নিকটে আসি আকুল হৃদয়,
করিলে প্রার্থনা, পূর্ণ হয় সমুদয়।
ডাকিলে কাতর হয়ে অমনি তোমার
মুক্ত কর ওঅসীম দয়ার ভাণ্ডার।
ভিখারীর মনোবাঞ্ছা দাও পূর্ণ করে,
নিরাশা ব্যথিত হয়ে কেহ নাহি ফিরে।
তব দ্বার হতে প্রভু, তাই বড় আশা,
মিটাও প্রাণের মম ক্ষুধিত পিপাসা।
সর্ব্বকাজে সর্ব্বভাবে সকল সময়ে,
জাগ্রত দেবতা সম থাক এ হৃদয়ে।

দয়াময় এই নামে ভরে মোর প্রাণ,
কি সুধা আনন্দধারা লভি অবিরাম।
বিশ্বের রাগিণী সনে এই নাম গান
ঢালে শান্তি প্রীতি প্রাণে আনন্দ আরাম।
দয়াময় এই নাম নিখিল ভুবনে,
দয়াময় এই নাম জাগে রবি করে,
দয়াময় এই নাম সলিলে পবনে,
দয়াময় নাম জাগে তটিনী সাগরে।
পিতা মাতা প্রভুরূপে জাগিছ সবার,
ঢালিছ স্নেহের ধারা সমভাবে সবে,
অনাথের নাথ তুমি কেহ নাহি যার,
তাহার সর্ব্বস্ব হয়ে আছ এই ভবে।
তেমনি সর্ব্বস্ব হও হৃদয়ে আমার,
তোমাতেই মিশে থাক্ জগৎ সংসার।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞান।

বর্ত্তমান সময়ে যদি সেই উপনিষদ ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হইতে, তাহা হইলে আমরা শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গিয়া যদ্দারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায় সেইরূপ উপদেশ গ্রহণ করিতাম। কিন্তু সে আশা কল্পনাতেই রাজত্ব করুক। উপনিষদের যুগে যে প্রণালীতে ধর্ম্ম-শিক্ষা হইত তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখা যায়। হায়! এখন তাহা উপনিষদেই থাকিয়া গেল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যের প্রতি গুরুর প্রথম আদেশ এই—সত্যং বদ, ধর্ম্মঞ্চর, স্বাধ্যায়ান্মা-প্রমদ, সত্য কথা কহিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে, বেদাধ্যয়ন করিবে, দেব গুরু ও পিতৃকার্য্য করিবে, গুরুর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া দক্ষিণা দিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না, কুশল (শুভ-কর্ম্ম) হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। মাতাকে দেবতুল্য পূজা করিবে, আচার্য্যকে দেবতুল্য পূজা করিবে, অতিথিকে দেবতুল্য পূজা করিবে। আমাদের (আচার্য্যদিগের) সুচরিত সকল অনুষ্ঠান করিবে, অন্য আচরণ (ধর্ম্ম-বিরুদ্ধাচরণ) অনুষ্ঠান করিবে না। দানধর্ম্ম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না। বুদ্ধি বিনয় প্রভৃতির সহিত দান করিবে।

এই কয়েকটী উপদেশ মানব-জীবনের সকল কার্য্য-ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করে। যদি এতদনুসারে জীবন-পথে চলিতে পারি, আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানের সময় আর নাই। আমাদের সন্তানেরা কোথায় জ্ঞানলাভার্থে গমন করিবে? হয়ত একজন নাস্তিকের কাছে, কিম্বা চরিত্র-হীন শিক্ষকের কাছে, অথবা জ্ঞান-হীন আচার্য্যের কাছে। তাহার ফল—"অন্ধেনৈব নীয়-মানাঃ যথান্ধাঃ। বর্ত্তমান সমাজ এরূপ সত্যানৃতে মিশ্রিত যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহা অতীব অনিষ্ট-কর।

বৈদিক সময়ে জ্ঞান ও পরাবিদ্যা অভিন্নার্থ ছিল। কিন্তু এখন সেই ব্রহ্মজ্ঞান অধ্যাপনা করি-বার লোক কোথায়? প্রাচীন-কালে সকল বিদ্যাই গুরুগৃহে বাস করিয়া শিখিতে হইত। শ্বেতকেতু দ্বাদশ বর্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গুরু-গৃহে ছিলেন, তথাপি সকল শিখিতে পারেন নাই, কেবল "অনুচানমানী" মাত্র হইয়াছিলেন। পিতার নিকট পদে পদে অপ্রতিভ হইত। পিতাও সে কালে জ্ঞান-ধর্ম্মে সুশিক্ষিত ছিলেন। এখন সে পিতা ও সে শিক্ষক নাই।

বৈদিক সময়ে গুরুগৃহবাস ব্যতীত পরা কিম্বা অপরা কোন বিদ্যাই শিক্ষা হইত না। বর্ত্তমান সময়ে College Boarding system অর্থাৎ কলেজ-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে সেই রীতির একটী ক্ষীণ অনুকরণ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপকেরা যদি নিজ নিজ ক্ষতিলাভের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রগণের সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে গুরুগৃহবাসের কথঞ্চিৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। দ্বাদশ বর্ষ অথবা নয় বর্ষ ধরিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বী গুরুর নিকট বাস করার ফল যদিও বর্ত্তমানে নাই তথাপি অনেকদূর হইতে পারে।

কিন্তু কোথায় সেই ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞান, কোথায় সেই শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য, আর কোথায় এই বর্ত্ত-মান যুগের বিদ্যা-শিক্ষা প্রণালী। যে বিদ্যা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানিতে পারা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা সেই অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, তাহার আশা নাই। বেদাচার্য্যেরাই দুঃখ করিয়া বলিতেন যে শুনিবার উপায়াভাবে অনেকে সেই অশ্রুত ব্রহ্মকে জানিতে পারে না এবং শুনিয়াও অনেকে তাঁহাকে জানিতে পারে না। "আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ"।

ঐশী-শক্তির ধারাবাহিকতা আছে। যে শক্তি ঋষিদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সে শক্তি এখনও কি কার্য্য করিতেছে না? ঊর্দ্ধে অধোতে সম্মুখে পশ্চাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালে সেই একই শক্তি। কেবল ভারতবর্ষে কেন, অন্যান্য বর্ষে—কেবল ভূলোকে কেন,

অন্যান্য লোকেও সেই ব্রহ্মশক্তি। যদি ব্রহ্মশক্তিকে এই রূপে অনুভব করি, তাহাহইলেই যথার্থ তাঁহাকে দেখি। সীমাবিশিষ্ট ব্রহ্ম ব্রহ্ম-নামের বাচ্য নহে। সেই এক ব্রহ্ম শক্তি যেমন ধর্ম্মজগতে কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ বিজ্ঞান-জগতেও কার্য্য করিতেছে। কোপার্নিকাশ যে জ্যোতিষ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্গণ সেই বিজ্ঞান অনুসন্ধানেই নিযুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞান জগতের ধারাবাহিকতা কখনও বিনষ্ট হইবে না। ধর্ম্মজগতে কি তবে তাহা বিনষ্ট হইবে? যাহা আমাদের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের মূল, তাহা অবিনশ্বর অক্ষরে মানব-হৃদয়ে চির-মুদ্রিত থাকিবে না? ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি; উন্নতির ধারা কিছুদিনের জন্য রুদ্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু একেবারে তাহা পরিশুষ্ক হইবার নহে।

নানা-কথা।

দেবালয়।—বিগত ১৩ই ভাদ্র সোমবার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দেবালয়ে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ইহার সহিত ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের সম্বন্ধ।" তাঁহার বক্তৃতা মনোজ্ঞ হইয়াছিল। দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদারতা, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, স্বার্থত্যাগ ও তাঁহার সমুন্নত ধর্ম্ম-জীবন বাস্তবিকই সকলেরই অনুকরণীয়। প্রাচীন বয়সেও তাঁহার কি জ্বলন্ত উৎসাহ।

বক্তৃতা।—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় বার্লিন নগরে গমন করিয়াছেন। তিনি Berlin world Congress of Free christianity and Religious Progress সভায় একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" যিনি ভূমা—মহান্, তিনিই সুখস্বরূপ, ক্ষুদ্র বিষয়ে সুখ নাই।" ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শ্লোক ও মহর্ষির ব্যাখ্যান হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তিনি আপনার বক্তব্য বিষয় বেশ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শোক।—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছি। কোরাণ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থের বঙ্গ-অনুবাদ তাঁহার নাম স্মরণীয় রাখিবে। তিনি আজীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া চলিয়া গেলেন। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।

বিজ্ঞান-দর্পণ।—শ্রীযুক্ত হীরাধন রায় এম, এ, এফ, সি, এস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ভারতে বিজ্ঞানের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। তাই সম্পাদক বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানতত্ত্ব বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য পত্রিকা খানি বিশেষ যোগ্যতার সহিত লিখিত হইতেছে। ইহাতে অনেকগুলি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ প্রতি মাসেই থাকে। আমরা এই পত্রিকা খানির দীর্ঘজীবন কামনা করি। মধ্যে মধ্যে এই পত্রিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

রঙ্গমঞ্চ।—মাসিক পত্রিকা আকারে শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহির করিয়াছেন। মণিলাল বাবু সাহিত্যসেবী। প্রথম খণ্ড খানি নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে; বিষয় নির্ব্বাচন মন্দ হয় নাই। নট নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করা লেখকের উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ আনন্দবিধান ও তৎসঙ্গে শিক্ষাদান করা নাট্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই মহান্ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অভিনয়-কার্য্য সম্পাদিত হইলে জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা পত্রিকা পাঠে আনন্দিত হইলাম। ইহার বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

সামাজিক ব্যাধি।—রেভাঃ চার্লস ভায়সী সাহেব সামাজিক নীতি ও জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে গত ১০ই জুলাই তারিখে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিলাতীয় সমাজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষার ত্রুটিতে অনেক দোষ সমাজে প্রবেশ করিতেছে। গৃহেও সকল সময়ে সুশিক্ষা প্রদত্ত হয় না। আদালতের সাহায্যে পতিপত্নী বিচ্ছেদের divorce suits আধিক্য গার্হস্থ্য পবিত্রতার পরিচায়ক নহে। ব্যভিচারের মাত্রা প্রতিদিনই বাড়িয়া যাইতেছে। আইন তাহার প্রতীকার করিতে অক্ষম। পুলিশের সাহায্যে ব্যভিচারিণীগণকে নগরের একপ্রান্তে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শতশত যুবতীকে বিদেশে লইয়া যাওয়া হয়; উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করাইবার জন্য। ভায়সী সাহেব প্রতিবিধানকল্পে অল্পবয়সে বিবাহ সমাজে প্রবর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন অল্পবয়সে বিবাহে দারিদ্র আসিতে পারে বটে, কিন্তু উহা দুর্নীতি ও দুর্গতি অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেয়স্কর। মদিরা-

সক্তি সামাজিক দুর্নীতির অন্যতম। জুয়াখেলা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। লোকে স্বাস্থ্যজনক ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা ছাড়িয়া আজকাল ঘোড়দৌড়ে গিয়া বাজি ধরিতে সমুৎসুক। আজকালকার দিনে লেখকের লেখনী সংবাদ পত্রে সংযত নহে। সংবাদ-পত্র পাঠে যুবকের হৃদয় অনেক সময়ে সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, ধুর্ত্তামি চালাকী পরনিন্দা ও দলাদলির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে, রাজদ্রোহ ও অসন্তোষের ভাব মনে জাগিয়া উঠে। যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যাঁহাদের বক্তৃতায় স্বদেশের সম্মান ও কল্যাণ-রক্ষার জন্য ব্যাকুলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিলাসের ভাব অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিতেছে।

ভায়েসী সাহেবের এই সকল মূল্যবান ইঙ্গিত যে সত্য-সত্যই ভাবিবার ও চিন্তা করিবার, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১, বৈশাখ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪২১৲
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩০২১।/৯
সমষ্টি	...	৩৪৪২।/৯
ব্যয়	...	৩২৫৫
স্থিত	...	৩১১৭।/৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৫১৭।/৬

৩১১৭।/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ৩২৮৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয় ২০০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বনমালী চন্দ্র ১০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ১০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
,, ,, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, ,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, ,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, ,, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	২৲
,, সুহাসিনী দেবী	২৲
,, নীপময়ী দেবী	১৲
,, প্রফুল্লময়ী দেবী	১৲
,, চারুবালা দেবী	১৲
,, লতিকা দেবী	১৲
,, কমলা দেবী	১৲
,, অলকা দেবী	১৲
,, সুকেশী দেবী	১৲
,, ইরাবতী দেবী	১৲
	৩২৮৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪৸৵০
পুস্তকালয়		৯।৵০
যন্ত্রালয়	...	৩০৲
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৮৸০
সমষ্টি	...	৪২১৲

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৭৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৪৶৩
পুস্তকালয়	...	১৫৸৶০
যন্ত্রালয়	...	৯০৸৵৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৫।৶৬
ইলেকৃট্রিক্ লাইট	...	১।৵০
সমষ্টি		৩২৫৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১, জ্যৈষ্ঠ।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩২৭৷৴০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩১১৭।৴৬
সমষ্টি	...	৩৪৪৪৸৵৬
ব্যয়	...	৩৯৩।৴০
স্থিত	...	৩০৫১৷৴৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৪৫১৷৴৬

৩০৫১৷৴৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২০০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে
পাওয়া যায়

২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৷৵০
পুস্তকালয়	...	১০৷৶০
যন্ত্রালয়	...	১০৮৲
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		২৷০
সমষ্টি	...	৩২৭৷৴০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৯।৵৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৭৸৵৩
পুস্তকালয়	...	৪।৶৩
যন্ত্রালয়	...	১০৮৸৵৯
ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট	...	২২৷০
সমষ্টি	...	৩৯৩।৴০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১, আষাঢ়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪২৮৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩০৫১৷৴৬
সমষ্টি	...	৩৪৭৯৸৬
ব্যয়	...	৩১৩।৵৩
স্থিত		৩১৬৬।৴৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৫৬৬।৴৩

৩১৬৬।৴৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩০২৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের
ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে
প্রাপ্ত

২০০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	।০
কোম্পানীর কাগজের সুদ	৯৭৶৯
দানাধারে প্রাপ্ত	৪৷৴৩

৩০২৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৷০
পুস্তকালয়	...	৪৲
যন্ত্রালয়	...	১২০৷৵০
সমষ্টি	...	৪২৮৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭২৸৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৸৬
পুস্তকালয়	...	১৪৶৬
যন্ত্রালয়	...	৯৭৷৴৩
সমষ্টি	...	৩১৩।৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত পি, চৌধুরী	১০৲
শ্রীযুক্ত নরনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
শ্রীযুক্ত বনমালী চন্দ্র	১৲

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

গীতার প্রশ্ন উত্তর।

(১ম—৬ষ্ঠ অধ্যায়।)

১ প্রঃ। ভগবদ্গীতার উৎপত্তি কি সূত্রে হইল, বল।

১ উঃ। বহু চেষ্টা এবং সাধনার পর দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডবদিগকে পঞ্চ গ্রাম এমন কি সূচ্যগ্র ভূমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিল না, তখন যুদ্ধ আয়োজন হইল। কুরুক্ষেত্রে উভয় সৈন্য যুদ্ধ উদ্যোগ করিয়া সম্মুখীন হইল—উভয় পক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরগণ আপন আপন জয়শঙ্খ শব্দিত করিয়া অগ্রসর হইলেন, অর্জ্জুনের অনুরোধ ক্রমে তাঁহার সারথী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথ কুরুসৈন্যের সম্মুখে স্থাপন করিলেন—অর্জ্জুন দেখিলেন তিনি রাজ্যাশায় যাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ তাঁহার গুরু, কেহ আচার্য্য, কেহ পিতামহ, কেহ শ্যালক, কেহ শ্বশুর, কেহ ভ্রাতা, কেহ পূজ্য সম্মাননীয়, কেহবা একান্ত স্নেহপাত্র। তিনি বলিলেন এই আত্মীয়বর্গকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ দূরের কথা, জীবন পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করি না—কেমন করিয়া ইহাদিগকে বাণবিদ্ধ করিয়া বধ করিব। হে কৃষ্ণ! আমি রাজ্য-ধন চাহি না—আমি যুদ্ধ করিব না। এই কথা বলিয়া অস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুন যুদ্ধবিমুখ হইয়া বিষণ্ণ মনে অবসাদগ্রস্ত দুর্ব্বলের ন্যায় রথপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ক্ষত্রিয় নিত্যজয়ী পার্থের এই মোহবিহ্বলতা দূর করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। জ্ঞান, কর্ম্ম, ধর্ম্ম সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝাইলেন যুদ্ধ করাই তাঁহার উচিত, যুদ্ধবিমুখ হইলে তাঁহার ইহ-পরলোক নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইবে। নারায়ণের উপদেশে অর্জ্জুনের চিত্তদুর্ব্বলতা দূর হইয়া গেল, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

১ উঃ। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা অন্যায় পূর্ব্বক পাণ্ডবদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। সেই রাজ্য ফিরে নেবার জন্য পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করা স্থির করলে পর কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষের সৈন্য সম্মুখীন হয়। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলকে প্রতিপক্ষে দেখে অর্জ্জুন যুদ্ধে তাঁদের হত্যা

সম্ভাবনায় অত্যন্ত কষ্টবোধ করলেন, এবং তাঁর সারথী শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন যে এ পাপ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু বা ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন ভাল। তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করে' হাতের ধনুক ফেলে বিষণ্ণ হয়ে যখন বসলেন, তখন ভগবান তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য যে সকল গভীর ও মধুর ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন, তারই নাম জগদ্বিখ্যাত ভগবদ্গীতা। নবীন সেন বলেন গীতার অভিনেতা অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, স্থান কুরুক্ষেত্র, দর্শক সমবেত নৃপতিমণ্ডলী। ধৃতরাষ্ট্র নিজে এই যুদ্ধ-ব্যাপার দেখ্‌তে অনিচ্ছুক হওয়ায় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে নানা প্রকার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক তাকে অন্ধ বৃদ্ধ রাজার কাছে সেই যুদ্ধ বর্ণনা করবার অনুমতি করলেন, সুতরাং সঞ্জয়ের মুখেই ভগবদ্গীতা আদ্যোপান্ত ব্যক্ত হয়।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

২ প্রঃ। মৃতের জন্য শোক করা উচিত নয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কিরূপে বুঝাইলেন?

২ উঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য প্রথম বুঝাইয়া দিলেন মৃতের জন্য শোক করা ধীমান ব্যক্তির যোগ্য নয়, কেন না আত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত। মৃত্যু বিনাশ নয়, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্তি। আমরা শৈশব অতিক্রম করিয়া যখন যৌবনে প্রবেশ করি এবং যৌবনান্তে যখন জরাগ্রস্ত হই, তখন তো শোক করি না। তবে মৃত্যুর জন্য কেন শোক করিব, তাহাও অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র; আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সত্য, তাহার ধর্ম্ম মরণশীলতা; কিন্তু দেহের যথার্থ কর্ত্তা যে আত্মা তিনি জন্ম-মৃত্যু রহিত, অবিনাশী, অক্ষয় এবং নিত্য। যখন দেহের মৃত্যু হয়, তখন দেহস্বামী আত্মা তাহা জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন জীবের আদি অব্যক্ত অপ্রকাশ, কেবলমাত্র এই লোকে এই জীবন ব্যক্ত। অব্যক্ত আদির জন্য তো আমরা শোক করি না, তবে অব্যক্ত শেষের জন্য কেন শোক করিব? স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ অবৈধ শোকে অভিভূত হয়েন না। জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যাহা নিশ্চিত তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়। ইহা ভিন্ন যাঁহারা আজ আছেন, তাঁহারা যে পূর্ব্বে ছিলেন না—এমন নয় এবং যাঁহারা আজ নাই, তাঁহারা যে আবার ভবিষ্যতে আসিবেন না, এমনও নয়। যেমন জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চিত, তেমনি মৃতের জন্মান্তর প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। নিম্ন লিখিত কয়েকটি শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে মৃত্যু কেন অশোচ্য তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

১। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।

২। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

৩। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

৪। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

প্রিয়ম্বদা।

২উঃ। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন মৃতের জন্য শোক অনুচিত, কারণ (ক) আত্মা অবিনাশী, শরীরের অন্তে তার অন্ত হয় না। (খ) যদি মনে কর আত্মা নিত্য মরে ও নিত্য জন্মায়, তাহলেও অপরিহার্য্য অনিবার্য্য ঘটনার জন্য শোক অনুচিত। তা' ছাড়া জীবের মধ্য-অবস্থা শুধু আমরা ব্যক্ত দেখ্‌তে পাই, তার আদি অব্যক্ত অবস্থার

জন্য যখন দুঃখ করিনা, তখন অন্তের অব্যক্ত অবস্থার জন্যই বা দুঃখ করিব কেন? (গ) এ স্থলে অর্জ্জুনকে বিশেষ-রূপে, আরও বোঝালেন যে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম পালন করা উচিৎ, তা'তে সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি যাই হোক্।

ইন্দিরা।

৩ প্রঃ। গীতার কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা কর। কি কি ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের বন্ধন-দোষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, গীতার বাক্যে দেখাও। নৈষ্কর্ম্ম লাভের অধিকার কখন্ হয়?

৩ উঃ। শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অ-ধ্যায়ে জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বুঝাই-লেন, আত্মজ্ঞানী তত্ত্ববিৎ কর্ম্মপরাঙ্মুখ হইবে না, (১) কেন না কর্ম্মসাধন ভিন্ন মনুষ্য তিল-মাত্র তিষ্ঠিতে পারে না, কেন না আমাদের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলেও আমা দের কর্ম্ম করিতে হয়। তবে ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মন্যেবাধি-কারস্তে মা ফলেষু কদাচন। (২) কর্ত্তৃত্বা-ভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন।

(৩) ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিবে, কেন না তদ্ভিন্ন কাম্য কর্ম্মই মুক্তিপথ রোধ করে—(৪) যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে—অর্থাৎ আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্ম-ফলে স্পৃহা-বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, তাহাই কুশল কর্ম্ম, কেন না সে কর্ম্ম আমাদিগকে বন্ধন করিতে পারে না। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মানি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

আসক্তি বিনাশের হেতু আসক্তি রহিত হইয়া কার্য্য করিবে, কেন না

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি।

গীতা জ্ঞানবাদী, তাই কাম্য-কর্ম্মের প্রতি বিরোধী, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের একে-বারে বিরোধী নহেন। গীতা বলেন দেবতা-দিগের প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ করিলে তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে নিয়ত যে উপকার লাভ করিতেছি তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান হয় এবং কতক প্রতিদান করা হয়। কেন না কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আমরা যাহা ভোগ করিয়া থাকি, দেবতা প্রীতির জন্য করি না, তাহা অতি নিকৃষ্ট ভোগ—পশুযোগ্য। যজ্ঞসাধন দ্বারা পরমেশ্বরেরও প্রীতি সাধন করা হয়, কেননা—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ
যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞকর্ম্মসমুদ্ভবঃ
যজ্ঞং ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং।

(৫) লোক সংগ্রহের জন্যও কর্ম্ম করা আবশ্যক, কেন না মহৎগণ যাহা করেন প্রাকৃত লোক তাহারি অনুসরণ করিয়া থাকে। জনকাদি রাজর্ষিগণ যদিও আত্ম-জ্ঞানী এবং মুক্তপুরুষ ছিলেন, তবুও তাঁহারা চিরজীবন লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটি করেন নাই।

(৬) যাঁহার যে ধর্ম্ম তাঁহার তাহারি অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য, কেন না তাহা না হইলে সামাজিক শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ভগবান বলিতেছেন চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য এবং তাহা না করিলে অধর্ম্ম হয়। ভগবান বলিতেছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধ-ত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে পাপ-চেষ্টাস্বরূপ।

যিনি কর্ম্মফল প্রত্যাশা না করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তিনি সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্ম-ত্যাগের অধিকারী

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী চ যোগীচ ন নিরগ্নিঃ নচাক্রিয়ঃ।

আত্মজ্ঞানলব্ধ, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্মের অধিকারী; কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে—সাংখ্য মতে যিনি কৈবল্য স্বরূপে অবস্থিত এবং গীতার মতে যিনি পরব্রহ্মের সহিত যোগ-যুক্ত, তাঁহার করণীয় আর কিছুই থাকে না। যিনি তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, তিনি কখনই নৈষ্কর্ম্মের অধিকার লাভ করেন না—তাঁহার কর্ম্ম-বিমুখতা তামসিক জড়তা মাত্র।

প্রিয়ম্বদা।

৩উঃ। এক হিসাবে গীতার মুখ্য কথাই কর্ম্মযোগ, কারণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মে বা ধর্ম্মপ্রবৃত্ত করাই গীতার উদ্দেশ্য। যদিও জ্ঞানীকে এবং জ্ঞানযোগকে খুব উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে পুনঃপুনঃ বলা হয়েছে যে কর্ম্মসোপান দিয়ে তবে জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিতে হবে, একেবারে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া যায় না। তবে কর্ম্ম করিতে হবে কিরূপে? না (ক) ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে, নিষ্কামভাবে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

(খ) আমি কর্ত্তা নই, প্রকৃতির গুণ-বশতঃ ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে নিযুক্ত রয়েছে, এই মনে করে'—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

(গ) সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে'।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি যুক্ত আসীত মৎপরঃ

এই প্রকারে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের বন্ধন-কারী দোষ হতে মুক্ত হওয়া যায়। কর্ম্ম করতেই হবে, তুমি চাও বা না চাও; কারণ কেউ সম্পূর্ণ নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে' থাকতে পারে না। শরীর-যাত্রা পর্য্যন্ত কর্ম্ম না করলে চলে না। তবে উপরি-উক্ত ভাবে করলে কর্ম্ম মুক্তির অন্তরায় না হয়ে বরং সহায় এবং উপায় হয়। তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্ম তার সোপান। যে যোগ-পথের পথিক, কর্ম্মই তার অবলম্বন। তবে যে যোগসিদ্ধ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেছে, গন্তব্য স্থানে পোঁচেছে, একমাত্র সেই ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্মের অধিকারী।

ইন্দিরা।

৪ প্রঃ। ভগবান স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন বিষয়ে কি বলিতেছেন?

৪ উঃ। অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে দিতে স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন

অযোনিঃসন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া—

যদিও আমি অক্ষর নিত্য ও অনাদি এবং সর্ব্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট, তবুও আত্ম-মায়ার দ্বারা আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। যদিও এ বিশ্বে আমার আকাঙ্ক্ষণীয় কিম্বা অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, তবুও সাধারণ মানবের ন্যায় আমিও কর্ত্তব্যের নিয়ত বশবর্ত্তী। এবং যে সময়ে অধর্ম্মের অভ্যু-

থান ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, হে ভারত! তখন আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

সাধুদিগের পরিত্রাণ—পাপকারীদিগের বিনাশ সাধন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত—যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

প্রিয়ম্বদা।

৪উঃ। কর্ম্ম সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে গীতার আর এক যুক্তি এই যে মহতে যা' করে ইতরলোকে তারই অনুকরণ করে, অতএব লোকরক্ষা ও সৎদৃষ্টান্তের অনুরোধে কর্ম্মত্যাগ করা অনুচিত। এই সূত্রে ভগবান বলেন যে তাঁরও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তু অপ্রাপ্য নাই, কোন বিষয়ে আসক্তি নাই, কোন কাজ করবার আবশ্যকতা নাই, তবুও তিনি সর্ব্বদা কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত, নইলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, বিশ্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

ইন্দিরা।

৫প্রঃ। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ বিষয়ক শ্লোকগুলি অন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা কর, (২।৪২-৪৫)

৫ উঃ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ
বেদবাদরতাঃ পার্থ, নান্যদস্তীতিবাদিনঃ
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাঃ
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

হে পার্থ, বেদবাদরতা অন্যৎনাস্তি ইতি বাদিনঃ কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ যে অবিপশ্চিতঃ যামিমাং জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

হে পার্থ পৃথানন্দন, বেদবাদরতাঃ বেদবাদপরায়ণাঃ অন্যৎনাস্তি বেদাদৃতে অন্যৎনাস্তি বাদিনঃ ইতি কথকাঃ কামাত্মানঃ ভোগানুরক্তাঃ স্বর্গপরাঃ স্বর্গাভিলাষিণঃ যে অবিপশ্চিতঃ অপণ্ডিতাঃ তত্ত্বজ্ঞানবিরহিতা জনাঃ যাং ইমাং জন্ম পুনর্জন্ম কর্ম্মফলঞ্চ প্রকর্ষেণ দদাতীতি তাং, ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি বিষয়ানুরাগ ধনরত্নলাভং প্রতি তদুদ্দেশে ক্রিয়মানং ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং বহু যাগ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ণাং পুষ্পিতাং বিষলতাদিবৎ আপাতরমণীয়াং বাচং কথাং প্রবদন্তি বিশেষেণ কথয়ন্তি ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং বিষয়মুগ্ধচিত্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং ক্রিয়াবিশেষ বহুলযা হৃত-চেতসাং লুপ্ত হৃদয়ানাং তেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ বিষয়মুগ্ধা চিত্তবৃত্তিঃ সমাধৌ নির্বীজধ্যানে ন বিধীয়তে ন সম্যক্ কার্য্যকরী ভবতি।

হে পার্থ! বেদানুমোদিত বাক্যের প্রশংসাকারী, এবং ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই যাহারা বলিয়া থাকে, যাহারা বিষয়মুগ্ধ এবং স্বর্গাভিলাষী, যাহারা তত্ত্বজ্ঞান রহিত, যাহারা জন্মকর্ম্ম প্রদানক্রিয়াপূর্ণ যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী, যাহারা আপাতরমণীয় বাক্য সকল বলিয়া থাকে, যাহাদের চিত্ত ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে অনুরক্ত, যাহারা যাগ-যজ্ঞের কার্য্য বহুলতায় মুগ্ধ, তাহাদের বিষয়-বিমোহিত চিত্তবৃত্তি সমাধি অর্থাৎ নির্বীজ ধ্যানের উপযোগী হয় না।

প্রিয়ম্বদা।

৫উঃ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

হে পার্থ, অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং জন্মকর্ম্মফলপ্রদং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং বাচং প্রবদন্তি তয়াপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

অর্থাৎ;—হে পার্থ, বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে যারা সারধর্ম্ম মনে করে, এবং তা' ছাড়া আর কিছু নাই ভাবে, এমন

যে সব সকাম স্বর্গসুখলোভী মূর্খ, তারা যে সকল আপাতমনোরম ললিত কথায় পরজন্মে সুকৃতির ও সুফলের আশা দেয়, নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে উপদেশ দেয়, এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায়, সেই সকল মিষ্টবাক্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তিরাই ভোলে। তাদের শুভবুদ্ধি কখনই সমাধিতে স্থির হয় না।

ইন্দিরা।

৬প্রঃ।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

এই শ্লোক ব্যাখ্যা কর।

৬উঃ।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ, বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ। পরিপ্লাবিতে মহাসমুদ্রে সন্নিকটে সতি উদপানে বাপী কূপাদি ক্ষুদ্রে জলাশয়ে যাবানর্থঃ যাবৎ প্রয়োজনং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিতি তাবৎ বিজানতঃ সম্যক্ জ্ঞানশীলস্য প্রজ্ঞারত ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ সর্ব্বেষু বেদেষু শাস্ত্রেষু তাবানর্থঃ প্রয়োজনমিতি শেষঃ।

পরিপ্লাবিত মহাসমুদ্র নিকটে থাকিলে বাপী কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের যেমন কোনই প্রয়োজন থাকেনা, ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট তেমনই বেদ বাক্যের ও শাস্ত্র-প্রমাণের কোনই প্রয়োজন থাকে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাহার নিকট সৃজন সৃষ্টি এবং সৃজনকারের সকল গূঢ় রহস্য প্রকাশিত—যাহার হৃদয় সেই পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত, তাহার বেদ কিম্বা শাস্ত্র কিছুরই আবশ্যক নাই। তিনি সকল লৌকিক বিধি-বিধান সকল কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান সকল প্রশ্ন সকল মীমাংসার অতীত হইয়া যান। সমগ্র যাঁহার নিকট ব্যক্ত প্রকাশিত, তাঁহার আর ক্ষুদ্র অংশ সকলের প্রয়োজন থাকে না।

প্রিয়ম্বদা।

৬উঃ।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবান্ অর্থঃ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্ (অর্থঃ)।

অর্থাৎ কি না সব স্থান যখন জলে ভেসে গিয়েছে, তখন উদপান বা ক্ষুদ্র জলাশয় যেমন অনাবশ্যক, যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তার পক্ষে বেদ সকলও তেমনি অনাবশ্যক। যখন হাতের কাছে সর্ব্বত্রই জল পাওয়া যায়, তখন কূপ তড়াগাদিতে যাবার আবশ্যক কি? তেমনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগ হয়, তাঁকে আত্মায় পাওয়া যায়, তখন শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে খুঁজ্‌তে যাবার আবশ্যক কি?

ইন্দিরা।

৭ প্রঃ।

কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা এই বাক্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যাখা কর।

৭ উঃ। কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখার এক অর্থ, সকল মানুষিক ভাল কাজের মধ্যেও একটু মন্দ এবং মন্দ কাজের মধ্যেও একটু ভাল থাকে, সেইটে বুঝতে পারা। আর এক অর্থ, কর্ম্মের যে দোষ বন্ধনকারিতা, সেটা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, যদি নিষ্কাম কর্তৃত্বজ্ঞানশূন্য ভাবে করা যায় এবং ঈশ্বরে সমর্পণ করা যায়। তাহলে সেই ভাবের নির্দ্দোষ কর্ম্মকে অকর্ম্ম বল্লেও চলে, কারণ কর্ম্মের দোষই যদি স্পর্শ না করে ত কর্ম্মে অকর্ম্মে প্রভেদ কি? আর অকর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ যদি করি, তাহ'লে সেই কর্ত্তব্য ত্রুটি-জনিত ফলভাগী আমাকে হ'তে হবে। অতএব কর্ম্মফল ভোগী হ'লে আর কর্ম্মের বাকি রইল কি? সুতরাং এ স্থলে কর্ম্ম না করেও কর্ম্মদোষ স্পর্শ করায় অকর্ম্মও কর্ম্মের সমান হয়ে পড়ল। সংক্ষেপে কর্ম্মের বন্ধনকারীতাই কর্ম্ম নাম বাচ্য, সেইটে থাক্‌লে অকর্ম্মও কর্ম্মরূপ

ধারণ করে। এবং সেটা এড়াতে পারলে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের সামিল হয়। এই কর্ম্ম-কৌশলই যোগ—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

ইন্দিরা।

৮প্রঃ। আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে শ্লোকগুলি বল। (মূল ও অর্থ)

৮উঃ।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা,
তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি।

দেহিনঃ শরীরিনঃ অস্মিন্ দেহে শরীরে কলেবরে চ যথা কৌমারং শৈশবং যৌবনং প্রাপ্তবয়ঃ জরা বার্দ্ধক্যং চ একঃ অন্যং অনুসরতি তথা তদ্রূপং দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ভিন্নদেহগ্রহণং মৃত্যুরিতি যাবৎ ধীরঃ পণ্ডিতঃ জনঃ তত্র ন মুহ্যতি নানুশোচতি।

আমাদিগের এই শরীরে শৈশব যেমন যৌবনে, এবং যৌবন যেমন বার্দ্ধক্যে পরিণত হয়ে অবস্থার তারতম্য উপস্থিত করে—মৃত্যুও তেমনি এই ভৌতিক দেহের অবস্থান্তর মাত্র, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে বিচলিত কিম্বা কাতর হয়েন না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজোনিত্যঃ শাশতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

অয়ং আত্মা ন জায়তে, কদাচিৎ ন ম্রিয়তে বা নভূত্বা ভূয়ঃ ন ভবিতা, অজঃ নিত্যঃ শাশতঃ পুরাণঃ শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে।

অয়ং আত্মা কদাচিৎ ন জায়তে, ন ম্রিয়তে ন মৃতঃ ভবতি; ভূত্বা অয়ং ভূয়ঃ পুনরপি ন ভবিতা ন, অয়ং অজঃ জন্ম রহিতঃ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়ঃ শাশতঃ নিত্যৈকভাবঃ পুরাণঃ পুরাতনঃ চিরন্তনোঽপি শরীরে অস্মিন্ দেহে হন্যমানে ঘাতিতে সতি ন হন্যতে।

এই আত্মা জন্ম মৃত্যু রহিত, একবার হইয়া আর না হইবার নয়, ইহা আদিহীন, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় এবং চিরন্তন, হত হইলেও ইহার বিনাশ নাই।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় নরঃ যথা নবানি অপরাণি গৃহ্ণাতি, দেহী তথা জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি। জীর্ণানি গলিতানি বাসাংসি বিহায় পরিত্যজ্য নরঃ মানবঃ যথা অপরাণি নূতনানি গৃহ্ণাতি দেহী শরীরিতয়া জীর্ণানি জরাগ্রস্তাণি দেহানি ত্যক্ত্বা অন্যানি অপরাণি নূতনানি সংযাতি।

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমরা যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি, তেমনি জরাগ্রস্ত গলিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহী আবার নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত,
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা?

হে ভারত ভরতকুলর্ষভ, ভূতানি অব্যক্তাদীনি অপ্রকাশিতপূর্ব্বাণি ব্যক্তমধ্যানি দৃষ্টিগোচরাণি প্রত্যক্ষীকৃতানি মধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি অপ্রকাশিতানি নিধনানি বিনাশানি যেষাং অপ্রকাশিতনিধনানি তত্র তস্মিন্ বিষয়ে কা পরিদেবনা কা অনুশোচনা—কঃ শোকঃ?

হে ভারত ভরতকুলচূড়া, জীব সকলের জন্মপূর্ব্বকাল অব্যক্ত, তাহার বিচার আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি—তাহাদের মধ্যকাল অর্থাৎ ইহজীবন ব্যক্ত, আমাদিগের জ্ঞানগোচর, তাহাদিগের নিধন শেষ-কাল আমাদের জ্ঞানের অতীত—তাহার জন্য কেন শোক করিবে? অব্যক্ত জন্মপূর্ব্ব কালের জন্য বিলাপ কিম্বা যদি শোক না করি, তবে অজ্ঞাত মৃত্যুপরকালের জন্য কেন অনুশোচনা করিব?

প্রিয়ম্বদা

৮উঃ।

দেহিনোস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

মনুষ্যদেহে যেমন পর পর কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্য দেখা দেয়, মৃত্যুও তদ্রূপ একটা অবস্থান্তর মাত্র। ধীরব্যক্তি তজ্জন্য শোক করেন না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

আত্মা'র জন্ম বা মৃত্যু কখনো নাই, একবার হয়ে যে আবার হবে তাও নয়। এই আত্মা জন্মরহিত, অনন্ত, বিকার শূন্য এবং সনাতন, শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বিনাশ হয় না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ॥
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় ছেড়ে ফেলে অন্য নূতন কাপড় পরে, তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে' দেহী অপর নূতন শরীর ধারণ করে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি, ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

জীব আদিতে অব্যক্ত, হে ভারত, মধ্যে ব্যক্ত, আবার অন্তকালে অব্যক্ত, তার জন্য দুঃখ কি ?

ইন্দিরা।

৯প্রঃ।

যজ্ঞ বিধান বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের ৭টি শ্লোক (১০-১৬) সম্বন্ধে কি বক্তব্য ?

৯উঃ। গীতা যদিও জ্ঞানবাদী, তবুও কর্ম্ম-সন্যাস তাহার অনুমোদিত নহে, কাম্য-কর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। দেবতা-প্রীতির জন্য যে যজ্ঞ তাহা গীতানুমোদিত। গীতার লক্ষ্য জ্ঞান, তাহা লাভের সোপান কর্ম্ম। পঞ্চ যজ্ঞাদি সাধন কর্ত্তব্য, কেননা তাহাতে লৌকিক সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, দেবতাপ্রীতি এবং জীবলোকের উপকার সাধিত হয়। অন্ন হইতে জীবলোকের সৃষ্টি, মেঘ হইতে অন্নের সৃষ্টি এবং যজ্ঞ হইতে মেঘের সৃষ্টি হয়। অতএব এক যজ্ঞ সাধন দ্বারা সর্ব্বলোকের উপকার সাধিত হয়। যজ্ঞের উৎপত্তি বেদ হইতে এবং বেদের উৎপত্তি সেই অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে, যজ্ঞেই পরব্রহ্ম নিত্য অধিষ্ঠিত। তবে কাম্যফল বাসনা করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই আমাদিগকে বন্ধন করে। ঈশ্বরোদ্দেশে যে যজ্ঞ সাধিত হয় তাহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এক শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন যজ্ঞের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই মুক্তিপথরোধী, সেই নিমিত্ত সকল কর্ম্মই তাঁহার উদ্দেশে করিবে। এখানে যজ্ঞের অর্থ লৌকিক অনুষ্ঠান নহে, এখানে যজ্ঞের অর্থ বিষ্ণু কিম্বা ভগবান। সকল কর্ম্ম করিতে হইবে কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে করিতে হইবে। গীতা বলিতেছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে যজ্ঞেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত যজ্ঞ অবশ্য অনুষ্ঠেয়। যজ্ঞকালে যজমান দেবতাদিগকে প্রীতির সহিত স্মরণ করেন, তাঁহারাও ভক্তিমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন ইহাতে তাহার ইহপারলৌকিক শ্রীবৃদ্ধি হয়।

প্রিয়ম্বদা।

৯ উঃ। "সহযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্টাঃ", প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞ সম্বন্ধীয় শ্লোক বঙ্কিম বাবুর মতে প্রক্ষিপ্ত। গীতার ভাষা ও ভাবে সর্ব্বত্র যে উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে, এই শ্লোকগুলি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের। সুতরাং উক্ত মত অসঙ্গত মনে হয় না।

ইন্দিরা।

১০প্রঃ।

কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের সহিত পূর্ব্বাপর কি সম্বন্ধ? প্রশ্নটির উত্তর দাও (মূল অর্থ সহিত)

১০উঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের উপদেশ দিলে অর্জ্জুন বলিলেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনুষ্য কেন পাপাচরণ করে? কেন তাহার মনে হয় আর কেহ যেন বল

পূর্ব্বক তাহাকে পাপানুষ্ঠানে রত করিতেছে—এই শক্তিশালী শত্রু কে? শ্রীভগবান বলিলেন

কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং।

এই কাম অর্থাৎ কামনা দুষ্পূর, ইহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, ইহা সর্ব্বভুক, জীবনের সকল বৃত্তি, সকল চেষ্টা নষ্ট করিয়া দেয়, ইহা সর্ব্ব দোষের আকর।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

প্রিয়ম্বদা।

১০ উঃ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম এই সকলের প্রভেদ বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। যখন যখন মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পায়, তখন তখন আমি জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শিক্ষা দিই। মানুষ স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া কিছুই করে না, ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব গুণ অনুসারে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। ফলকামনাশূন্য হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাহাতে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন তবে কে আমাদের যেন বলপূর্ব্বক অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়? ভগবান তদুত্তরে বলিলেন "কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ"। অগ্নি যেমন ধূমে আবৃত, গর্ভ যেমন জরায়ু দ্বারা আবৃত, তেমনি মনুষ্যবুদ্ধি এই দুর্দ্দান্ত রিপু দ্বারা মোহাচ্ছন্ন। ইহা "দুষ্পূর অনলের" ন্যায়, কিছুতেই ইহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই দুর্দ্ধর্ষ রিপুকে সংযম অভ্যাসের দ্বারা জয় করিতে পারিলে তবে মোক্ষপথ পরিষ্কার হয়। মানুষের মন বুদ্ধি ও দেহ ইহার অধিষ্ঠান ভূমি।

ইন্দিরা।

১১ প্রঃ।

গীতোপদিষ্ট জ্ঞান কাহাকে বলা যায়? কোন্ সাধক সে জ্ঞান লাভ করেন? গীতার আদর্শ-জ্ঞানী স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি?

১১ উঃ। গীতোপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান পরাবিদ্যা অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা সেই অবিনাশী অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়—তবে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হয়, নিম্ন লিখিত শ্লোকগুলি হইতে গীতার উপদেশ সুস্পষ্ট হয়—

আরুরুক্ষোঃ মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে॥

যে মুনি যোগ লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কর্ম্মই তাঁহার আরোহণ পদবী, আর যিনি যোগস্থ শম তাঁহার আশ্রয়।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।

জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র ইহসংসারে আর কিছুই নাই, তাহা হইতে যোগসিদ্ধ হইয়া মানব কালে আপনাকেই প্রাপ্ত হয়।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবা হ্যাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদুচ্যতে।

হে পার্থ! সাধক যখন মনোগত সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ, জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

হে শত্রুজয়ী, দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কেন না অখিল কর্ম্মসমূহ জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন,
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে

ভস্মসাৎ করে, হে অর্জুন ! জ্ঞানাগ্নি তেমনি সর্ব্ব কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিং অচিরেনাধিগচ্ছতি।

যিনি শ্রদ্ধাবান এবং ঈশ্বরে ভক্তিপরায়ণ, তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং পরম জ্ঞান লাভ করিলেই অপার নিত্য শান্তির অধিকারী হয়েন। যিনি শ্রদ্ধাবান, বিশ্বাসী, যিনি তৎপর অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তিপরায়ণ তিনি এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েন।

গীতায় নিম্ন লিখিত কয়েকটি শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞ আদর্শ-জ্ঞানীর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।

হে পার্থ ! যিনি মনোগত বাসনা সকল ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট, তিনি আদর্শ জ্ঞানী তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।

যিনি দুঃখে অবিচলিত, সুখে স্পৃহাশূন্য, যিনি বাসনা ভয় এবং ক্রোধ বর্জ্জিত, তিনি স্থিরবুদ্ধি মুনি বলিয়া কথিত হয়েন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

যখন সাধক কূর্ম্মের অঙ্গের ন্যায় আপনার মধ্যে আপন সকল বাসনা সংহরণ করিয়া লয়েন, ইন্দ্রিয় প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলও সংহরণ করেন, তখনি তাঁহার প্রজ্ঞা লাভ হয়।

প্রিয়ম্বদা।

১১ উঃ। গীতোপদিষ্ট জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, আত্মায় পরমাত্মাজ্ঞান, এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান। শুধু শুষ্ক শাস্ত্রসম্মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নহে, কিন্তু ভক্তিরসপূর্ণ আনন্দময় জ্ঞান, যাহা সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হইলে জীবব্রহ্মে অভেদভাব হয়, সর্ব্বভূতে তাঁহাকে ও তাঁহাতে সর্ব্বভূত উপলব্ধি হয়, এবং অবশেষে ব্রহ্মে যোগজনিত ভূমানন্দ লাভ হয়।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"।

যিনি শ্রদ্ধাভক্তিপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, এবং ঈশ্বর মাত্র যাঁহার ধ্যান জ্ঞান, এই প্রকার সাধকই যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। গীতার আদর্শ জ্ঞানী বা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ এই ঃ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতঃ প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

অর্থাৎ যিনি সকল কামনা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, যিনি দুঃখে কাতর এবং সুখে আসক্ত নহেন, যাঁহার অনুরাগ রাগ বা ভয় নাই, যিনি মায়া মমতা শূন্য এবং সাংসারিক লাভ ক্ষতিতে যাঁহার হর্ষও নাই বিষাদও নাই, যিনি কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংহরণ করেন বা সংযতভাবে ইন্দ্রিয়কার্য্য করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

ইন্দিরা।

(ক্রমশঃ)

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)

দণ্ড ও অপরাধের মধ্যে ঠিক্ অনুপাতটি কি ? এই প্রশ্নের একটা সম্পূর্ণ মীমাংসা হইতে পারে না। ইহার মধ্যে

যেটুকু ধ্রুব ও অপরিবর্ত্তনীয় তাহা এই—যাহা ন্যায়-বিরুদ্ধ তাহাই দণ্ডনীয়, এবং অন্যায় যতই গুরুতর হইবে, তাহার দণ্ডও সেই পরিমাণে কঠোর হওয়া উচিত। কিন্তু দণ্ডবিধানের অধিকারের পাশাপাশি, অপরাধ-সংশোধনের একটা কর্ত্তব্যও আছে। অপরাধীকে দোষ-সংশোধনের একটা অবসর দেওয়া উচিত। মানুষ যতই অপরাধী হউক না, তবু সে মানুষ; মানুষ ত একটা জিনিস নহে যে তাহার দ্বারা কিছুমাত্র আমাদের হানি হইলেই আমরা তাহাকে সরাইয়া ফেলিব। আমাদের মাথায় একটা পাথর পড়িলে আমরা তাহাকে দূরে নিঃক্ষেপ করি, পাছে উহা আর কাহাকে আঘাত করে। মনুষ্য বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব, মানুষ ভাল মন্দ বুঝিতে পারে, কোন-না-কোন দিন তার অনুতাপ হইতে পারে, আবার সুপথে ফিরিয়া আসিতে পারে। এই সকল তত্ত্ব হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন কতকগুলি সদনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, যাহাতে করিয়া ঐ দুই শতাব্দী বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। সংশোধনালয়ের কথা উল্লেখ করিতে গেলে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রারম্ভকাল মনে পড়িয়া যায়। তখন দণ্ড প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ছিল। অপরাধীরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, অনুতাপ করিয়া আবার সাধুর শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। এই স্থলে, উদার মৈত্রীর হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এই মৈত্রীতত্ত্ব ন্যায়-তত্ত্ব হইতে অনেকটা ভিন্ন। দণ্ডবিধান করা ন্যায়ের কাজ, দোষসংশোধন করা মৈত্রীর কাজ। কিরূপ পরিমাণে এই দুই তত্ত্বকে সম্মিলিত করা বিধেয়?—ইহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন—অতীব সূক্ষ্মবিচার-সাপেক্ষ। তবে, এইটুকু নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে, ঐ দুই তত্ত্বের মধ্যে ন্যায়েরই প্রাধান্য থাকা উচিত। অপরাধীকে সংশোধন করিবার সময় অনেক সময় রাজসরকার, ধর্ম্মের অধিকারকে দখল করিয়া বসেন। কিন্তু রাজ সরকারের যাহা বিশেষ কাজ, যাহা নিজস্ব কর্ত্তব্য—রাজসরকার যেন তাহা বিস্মৃত না হন।

যাহাকে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি বলে, এখন সেই রাষ্ট্রনীতির প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া একটু থামা যাক্। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বগুলি ছাড়া আর কিছুই ধ্রুব নহে, কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় নহে, বাকি আর সমস্তই আপেক্ষিক। জনসাধারণের কতকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য অধিকারকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করাই রাজশক্তির কাজ—অতএব অধিকার সংরক্ষণের সংস্রবেই রাজ্যতন্ত্রসমূহের মধ্যে যাহা কিছু ধ্রুবত্ব। কিন্তু রাজ্যতন্ত্রসমূহের একটা আপেক্ষিক দিক্‌ও আছে। দেশ কাল পাত্র অনুসারে, আচার ব্যবহার ইতিহাসের বিশেষত্ব অনুসারে, রাজ্যতন্ত্রের রূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্রকে যে পরম নীতি অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন তাহা এই—সমস্ত অবস্থা সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া, সমাজের এরূপ গঠন ও ব্যবস্থাদি বিধান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে, যতটা সম্ভব নিত্য ও ধ্রুবতত্ত্বসমূহের সহিত তাহাদিগের মিল থাকে। সমাজের সেই সকল গঠন, সেই সকল ব্যবস্থাকেও ধ্রুব-নিত্য বলা যাইতে পারে, কেননা উহা কোন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত অনুমান হইতে প্রসূত নহে, পরন্তু উহা অপরিবর্ত্তনীয় মানব-প্রকৃতির উপর, হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ প্রবৃত্তি-সমূহের উপর, ন্যায়ের অবিনশ্বর ধারণার উপর, মহোন্নত মৈত্রীভাবের উপর, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধির উপর, কর্ত্তব্য ও

অধিকার বুদ্ধির উপর, পাপপুণ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রকৃত সমাজ, যাহা মানব-সমাজ—এই সুন্দর নামে অভিহিত হইতে পারে, অর্থাৎ যে সমাজ স্বাধীন ও বুদ্ধিবিশিস্ট জীবের দ্বারা পরিগঠিত,—এই তত্ত্বগুলি ঐরূপ সমাজেরই প্রতিষ্ঠা-ভূমি। যে-কোন রাজ্যতন্ত্র স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের যোগ্য, যে রাজ্যতন্ত্র ইহা জানে যে, কতকগুলা পশুর সহিত তাহার কারবার নহে পরন্তু বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের সহিত কারবার, যে রাজতন্ত্র মানুষকে সম্মান করে, প্রীতি করে,—উক্ত নীতিসূত্রগুলিই এই প্রকার রাষ্ট্র-তন্ত্রকেই পরিচালিত করিয়া থাকে।

ঈশ্বরের কৃপায়,—ফরাসী সমাজ এবং যে রাজবংশ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ফরাসী সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সেই রাজবংশ বরাবর ঐ অবিনশ্বর আদর্শের আলোক ধরিয়া চলিয়াছে। (Louis le Gros) রাজা 'মোটা'-লুই, পৌর-সাধারণ-সভাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন; রাজা 'রূপবান'ফিলিপ পার্লেমেণ্ট স্থাপন করেন এবং বিচারালয়ে স্বাধীন বিচার ও বিনামূল্যের বিচার প্রবর্ত্তিত করেন; চতুর্থ হেনরী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার সূত্রপাত করেন; ত্রয়োদশ লুই ও চতুর্দ্দশ লুই যেমন একদিকে ফ্রান্সের স্বাভাবিক প্রান্তগুলি ফ্রান্সকে প্রদান করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তেমনি ফরাসী জাতির সকল অংশকে একীভূত করিবার জন্য, সামন্ত-তন্ত্রের অরাজকতার স্থানে, নিয়মিত শাসন-কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, মাতৃভুমির সাধারণ হিতের জন্য, বড় বড় সামন্তদিগের অধিকার ক্রমশ খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে অভিজাতবর্গের শ্রেণীতে আনয়ন করিবার উদ্দেশে অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন ফ্রান্সের রাজাই, দেশে অভিনব অভাব সকল বুঝিতে পারিয়া, তৎকালের সাধারণ উন্নতির সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে, বিশৃঙ্খল ও গঠনহীন প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের স্থানে সভ্যজাতির উপযুক্ত প্রকৃত প্রতি-নিধিশাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, নানা কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া লোমহর্ষণ রাষ্ট্র-বিপ্লবে পরিণত হয়; কিন্তু সেই গৌরবা-ন্বিত চেষ্টা ব্যর্থ হইত না, যদি সে সময়ে রিশ্‌লিউ কিংবা ম্যাজ্যারঁ্যার মত কোন ব্যক্তি রাজ্যের কর্ণধার থাকিত। সর্ব্বশেষে, ষোড়শ লুইর ভ্রাতা স্বতঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া ফ্রান্সকে এমন একটি স্বাধীন ও জনহিতকর শাসনতন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, যাহা আমাদের পিতৃপুরুষদিগের স্বপ্নের বিষয় ছিল, এবং মন্‌টেস্‌কিউ স্বকীয় গ্রন্থে যাহার আভাস দিয়া গিয়াছিলেন। সেই রাজ্যতন্ত্র অংশত কার্য্যে পরিণত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, বর্ত্তমান কালের ও দূর ভবিষ্যৎ কালেরও উপযোগী হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত অধি-কারের ঘোষণা-পত্রে সেই সকল বীজ-সূত্রের উল্লেখ আছে যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। ফ্রান্সের উদ্দেশে ও বিশ্বমানবের উদ্দেশে আমরা যে সকল স্পৃহা ও আশা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি তৎ-সমস্তই সেই অধিকার-পত্রের মধ্যে সন্নি-বিষ্ট আছে।

ধর্ম্মের আদর্শ।

ধর্ম্ম নানাবিধ। ধর্ম্ম বলিতে ভালও বুঝায়, মন্দও বুঝায়। কিন্তু সকল ধর্ম্মেরই একটি মধ্যবিন্দু আছে। সে কি না ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, নিজের বুদ্ধিও বিবেচনা ইহাতে সায় দেয়। ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ন্যায়

যে পৃথিবীতে জয়যুক্ত হয় ইহাতেও সকলের আস্থা আছে, কিন্তু সকলে তাঁহাকে আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার সহিত মনুষ্য যে যোগসূত্রে আবদ্ধ একথা সকলের অন্তরে স্থান পায় না। বস্তুতঃ ইহা ধর্ম্মের ভাব নহে। যতক্ষণ না ঈশ্বরকে সত্যবস্তু জানিয়া তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি, আমাদের চরিত্র ও ব্যবহার তাহার অনুগত করি, ততক্ষণ তাহা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মের ভিতরে ভালও থাকিতে পারে, মন্দও থাকিতে পারে, এবং ভাল মন্দ উভয়ই মিশ্রিত থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিভিন্ন মনুষ্যের বা বিভিন্ন জাতির যে বিভিন্ন ধারণা তাহাই ধর্ম্মের বিভিন্ন মূর্ত্তি। কেহ বা ঈশ্বরকে পরম বন্ধু জানিয়া তাঁহাকে অন্তরের প্রীতি দান করেন, এই খানেই ধর্ম্ম পবিত্রতা ও পরমানন্দের উৎস। কেহ বা ঈশ্বরকে ভয় করে, কেহ বা তাঁহার মঙ্গলভাব অনুভব করিতে পারে না, কেহ বা তাঁহার নামে ভয়ে প্রকম্পিত হয়, এইখানে ধর্ম্ম অশান্তি ও দুর্গতির আলয়।

স্থূলতঃ ধরিতে হইলে ধর্ম্ম দুই প্রকারের, এক প্রেমের ধর্ম্ম, অন্য ভয়ের ধর্ম্ম। ভয়ের ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রেমের ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠতর, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সকল ধর্ম্মেরই ভিতরে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যার যেরূপ ধারণা, তাহার হৃদয়ের ভাব ঈশ্বরের দিকে ঠিক সেইভাবে সমুত্থিত হয়। সেই কারণে কেহ বা ঈশ্বরকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করে, কেহ বা ভয়ে বিচলিত হয়, কেহ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন অর্থাৎ তাহারা উপাসনার সার্থকতা স্বীকার করেনা। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জাতিমাত্রেরই মধ্যে সাধারণ। কোন জাতিই সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে না, যদি তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ভাব নাথাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে নিতান্ত অসভ্য জাতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই। কিন্তু সে মত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। অভিজ্ঞতা প্রভাবে জানা গিয়াছে যে জাতি মাত্রেরই ভিতরে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জাগিয়া রহিয়াছে। সে বিশ্বাস মনুষ্যমাত্রেরই যার পর নাই স্বাভাবিক। মনুষ্য মাত্রেরই ইহা সাধারণ সংস্কার।

ধর্ম্ম ভাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুকাল হইতে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে এতৎ সম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা চলিয়াছে তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। থিওডোর পার্কার বলেন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস মনুষ্যের অন্তর্নিহিতবৃত্তি-প্রসূত, ইহা তাহার মনের চতুর্থ বৃত্তি। যেমন তাহার জ্ঞান আছে, হিতাহিত বিবেচনা আছে, প্রেম আছে, তেমনি তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। ইহা কোন কষ্টসাধ্য সিদ্ধান্ত বা মীমাংসার ফল নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ। সে যাহা কিছু চারিদিকে নিরীক্ষণ করে তৎসমস্তই তাহাকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বোধ দেয়, যাহা কিছু দেখে বুঝে সকলই স্পষ্ট, তাহার ভিতরে নিয়ম রহিয়াছে, শৃঙ্খলা রহিয়াছে, সকলই শাসনাধীন কোথাও বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলতা নাই, সকলের ভিতরে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় রহিয়াছে; সহজেই বুঝিতে পারে যে অবশ্যই এক জন নিয়ন্তা রহিয়াছেন—যন্ত্রী রহিয়াছেন—উদ্দেশ্যবান পুরুষ রহিয়াছেন, যাঁহার এই সমুদয় সৃষ্টি, যিনি আমা অপেক্ষা জ্ঞানে শক্তিতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। এই যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধবোধ ইহা মনুষ্যের নিত্য ও স্বাভাবিক। সে যতই দেখে, অপরিবর্ত্তনীয় শৃঙ্খলা দেখিতে পায়, একই

নিয়ম একই প্রণালী অবিরাম বাহ্যজগতে কার্য্য করিতেছে। আরও বুঝে, যাঁহার এই-সৃষ্টি, যাঁর এই শৃঙ্খলা, তাঁহার মৃত্যু নাই; বৃক্ষের ন্যায় লতার ন্যায় পশুপক্ষীর ন্যায় তাঁহার বিনাশ নাই, পরিবর্ত্তন নাই। তিনি অক্লান্ত ও অশ্রান্ত ভাবে একই নিয়মে একই ভাবে এই বিশ্বযন্ত্র চালাইতেছেন। একাকীই তিনি রহিয়াছেন, কেহ তাঁহার সহকারী নাই, কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তন থাকিলে জগতে এই অপরিবর্ত্তনীয়তা সম্ভব হইত না, অব্যভিচারী নিয়ম থাকিতে পারিত না।

মনুষ্য ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ ও পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে থাকে যে ঈশ্বর তাহার অন্তরের ভাব জানিতেছেন, সে যাহা কিছু চিন্তা করে অন্তরে যাহা কিছু গোপনে পোষণ করে ঈশ্বর সকলই দেখিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার কোন উপায় নাই। সে তাহার প্রতিবেশীকে বঞ্চনা করিতে সাহস করে না, ভয় হয় ঈশ্বরের দৃষ্টি সে এড়াইতে পারিবে না। তাহার হিতাহিত জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাকে আদেশ করে—বলিয়া দিতে থাকে যে গর্হিত কর্ম্ম আচরণ করিও না, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিষ্পাপ থাকিতে চেষ্টা কর। এই ভাবেই ধর্ম্মের বীজ ন্যায়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। তাহার জ্ঞান ও নৈতিক-প্রকৃতি ধর্ম্মভাবের সহায় হয়। সে বুঝে যে ঈশ্বর ধর্ম্মের সহায়, ন্যায়কার্য্যানুষ্ঠানে তাহার উৎসাহ দাতা।

সে ক্রমে দেখে যে ঈশ্বর সকলের মধ্যে আনন্দ বিধান করিতেছেন, সকলের সকল অভাব বিমোচন করিতেছেন, তিনি সকলের বন্ধু, সকলের অন্ন-দাতা, সকলের পিতা মাতা ও আশ্রয়। এইরূপে ক্রমে অন্তরের ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার বিকাশ। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সে দেখে যে ঝটিকা ও ঘূর্ণাবর্ত্ত আসিয়া মনুষ্যকে নির্ম্মূল করিতেছে, দুর্ভিক্ষ জনসমাজকে নিপীড়িত করিতেছে, ব্যাধি ও মৃত্যু আসিয়া সকলকে গ্রাস করিতেছে, তখন সে আপনার ক্ষুদ্র-জ্ঞানে ঈশ্বরের করুণার সহিত তাঁহার রুদ্র-ভাবের সমন্বয় করিয়া উঠিতে পারে না; মনে করে যে অকল্যাণের বুঝি স্বতন্ত্র দেবতা আছেন, যিনি মনুষ্যের সুখ-শান্তির প্রতি বিমুখ; জীব জন্তুকে বিপদে নিক্ষেপ করাই যাঁর কার্য্য, যিনি কেবলই বিপদ প্রেরণ করেন। তখন মনুষ্য ভয়ে এই শেষোক্ত দেবতার তৃপ্তিসাধনের জন্য অগ্রসর হয়, বিভিন্ন রূপ বলি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে যায়। ক্রমে সে দয়াল ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, বিপদ প্রেরণকারী উপদেবতার শরণাপন্ন হয়। প্রেমময় ঈশ্বর যে তাহার নিকট বলি চাহেন না, তিনি উৎকোচের প্রার্থী নহেন, তিনি যে বন্ধু তিনি যে পিতা, একথা সে বিস্মৃত হইতে থাকে।

ধর্ম্মের ভিতরে এই ভাবে এই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। উভয় ধর্ম্মই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, এই দুইই ধর্ম্ম বটে, কিন্তু একটি সৎ, আর একটি অসৎ বা ভ্রান্ত, একটি প্রেমের ধর্ম্ম, অন্যটি ভয়ের ধর্ম্ম।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রেমের ধর্ম্ম মনুষ্যের অন্তরকে ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে, ভয়ের ধর্ম্ম শাস্তির ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মের দিকে লোককে আকর্ষণ করে; পাপের জন্য তত নহে শাস্তির ভয়ে লোকে ধর্ম্মের অনুগত হইতে যায়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম শাস্তি ও পুরস্কার নিরপেক্ষ; দুঃখই হউক আর সুখই হউক সে দিকে না তাকাইয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক ধর্ম্মকে চায় ঈশ্বরকে চায়। ভয়ের ধর্ম্ম মানুষকে পাপানুষ্ঠানে ভাবী শাস্তির ভয় দেখায়, পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে পুরস্কার

লাভের আশা প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহা সমুন্নত ধর্ম্ম নহে। ভয়ে ধর্ম্মের বাধ্যতা-স্বীকার প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। ভয়ের ধর্ম্ম মানবচরিত্রকে তাহার নৈতিক-ভাবকে দুর্ব্বল করিয়া তোলে।

আমরা প্রেমের ধর্ম্ম চাই—ভয়ের ধর্ম্ম চাই না। প্রেমের ধর্ম্মেই মুক্তি। হায় কবে প্রেমের ধর্ম্ম চারিদিকে জগিয়া উঠিবে, ভ্রান্ত-ধর্ম্মের ভ্রান্ত-সংস্কার এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে।*

বিশ্বযোগ।

শুন শুন বিশ্ববাসী গূঢ় সমাচার
অখণ্ড চেতনা সূত্রে গাঁথা এ সংসার।
অখণ্ড মঙ্গলে তার বিচিত্র বিধান।
অখণ্ড আনন্দে তার পূর্ণ পরিণাম।
অখণ্ড যোগেতে আছে যুক্ত সমুদয়।
অখণ্ড কালেতে সবে ভাসমান রয়।
অখণ্ড অভেদ ঐক্য লাভ করিবারে,
ধাইছে সকল গতি বিচিত্র আকারে!
বহু গতি হবে যবে একেতে মিলন
বিশ্বের পরম রূপ হবে দরশন।
সে পরম রূপ জ্যোতি হইলে বিকাশ,
অখণ্ড যোগের লীলা হইবে প্রকাশ।
বিশ্ব মাঝে বিশ্বমণি হেরিয়া তখন
সার্থক হইবে জন্ম সফল জীবন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

আত্মত্যাগ।

(Resignation কবিতার বঙ্গানুবাদ)

সতত অহিত, সহ অকাতরে,
ক'রনা বিলাপ মূঢ়ের প্রায়;
কি যে অভিপ্রায় বিধির অন্তরে,
মানব কেমনে বুঝিবে তা'য়।
সময়ের দ্রুত প্রবাহে চলিছে
ভাসিয়া সকলি,—কি ক্ষতি কা'র?
আশার আলোক যদিও ছুটিছে,
হৃদয়ে তোমার আভাস তা'র।
কি হেতু প্রাবিছ ক্ষোভে আঁখিনীর,
তাড়না গঞ্জনা নিন্দিছ কেন?
পার্থিব বিপদে সঁপহ শরীর,
বিধির বিধানে আসিছে জেন।
সর্ব্বশক্তিমান জানেন সকল;
মোহবশে ক্ষোভ ক'রনা, কর'না;
সুখী হইবে পুনঃ দুখী জীবদল;
ভাবিয়া অন্তরে লভহ সান্ত্বনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ।

নানা কথা।

দেবালয়।—গত ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেবালয়-গৃহে "ব্রহ্মদর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি মহর্ষির আত্মজীবনী হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর ও ভাব-পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিলেন। তৎপরে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবালয় স্থাপ-নাবধি ইহার সহিত বিশেষ সহানুভূতি করিয়া আসিতেছেন।

স্মৃতি-সভা। বিগত ১০ আশ্বিন অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে মহাত্মা রাজারামমোহন রায়ের সাম্বৎসরিক স্মৃতি-সভা মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্ব ও কবি-বর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা হইবে, এই সংবাদে সভা বসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই সিটি-কালেজের তৃতীয়তলস্থ বৃহৎ হল লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যথা সময়ে এই দুই মহাত্মা গৃহে প্রবেশ করিলে জনস্রোত অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন নিরুপায় হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং নিম্নের প্রাঙ্গনে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হইল। সেখানে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়া জনতা ও কোলাহল নিরস্ত করিতে লাগিলেন। তৃতীয়তলে প্রথমে একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত হইবার পর পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সংক্ষেপে প্রার্থনা করেন। পরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় রাজা রামমোহনকে সকল প্রকার স্বদেশোন্নতির মূল কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা

* Rev Charles Voysey সাহেবের বিগত ২৪এ এপ্রিলের উপদেশের সারাংশ।

করেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে নিজ প্রতিনিধি রূপে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া চলিয়া যান। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে একাদিক্রমে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন সুললিত ভাষায় রাজার বহুবিধ দেশোন্নতিকর কার্য্যের উল্লেখ করেন। পরে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ অশীতিবর্ষীয় স্থবির শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কম্পিত-পদে দণ্ডায়মান হন। তিনি রাজা রামমোহন রায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে কিছু কিছু পুরাতন কাহিনী আলোচনা করিয়া উপবেশন করেন। অতঃপর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বাবু দণ্ডায়মান হন। সমবেত সকলে করতালি ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সকলকে পুলকিত করিলেন। তাঁহার প্রতিভাময়ী বক্তৃতার মর্ম্ম এই—অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বীয় আদর্শকে এই বাঙ্গালীর গৃহজাত রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া বিশ্ব-মানমানবের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। রামমোহনের ভিতর দিয়া আমরা সেই আদর্শকেই গ্রহণ করিব। যাঁহাদের মৃত্যু আছে, তাঁহাদেরই জন্য স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাঁহারা অমর তাঁহারা আদর্শ রূপেই জগতে প্রকাশিত থাকেন, তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্নের প্রয়োজন হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন, হিন্দুর হিন্দুত্ব সেই স্থানেই বর্ত্তমান, যেখানে মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দু আপনার বক্ষে স্থান দিতে পারে, আপনার করিয়া লইতে পারে। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

আমরা দেখিতেছি যে উত্তরোত্তর রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সাধারণের যেরূপ অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাঁহার বাৎসরিক সভায় যেরূপ লোক সংখ্যা অধিকতর হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে কোন সুবৃহৎ স্থানে ইহার অধিবেশন না করিলে আর চলিবে না। এখানে ইহাও উল্লেখ যোগ্য গত মাসে অনেকস্থানে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১৮৩২ শকের বৈশাখ হইতে ১৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র রায়	দেহড়দা	১৩৵০
,, ,, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২৲
,, ,, লালবিহারী বসাক	,,	৩৲
,, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর,	কাশিমবাজার	১২।৵০
,, বাবু বিনোদবিহারী সেন	বর্দ্ধমান	২৷৷০
শ্রীযুক্ত সম্পাদক হরিসেনা-মণ্ডলী	কলিকাতা	৩৲
,, বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়	কুচবিহার	১৷৷৵০
,, রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর	খণ্ডুরই	৯৵০
,, বাবু জগৎচন্দ্র নাথ	কৃষ্ণনগর	৫৲
,, K. Shambhu Sibarao,	Madras.	৵০
,, বাবু অবিনাশচন্দ্র পাল	আলিপুর	১৷৷০
,, ,, নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়	সিলেট	৬৲
,, ,, শিশির কুমার দত্ত	কলিকাতা	১৷৷০
,, মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমান	১২৸০
,, বাবু ভগবতীচরণ মিত্র	কলিকাতা	১৷৷০
,, ,, নিরঞ্জন রায় চৌধুরী	বড়িসা	১৲
,, ,, উমেশ চন্দ্র সুর	কলিকাতা	১৷৷৵০
,, ,, প্রসাদদাস মল্লিক	,,	৩৲
,, ,, গৌরলাল রায়	কাকিনা	৬৷৵০
,, ,, নরনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	সৈদাবাদ	৬৷৵০
,, ,, রাধাকান্ত আইচ	নোয়াখালী	৫৲
,, ,, বিহারিলাল মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
,, ,, সতীশচন্দ্র মল্লিক	,,	৬৲
,, ,, অক্ষয়কুমার ঠাকুর	,,	৩৲
,, ,, লালবিহারী বসাক	,,	৩৲
,, Dr. P. K. Mazumder	Burma	১৲
,, S. K. Lahiri	Calcutta	৩৲
,, বাবু বিনোদবিহারী দত্ত	,,	১৷৷৵০
,, ,, বনমালী চন্দ্র	,,	৩৲
,, রাজা হৃষিকেষ লাহা বাহাদুর	,,	৩৲
,, বাবু গোবিন্দলাল দাস	,,	৩৲
,, ,, মনোহর মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	৯৷৵০
,, ,, সীতানাথ রায়	কলিকাতা	১৲
,, ,, সীতানাথ বক্সী	আড়াসিনী	৩৵০
,, ডাক্তার ডি, এন, চাটার্জ্জি	কলিকাতা	৩৲
,, রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর	দিনাজপুর	১০৵০
,, বাবু কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	৩৲
,, S. P. Sinha	,,	২৩৵০
,, বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	ঘোষনগর	৪৸৵০
,, ,, ললিতমোহন রায়	কলিকাতা	১৷৷০
,, ,, রায় নৃত্যগোপাল বসু বাহাদুর		৬৷৵০
,, রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
,, বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	হরিপুর	৬৷৵০
,, ,, নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
		২০৯৷৷০

সপ্তদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।

৮০৮ সংখ্যা　　　　　　　　　　১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

গীতার প্রশ্ন উত্তর।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

১২ প্রঃ।

জ্ঞান ও কর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক শ্লোকগুলি লিখিয়া দেও।

১২ উঃ।

১। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ,
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

২। অপিচেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।

৩। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।

৪। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

উপরি লিখিত শ্লোক কয়টিতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে—কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কেননা সর্ব্ব কর্ম্ম জ্ঞানে সমাপ্তি লাভ করে, কেননা কর্ম্মশেষে শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানীর আর কোনই কর্ম্ম থাকে না। নরাধম পাপিষ্ঠ ও যদি তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানভেলায় অনায়াসে পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র ইহসংসারে আর কিছুই নাই। তাহা হইতে সাধক স্বয়ং পরমেশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আত্ম-জ্ঞান লাভ করেন। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়, জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে। ইহাতে জ্ঞানেরি শ্রেষ্ঠতা প্রতি-পাদিত হইতেছে।

প্রিয়ম্বদা।

১২ প্রঃ।

জ্ঞান ও কর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক শ্লোকগুলি লিখিয়া দেও।

১২। উঃ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বন্ধ এই যে, জ্ঞান লাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্ম তাহার সাধন বা উপায়। নিষ্কাম কর্ম্মসাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পর তবে জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে। "কর্ম্ম বিনা জ্ঞান খঞ্জ, জ্ঞান বিনা কর্ম্ম অন্ধ"। উভয়েরই সম্পূর্ণতার পক্ষে পরস্পরের প্রয়োজন। তবে কর্ম্ম যে পথের আরম্ভ, জ্ঞান সেই পথের লক্ষ্য বা শেষ। সুতরাং জ্ঞানেরই আসন উচ্চতর। প্রকৃত জ্ঞানী ভগবদ্ভক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না, এবং সকল ভক্তের মধ্যে

জ্ঞানীই ভগবানের প্রিয়তম বলা হইয়াছে। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে প্রতিপন্ন হয় ঃ—

(ক) শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

(খ) অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥

(গ) যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

(ঘ) নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

(ঙ) দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

ইন্দিরা।

১৩ প্রঃ।

গীতার যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

দুঃখহা যোগ কাহার হয়?

দুঃখ সংযোগ বিয়োগ যোগ কি? এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগের তুলনায় গীতার বিশেষত্ব দেখাও।

১৩ উঃ। পতঞ্জলি মতে যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ। ইহা অষ্টাঙ্গ; যম নিয়ম আসন, প্রত্যাহার প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণা সমাধি—ইহার প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ; অপর তিনটি অন্তরঙ্গ যথা ধ্যান ধারণা এবং সমাধি। গীতার মতে যোগ যদিও চিত্তবৃত্তি নিরোধ এবং সংযমসাধ্য তবু তাহা শুধুই চিত্তবৃত্তি নিরোধ নহে—তাহা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত যুক্ত অবস্থা। পতঞ্জলি মতে ঈশ্বর প্রণিধান চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় মাত্র, চরম লক্ষ্য নয়—ঈশ্বর না হইলেও পতঞ্জলি অনুমোদিত যোগ সাধিত হইতে পারে কিন্তু গীতায় ঈশ্বর ভিন্ন যোগ হয় না—যেখানেই যোগের উল্লেখ সেইখানেই ঈশ্বর ব্যাখ্যাত। চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া কি হইল যদি তাহা দ্বারা চরম এবং পরম আর কিছু লাভ করিতে না পারি? সাংখ্য মতে কৈবল্য স্বরূপে অবস্থান, প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভিন্নতা উপলব্ধি এবং পুরুষ যখন শুদ্ধ, বুদ্ধ, একক, কেবল, তখনই জীব যোগসিদ্ধ হয়েন। এই যোগ দুঃখ নিবৃত্তি কারক অভাবাত্মক, কিন্তু গীতার যোগ ভাবাত্মক অতীন্দ্রিয় পরম সুখ।

সাধক যখন সমদর্শী হয়েন তখনই তিনি যোগ যুক্ত—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

গীতায় যোগের অর্থ সর্ব্বত্র সমান নয়, উপরি লিখিত শ্লোকে সাম্যকে যোগ বলা হইতেছে আবার বলা হইয়াছে

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং—

অর্থাৎ ইহলোকে বুদ্ধিযুক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সুকৃতি দুষ্কৃতি উভয়ই ত্যাগ করেন, সেই নিমিত্ত যোগ সাধন কর, যোগ কর্ম্মে কুশলতা। এখানে কৌশল অর্থে যখন কৃতকর্ম্ম আমাদিগকে বাঁধিতে পারে না অথচ কর্ম্ম সাধিত হয়, আমরা কর্ম্ম ফলে আবদ্ধ হই না, তখনই তাহা কুশল কর্ম্ম—তাহা যোগ। এমন ভাবে কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে যে কর্ম্মবন্ধের ক্লেশ ভোগ না থাকে—ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করা নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাই নিপুণ কর্ম্ম, তাহাই যোগ। আমাদের মধ্যে সাধারণ বিশ্বাস যে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন করিলেই যোগমার্গে অগ্রসর হইতে পারা যায় কিন্তু গীতার মত ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। গীতা বলেন যাহারা শরীরকে নিষ্ঠুর ভাবে ক্লিষ্ট করে, তাহারা নিকৃষ্ট আসুরিক প্রকৃতি; তাহাদের যোগ লাভ হয় না। গীতার মতে অতিভোজন কিম্বা উপোষণে, অতিনিদ্র কিম্বা বিনিদ্রের যোগ হয় না। কিন্তু যিনি যুক্তাহার বিহার, যিনি

যুক্তনিদ্র এবং জাগ্রত, যিনি যুক্তচেষ্ট, তাঁহারি দুঃখহা যোগ হইয়া থাকে।

গীতার ভাষায় বলিতে গেলে—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ
নচাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচাঽর্জ্জুন।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

প্রিয়ম্বদা।

১৩ প্রঃ।

গীতার যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। দুঃখহা যোগ কাহার হয়? দুঃখসংযোগবিয়োগ যোগ কি? এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগের তুলনা করিয়া গীতার বিশেষত্ব দেখাও।

১৩ উঃ। গীতার যোগ সেশ্বর যোগ। অর্থাৎ ঈশ্বরলাভই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি যে দিক দিয়াই হোক্ সেই এক পরমাত্মায় পহুঁছিতে হইবে। যোগ কথাটা গীতায় নানাপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত, কখনো "সমত্ব" কখনো "কর্ম্ম-কুশলতা" কে যোগ বলা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য সেই এক পরমাত্মায় জীবাত্মা যুক্ত করা। এবং উপায়ও এক বলা যাইতে পারে—চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সংযম, বৈরাগ্য, অভ্যাস এবং ঈশ্বর প্রণিধানের ক্রমাভিব্যক্তি। ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। তবে অল্পবুদ্ধি মনুষ্য যদি অন্যান্য নিকৃষ্টতর ক্ষণস্থায়ী উপায় অবলম্বন করে তাহারাও সেই অনুসারে ফললাভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ভক্তি সহকারে যে যেমন ভাবেই তাঁকে চায় ভগবান তাহার আশা পূর্ণ করেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া গীতা তাহাতে ঈশ্বরের প্রাধান্য যোগ করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণতর করিয়াছে, এবং ষড়দর্শন সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের একটা সাধারণ সংস্কার যে যোগাভ্যাসের নিমিত্ত শরীর শোষণ এবং কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক। কিন্তু গীতা তাহার অনুমোদন করেন না। মিতাচারই গীতার আদর্শ—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

এই প্রকার মিতাহারী মিতাচারী ব্যক্তিরই দুঃখহা যোগ হয়। "দুঃখ সংযোগ বিয়োগ যোগ" অর্থাৎ আত্যন্তিক শারীরিক ক্লেশে যে দুঃখ, সেই দুঃখহান যোগ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতা ঘোরতর কায়ক্লেশের পক্ষপাতী নহেন। এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের সহিত গীতার পার্থক্য এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্য-পথের সহিত ঐক্য লক্ষিত হয়। গীতার যে যোগাভ্যাস তাহা সন্ন্যাসী গৃহী সকলেরই সাধ্যায়ত্ত, প্রথমে চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক ঈশ্বরে মনঃ সমাধান করিতে হইবে। যদি তাহা না পার ত ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দ্বারা মন স্থির করিতে হইবে। যদি তাহাও না পার ত তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেই হইবে। যদি তাহাও নিতান্ত না পার ত অনন্যমনা হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের আশা পূর্ণ করিবেন। এই তত্ত্বে বেশ একটি সান্ত্বনা লাভ হয়।

ইন্দিরা।

১৪ প্রঃ।

কর্ম্ম সন্ন্যাস এবং কর্ম্ম যোগ এই দুয়ের মধ্যে গীতার মতে কোন্‌টি প্রধান? দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি শ্লোক দেও।

১৪ উঃ। গীতার মতে কর্ম্ম যোগ এবং কর্ম্ম সন্ন্যাসের মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ কেন না কর্ম্মযোগ ভিন্ন জ্ঞানযোগ লাভ হয় না এবং জ্ঞানযোগ লাভ না হইলে আমাদের আত্মজ্ঞান বিকশিত হয় না, আত্মজ্ঞানী না হইলে আমরা কর্ম্ম সন্ন্যা-

সের অধিকার প্রাপ্ত হই না। যে তত্ত্বজ্ঞান, পরাবিদ্যা, লাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতা তাহা লাভ করিতে আমাদিগকে কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়—কর্ম্মই আমাদের হৃদ্‌গ্রন্থি সকল শিথিল করিয়া দেয়, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ করিতে সহায় হয় এবং অবশেষে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত পরম পুরুষের সহিত যোগযুক্ত করে। আত্মজ্ঞানী ভিন্ন অপর কেহ নৈষ্কর্ম্মের অধিকারী নহেন, সাধারণ ব্যক্তির কর্ম্মসন্যাস তামসিক জড়তা মাত্র।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়,
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নিঃ নচাক্রিয়ঃ॥

প্রিয়ম্বদা।

১৪ প্রঃ।

কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ—এই দুয়ের মধ্যে গীতার মতে কোনটি প্রধান? দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি শ্লোক দেও।

১৪ উঃ। কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। যে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করে, তাহার যে সদ্গতি হয়, নিরগ্নি নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির তাহা হয় না। কর্ম্ম বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। কি কি কারণে ও কিরূপে কর্ম্ম করা উচিত এবং কে নৈষ্কর্ম্মের অধিকারী তাহা পূর্ব্বেই কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। যজ্ঞ দান প্রভৃতি কর্ম্ম গীতা অনুমোদন করেন, যদি অহঙ্কার প্রসূত না হইয়া দেবতার প্রীতি-উদ্দেশে করা হয়। বরং না করিলে দোষ। যে ব্যক্তি অন্নাদি দেবোদ্দেশে উৎসর্গ না করিয়া কেবল মাত্র উদর পূরণার্থে খায়, তাহাকে 'স্তেন' বা চোর বলা লইয়াছে।

ইন্দিরা।

১৫ প্রঃ।

গীতার আদর্শ যোগীর যে বর্ণনা আছে তাহার মধ্য হইতে ৩টি শ্লোক বাছিয়া বল।

১৫ উঃ। গীতার মতে তিনিই আদর্শ যোগী যিনি ঃ—

১। বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।
২। ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতংমনঃ
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ
৩। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
৪। যো হন্তঃ সুখোঽন্তরারাম স্তথান্ত র্জ্যোতিরেব যঃ
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥

প্রিয়ম্বদা।

প্রঃ ১৫।

১৫। গীতার আদর্শযোগীর যে বর্ণনা আছে তাহার মধ্য হইতে ৩টি শ্লোক বাছিয়া বল।

উঃ।

(ক) যো হন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
(খ) ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥
(গ) যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

ইন্দিরা।

১৬ প্রঃ।

যোগীশ্রেষ্ঠ কাহাকে বলা যায়?
লোক সম্বন্ধে—ঈশ্বর সম্বন্ধে (শ্লোক ও অর্থ সহিত)

১৬ উঃ। লোক সম্বন্ধে তিনিই যোগীশ্রেষ্ঠ যিনি

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।

বিদ্যা শাস্ত্রশিক্ষা বিনয়ঃ সুশীলভাবঃ, তৎসম্পন্নে যুক্তে ব্রাহ্মণে গবি ধেনুজাতীয়ে, হস্তিনি মাতঙ্গে শুনি কুক্কুরে শ্বপাকে চণ্ডালে চ পণ্ডিতাঃ বুধাঃ সমদর্শিনঃ সমদৃষ্টিশীলাঃ তেষাং দৃষ্টৌ পরমাত্মনঃ অংশত্বাৎ সর্ব্বএব সমানঃ।

পণ্ডিত সকল বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ধেনু হস্তি কুকুর এবং চণ্ডালে সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি। সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে পর্ম-

মাত্মা বর্ত্তমান এই অভেদ বুদ্ধিতে তাঁহারা সকলকেই সমান মনে করেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ যোগী তিনি, যিনি

যোগীনামপিসর্ব্বেষাম্ মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ততমো মতঃ।

মদ্গতেনান্তরাত্মনা একান্ত ভক্তিপরায়ণ-হৃদয়েন শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসনম্রচিত্তঃ যঃ মাং ভজতে উপাসতে সর্ব্বেষাম্ যোগীনামপি সাধকানামপি সঃ যুক্ততমঃ যোগীশ্রেষ্ঠ ইতি মে মম মতঃ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

যিনি ভক্তিপরায়ণ আমাতে একান্ত সমর্পিতচিত্ত, যিনি শ্রদ্ধার সহিত আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন তিনি আমার মতে যোগীশ্রেষ্ঠ।

প্রিয়ম্বদা।

১৬ প্রঃ।

যোগী শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলা যায়?

লোক সম্বন্ধে—ঈশ্বর সম্বন্ধে—(শ্লোক অর্থ সহিত)

উঃ।

(ক) আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতিযোঽর্জ্জুন
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

যে আত্মবৎ বা নিজের সহিত তুলনা করিয়া অপর সকলের সুখদুঃখ দেখে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী। (লোক সম্বন্ধে)

(খ) যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

আমাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া যে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক আমার ভজনা করে, যোগীদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যোগী। (ঈশ্বর সম্বন্ধে)

ইন্দিরা।

১৭ প্রঃ।

যোগে শ্রদ্ধাবান অথচ যোগসিদ্ধি লাভে অক্ষম, এইরূপ যোগভ্রষ্টের গতি কি হয়?

১৭ উঃ। যিনি শ্রদ্ধাবান অথচ যোগ-সিদ্ধ হইতে পারেন নাই—তাঁহার বিনাশ নাই, তিনি ছিন্ন মেঘের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয়েন না, পরজন্মে তিনি পুণ্যবলে সাধু শ্রীসম্পন্ন ভক্তিমানের গৃহে জন্ম লাভ করেন। মৃত্যু হইলে বহুকাল পুণ্যলোকে বসতি করেন।

প্রিয়ম্বদা।

১৭ প্রঃ।

যোগে শ্রদ্ধাবান অথচ যোগসিদ্ধি লাভে অক্ষম, এইরূপ যোগভ্রষ্টের গতি কি হয়?

১৭ উঃ। যে "কল্যাণকৃৎ" তাহার কখনো দুর্গতি হয় না। যে ভক্তিশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যোগাভ্যাস আরম্ভ করিয়া দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সিদ্ধিলাভ করিতে না পারে, সে পরজন্মে শ্রীমন্ত পুন্যবান ব্যক্তির গৃহে জন্মলাভ করে; কিম্বা যোগীর ঘরে স্থান পায়, যদিও সে গতি দুর্লভতর। পূর্ব্বজন্মে সে যতটাই যোগসাধনে কৃত-কার্য্য হইয়া থাকুক্ না কেন, পরজন্মে সেই অভ্যাসবশতঃ আরও বেশিদূর সাধনে সক্ষম হয়, এবং এই প্রকারে জন্ম হইতে জন্মান্তরে ক্রমশঃই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়, ছিন্নাভ্রের ন্যায় ভ্রষ্ট হয় না।

ইন্দিরা।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল

ষষ্ঠ উপদেশ।

জগতের নৈতিক শৃঙ্খলা ইতিপূর্ব্বে নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমরা এখন নৈতিক সত্যকে পাইয়াছি, মঙ্গলের ধারণাকে পাইয়াছি, এবং মঙ্গলের ধারণার সহিত যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা সংযুক্ত আছে তাহাও পাইয়াছি। সার-সত্যে পৌঁছিয়াও যে তত্ত্ব আমাদিগকে থামিতে দেয় নাই, যে তত্ত্ব বাস্তব সত্তার মধ্যেও পরম প্রজ্ঞার অনুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিয়াছে, এখানে সেই একই তত্ত্ব, সেই

পরম পুরুষের সহিত মঙ্গলভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে,—যিনি মঙ্গলভাবের প্রথম ও শেষ পত্তনভূমি।

অন্যান্য সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্যের ন্যায়, নৈতিক সত্যও সত্তা নিরপেক্ষ, কেবল একটা সূক্ষ্মভাবের অবস্থায় থাকিতে পারে না। আমাদের অন্তরে এই নৈতিক সত্য কেবল ধারণার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু এমন কোন পুরুষ আছেন—এই নৈতিক সত্য যাঁর শুধু ধারণার বিষয় নহে, পরন্তু নৈতিক সত্যই যাঁহার স্বরূপ।

যেমন, সমস্ত সত্যের সহিত একটি অখণ্ড মূল-সত্যের যোগ আছে, সমস্ত সৌন্দর্য্যের সহিত, একটি অখণ্ড মূল সৌন্দর্য্যের যোগ আছে, সেইরূপ সমস্ত নৈতিক তত্ত্বের সহিত একটি অখণ্ড মূলতত্ত্বের যোগ আছে—সেই মূলতত্ত্বটি মঙ্গল। এইরূপে আমরা ক্রমশ এমন একটি মঙ্গলের ধারণায় উত্থিত হই, যে মঙ্গল স্বরূপত মঙ্গল, যে মঙ্গল পরিপূর্ণ মঙ্গল, যাহা সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য হইতে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ এবং যাহার দ্বারা বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য সকল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অতএব যথাযথরূপে বলিতে গেলে, এই পূর্ণ মঙ্গল—মঙ্গলস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ ছাড়া আর কাহার উপাধি হইতে পারে?

অনেকগুলি পূর্ণ পুরুষ থাকা কি সম্ভব? যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি পূর্ণ সুন্দর, তিনিই কি পূর্ণ মঙ্গল নহেন? পূর্ণতার ধারণার সহিত, পূর্ণ অখণ্ডতা, পূর্ণ একতার ধারণা সংজড়িত। সত্য সুন্দর ও মঙ্গল—এই তিন তত্ত্ব স্বরূপত পৃথক্ নহে। ইহারা আসলে একই—তিন প্রধান উপাধিরূপে ইহারা পৃথক্ রূপে আলোচিত হইয়া থাকে মাত্র। আমাদের মনই এইরূপ ভেদ স্থাপন করে; কেন না, ভেদ না করিয়া, বিভাগ না করিয়া, আমাদের মন কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই তিন তত্ত্ব যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, সেখানে এই তত্ত্বগুলি এক ও অখণ্ড; এবং সেই পুরুষ যিনি "তিনে এক, একে তিন," যিনি একাধারে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ সুন্দর ও পূর্ণ মঙ্গল—তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নহেন।

সৃষ্ট জীবদিগের যে সকল সদ্‌গুণ বা উপাধি আছে, তাহার মধ্যে এমন কোন বাস্তব সদ্‌গুণ বা উপাধি আছে কি না—যাহা স্রষ্টার মধ্যে নাই? কারণ ছাড়া কার্য্য আর কোথা হইতে স্বকীয় বাস্তবতা ও সত্তা প্রাপ্ত হইতে পারে? কার্য্যের যে বাস্তবতা, কার্য্যের যে সত্তা, সে তাহার কারণ হইতেই প্রসূত হইয়া থাকে। অন্তত, কার্য্যের যাহা কিছু বাস্তবতা, তাহা তাহার কারণের মধ্যেই অবস্থিত। কার্য্যের যে বিশেষত্ব—সে বিশেষত্ব, কার্য্যের নিকৃষ্টতাতে, কার্য্যের হীনতাতে, কার্য্যের অপূর্ণতাতে। কেবল উহার দ্বারাই কার্য্যের পরাধীনতা, কার্য্যের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। কার্য্যের মধ্যে অধীনতার নিদর্শন, অধীনতার নিয়ম বিদ্যমান। অতএব যদিও কার্য্যের অপূর্ণতা হইতে কারণের অপূর্ণতারূপ সিদ্ধান্তে আমরা বৈধরূপে উপনীত হইতে পারি না, কিন্তু আমরা কার্য্যের উৎকৃষ্টতা হইতে, কারণের পূর্ণতারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। নচেৎ কার্য্যের মধ্যে এমন কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস থাকিয়া যায় যাহার কোন কারণ নাই।

আমাদের ঈশ্বরবাদের ইহাই মূলতত্ত্ব। ইহার মধ্যে কোন নূতনত্বও নাই, অতিসূক্ষ্মত্বও নাই। তবে কিনা, এই তত্ত্বটিকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া, এখনও পর্য্যন্ত আলোকে আনা হয় নাই। আমাদের নিকট এই তত্ত্বটি অতীব সারবান্

ও প্রমাণিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটির সাহায্যেই আমরা কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বর কোন ন্যায় শাস্ত্র-সিদ্ধ সত্তা নহেন, ন্যায় শাস্ত্রের অনুমান-যুক্তির দ্বারা অথবা বীজগণিতের সমীকরণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার স্বরূপের ব্যাখ্যা করা যায় না। যখন কেহ, জ্যামিতিবেত্তা ও নৈয়ায়িকের পদ্ধতি-অনুসারে, কোন একটি প্রধান উপাধি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরের অন্যান্য উপাধি নির্ণয় করেন, আমি জিজ্ঞাসা করি—তখন তিনি কতকগুলি বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্মভাবের কথা ছাড়া আর কিছু কি প্রাপ্ত হন? বাস্তব ও জীবন্ত ঈশ্বরে উপনীত হইতে হইলে, এই প্রকার নিষ্ফল তর্ক-বিদ্যার জল্পনা-জাল হইতে বাহির হওয়া আবশ্যক।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের যে প্রথম ধারণা, অর্থাৎ অসীম-পুরুষের ধারণা, এই ধারণাটিও আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি সত্তা ও সসীম সত্তা—এই যে নিজের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, ইহা হইতে আমরা অব্যবহিত রূপে এমন একটি সত্তার ধারণায় উপনীত হই, যে সত্তা আমাদের সত্তার মূলতত্ত্ব, যে সত্তা অসীম। এই সারবান্ অথচ সরল যুক্তি-প্রণালীটি আসলে দেকার্টের যুক্তি-প্রণালী;—তিনি যে যুক্তির পথটি খুলিয়া দিয়াছেন, সেই পথটি আমরা অনুসরণ করিব। তিনি একস্থানে আসিয়া শীঘ্র থামিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা থামিব না। আমরা যেমন আমাদের সসীম সত্তার কারণ রূপে একটি অসীম সত্তাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ আমাদের উৎকৃষ্ট চিত্তবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াও আমরা একটি অসীম কারণে গিয়া উপনীত হই। অতএব ঈশ্বর আমাদের নিকট শুধু অসীম নহেন, তিনি এমন কোন অনির্দ্দেশ্য সূক্ষ্মভাবমাত্র-সার ঈশ্বর নহেন যাঁহাকে আমাদের হৃদয় ও মন গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু তিনি সুনির্দ্দিষ্ট বাস্তব ঈশ্বর, আমাদের ন্যায় তিনি নৈতিক পুরুষ।

অতএব, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্য ও সুন্দরের ন্যায় তিনি মঙ্গলেরও মূল কারণ ও চরম ভিত্তি। আমরা যেরূপ নৈতিক পুরুষ, সেইরূপ নৈতিক পুরুষের তিনি মূল-আদর্শ। আমাদের এমন কোন উৎকৃষ্ট গুণ নাই যাহার মূল-প্রস্রবণ তিনি নহেন, এবং যাহা অনন্ত পরিমাণে তাঁহাতে নাই।

যেমন মনে কর,—মানুষের স্বাধীনতা আছে,আর ঈশ্বরের স্বাধীনতা নাই—ইহা কি কখন হইতে পারে? ইহা কেহই অস্বীকার করে না যে, যিনি সকল পদার্থের কারণ, যিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি কাহারও অধীন নহেন। কিন্তু Spinoza, ঈশ্বরকে সমস্ত বাহ্য বাধার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া একটা সূক্ষ্ম আভ্যন্তরিক অবশ্যম্ভাবিতার বন্ধনে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছেন,—যে আভ্যন্তরিক অবশ্যম্ভাবিতাকে তিনি সত্তার পূর্ণতা বলিয়া মনে করেন। অবশ্য সে সত্তা, পুরুষ-সত্তা নহে। কিন্তু স্বাধীনতাই পুরুষের অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার মুখ্য ধর্ম্ম। অতএব ঈশ্বরের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর মানুষ হইতেও নিকৃষ্ট। ইহা কি অত্যন্ত অদ্ভুত নহে,—সৃষ্ট জীব যে আমরা, আমরা আমাদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারি, আর যিনি আমাদের স্রষ্টা, তিনি একটা অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি-নিয়মের অধীন; অবশ্য সেই অভিব্যক্তির কারণ তাঁহার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে,কিন্তু সেই কারণটি একপ্রকার বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম শক্তি,

যান্ত্রিক শক্তি, দার্শনিক শক্তি; এই যান্ত্রিক কারণটি আমাদের অনুভূত স্বাধীন পুরুষগত কারণ অপেক্ষা অতীব নিকৃষ্ট। অতএব ঈশ্বর স্বাধীন, কেননা আমরা স্বাধীন; কিন্তু আমরা যেরূপ স্বাধীন, তিনি সেরূপ স্বাধীন নহেন; কেননা ঈশ্বর সমস্তই আমাদের মতন, অথচ তিনি আমাদের মতন কিছুই নহেন। আমাদের মত সমস্ত সদ্‌গুণই তাঁহার আছে, কিন্তু সেই সব সদ্‌গুণ আমাদিগের অপেক্ষা অনন্তগুণে উন্নত। তাঁহার অসীম স্বাধীনতার সহিত, অসীম জ্ঞান সংযুক্ত। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া যেরূপ অব্যর্থ, চিন্তা আলোচনার অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত, যাহা কিছু মঙ্গল, তিনি যেরূপ এক কটাক্ষেই উপলব্ধি করেন—সেইরূপ তাঁহার স্বাধীনতার ক্রিয়াও স্বতস্ফূর্ত্ত ও অযত্ন-সম্পাদিত। ("স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়াচ")।

রাজা রামমোহন রায়।*

জগতের যে যে দেশে যতগুলি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্মকালে সেই সেই দেশ অবনতির তমোগর্ভে সুপ্ত ছিল। তাঁহারা সমাজের মিলন সম্পাদনের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানক, কবির, চৈতন্য সকলেই সমাজের ঘোর দুরবস্থার সময় আবির্ভূত হইয়াছেন। এবং তাঁহাদের একটি প্রধান কাজ ছিল, সমাজের ধর্ম্মগত, সংস্কারগত এবং অবস্থাগত বিভেদ বিচ্ছেদকে চূর্ণ করিয়া মানব সম্প্রদায়কে একসমতলে আনয়ন করা। কিন্তু তাহা বলের দ্বারা নহে। হস্ত প্রসারণ করিয়া মন্ত্র পড়িলে, যেমন বিক্ষুব্ধ-সিন্ধু মুহূর্ত্তে মন্ত্রাহত হইয়া নীরব হইয়া যায়; মহাপুরুষগণের প্রেমের মন্ত্রে বিক্ষুব্ধ মানব-সমাজের বিভেদ এবং বিরোধ তেমনিই শান্ত হইয়া গিয়াছে।

জগতের মধ্যে যতগুলি কঠিন কর্ম্ম আছে তন্মধ্যে বোধ হয় মানুষের সহিত অন্য মানুষের আন্তরিক যোগ সংস্থাপন করাটাই কঠিনতম। আমার ও তোমার মধ্যে বিচার, বুদ্ধি, রুচি এবং কামনা যে একটি প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। শুধু তুমি আমি নহি, পৃথিবীর প্রত্যেক লোক যে অন্য লোক হইতে স্বতন্ত্র! মানুষের আকারগত বৈসাদৃশ্যের ন্যায় তাহার মনও যে বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া রচিত! তা যদি না হইত তবে মানুষের কাব্যে সাহিত্যে, সাধনায়, সফলতায় এত বিভিন্নতা, এত অসংখ্য বিচিত্রতার সৃষ্টি হইত না। তাহা হইলে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় বিশ্ব-সৃষ্টি, প্রত্যেক মানব-মনকে একই ছাঁচে ঢালিয়া ছাড়িয়া দিতেন। সেই জন্যই জাতিতে জাতিতে এত যুদ্ধ, এত মারামারি, এত হানাহানি কাটাকাটি! একজাতি, আপনার বিশেষত্ব লইয়া অপর জাতিকে ছাড়াইয়া যাইতে চায়, অন্য জাতি আবার নিজের বিশেষত্ব লইয়া বুক্ ফুলাইয়া দাঁড়ায়—এ যেমন জাতিতে জাতিতে, তেমনি সমাজে এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও সেই ভাব। মহাপুরুষগণ মানুষের মধ্যে এই পার্থক্যের মহাগহ্বরকে পূর্ণ করিয়া যখন মানবের মধ্যে যোগ সংস্থাপন করেন, তখন সমাজে একটি বিরাট্ প্রাণের স্পন্দন তালে তালে বাজিতে থাকে। কিন্তু ইহা সাধন করা বড় কঠিন, অতি দুরূহ। মানব-সমুদ্রের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিকে যে জোয়ারের জল একত্রিত করিতে পারে, সে জলধারা

---

* এই প্রবন্ধটী শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি সভায় পঠিত।

নিয়ম করাটা একটা কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বর যে আপনার ইচ্ছার মধ্যেই জড় ও চেতন রাজ্যে এত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং যে নর-দেবতা আমাদের এই বিভিন্ন মতগুলিকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তিনি ঈশ্বর-দত্ত একটি আশ্চর্য্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কারণ বিচিত্রতার সৃষ্টি করা যাঁর কার্য্য, তাহাকে বিনাশ করাও তাঁর শক্তি ব্যতীত সম্ভব নহে।

কৈ অন্য কাহারো আহ্বানে ত এত লোক একত্রিত হয় নাই! কিন্তু বুদ্ধ যে দিন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া, খৃষ্ট পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া এবং মহম্মদ কোরেশদের মধ্যে দাঁড়াইয়া সমগ্র মানবকে আহ্বান করিয়াছিলেন তখন দরিদ্র হইতে ধনী পর্য্যন্ত সকলেই একত্রিত হইয়াছিলেন, তাই চণ্ডাল এবং মগধরাজ বিম্বিসার একই জনের শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। মানুষকে এক করাটা কি কঠিন কার্য্য! এই সমস্যা এখনও যুদ্ধবিগ্রহ আপনার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, রক্তের স্রোতের দ্বারা মীমাংসা করিতে পারে নাই। ইতিহাস তাহা পূরণ করিতে গিয়া নীরব হইয়া গেছে। দার্শনিক চিন্তার খেই হারাইয়াছেন এবং কবি বিহ্বল হইয়া গেছেন। সভ্য-জগতের বৃহত্তম সমস্যাটিও হইতেছে তাই। ইহাকে পূরণ করার ক্ষমতা মানুষের সহজবুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে। তাই মহাপুরুষগণ সেই মিলন-মন্ত্রপূত দণ্ড হস্তে করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাহা বিধাতৃ দত্ত ক্ষমতা। তপস্বী রাম মোহন ভারতবর্ষের ভূমিতে যে সুরধনীর আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তাহার প্লাবনে পর্ব্বত সমান বাধাবিঘ্ন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাতে মানুষ পরস্পরের মধ্যে একটি পরম যোগ অনুভব করিয়াছে। তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে, ভারতবর্ষ আপনার ত্রিভুজের মধ্যে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে তাহা নহে; সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তাঁহার অবস্থান এবং কারণভূমি। ভারতের বড় দুঃখের দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে নাগপাশ হইতে মুক্তি দিয়াছেন, অন্যথা ভারত আজ সেই পাশের প্রভাবে একেবারে নিস্তেজ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। তখনকার দিনে মরুপথযাত্রী ভারতবাসী, পশ্চিমগগন-প্রতিফলিত যে বারি-মরীচিকা দেখিয়াছিল, প্রথমে রামমোহন রায়ই বলিয়াছিলেন যে তাহা ভুল,—তাহা ভারতবর্ষের নহে। রামমোহন রায়ই প্রথমে পদদলিত মরুপথ খনন করিয়া ভারতবর্ষের প্রাণের, ভারতবর্ষের আপনার সনাতন জলধারাটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ও বাঙ্গলাভাষা প্রচার করিতে সেই জন্যই তিনি প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপকার করিতে রামমোহন রায় যে কেবল আপনার দেশকেই টানিয়াছিলেন তাহা নহে—সমগ্র মানবযাত্রার অনন্ত স্রোতকে তিনি আনন্দে, উল্লাসে অগ্রগামী করিয়া দিয়াছেন—এ কথা তাঁহার জীবনীতে দেখিতে পাই।

তিনি তপস্যা করিয়া মানবজন্ম লইয়াছিলেন তাই তাঁহার উদার আহ্বান যদিও তখন বদ্ধকর্ণ ভারতবাসীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আজ তাহা আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। ভারতবর্ষের লুপ্তপ্রায় ভিত্তিটিকে তিনি প্রথমে খনন করিয়া আবিষ্কার করেন এবং তাহার উপর উচ্চ প্রাসাদ প্রস্তুতের কল্পনা তাঁহার মানসপটে চিরকাল অঙ্কিত ছিল। আজ সেই ভিত্তির উপর যে সকল অট্টালিকাশ্রেণী

উঠিতেছে, তাহারা সকলেই সেই মূল ভিত্তির নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ। আমরা এখনো যদি তাহা বুঝিতে না পারি তবে ঝঞ্ঝাবাত বা ভূমিকম্পের দ্বারা অট্টালিকা কম্পিত হইবে তখন আমরা আর সেই ভিত্তিকারককে স্মরণ এবং পূজা না করিয়া থাকিতে পারিব না।

সহযোগিতা ও পরজীবিতা।

দুই পৃথক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ জীবনরক্ষার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে, এ প্রকার ঘটনা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু ইতর জীবের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যাপারটিকে Symbiosis বলেন। ইহার বাংলা পরিভাষা ঠিক্ কি হওয়া উচিত, জানি না। সহযোগিতাই বলা যাউক।

খঞ্জ যখন বলবান্ অন্ধের স্কন্ধে চাপিয়া ভিক্ষার জন্য দাতার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে তখন বেশ একটা সহযোগিতা থাকে। অন্ধ পথ চলে, খঞ্জ তাহার ঘাড়ে বসিয়া পথ নির্দ্দেশ করে। তা'র পর ভিক্ষালব্ধ অর্থ দু'জনে সমান ভাগ করিয়া লয়। এই ব্যবস্থায় একের অসম্পূর্ণতা অপরে পূরণ করিয়া, শেষে দু'জনেই লাভবান্ হইয়া পড়ে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ব্যাপারটিকে Symbiosis বা সহযোগিতা বলেন না। ভিন্ন জাতীয়-জীবের মধ্যে যে স্বাভাবিক আদানপ্রদান তাহাই সহযোগিতা। গরুটিকে ঘাসজল খাওয়াইয়া পুষ্ট করিলে, সে যখন দুগ্ধধারা দান করিয়া ঘাসের ঋণ পরিশোধ করে, তখনো ইহাকে সহযোগিতা বলা যায় না। এই ব্যাপারে পূর্ণ মাত্রায় দোকানদারী বর্ত্তমান। ইহার আগাগোড়া কেবল মানুষের চতুরতাতেই পূর্ণ। পৃথিবীতে ঘাসজলের অভাব নাই। মানুষ যদি কৃত্রিম উপায়ে গো-জাতিকে পরাবলম্বী না করিত, তবে তাহারা কখনই গো-শালায় আশ্রয় গ্রহণ করিত না। প্রকৃতিদত্ত তৃণমুষ্টি আহার করিয়া এবং দুগ্ধধারায় নিজের সন্তানগুলিকে পুষ্ট করিয়া, বেশ নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইত।

উদ্ভিদ ও মধুমক্ষিকার কার্য্যে সহযোগিতার একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়।

ফুলের পরাগগুলি গর্ভকেশরের (Pistils) উপরকার আঠালো অংশে আসিয়া লাগিলে, ফলের উৎপত্তি সুরু হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একই ফুলের পরাগ যদি তাহারি গর্ভকেশরে আসিয়া লাগে, তবে ফল ভাল হয় না। এই প্রকারে ফল উৎপন্ন করিতে থাকিলে, চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যে গাছের বিশেষ অবনতি দেখা যায়। এক গাছের ফুলের পরাগ যদি সেই জাতীয় অপর কোন গাছের গর্ভকেশরে গিয়া পড়ে, তবেই ফল ভাল হয়, এবং তাহারি বীজহইতে যে সকল গাছ হয়, সেগুলির পুষ্পপত্রে ফলে উন্নতির সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই বলিতে হয়, পরাগের আদান প্রদান ক্রমোন্নতির পথে চলিবার একটা প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় উদ্ভিদ্ মাত্রেই হস্তপদহীন এবং একবারে চলচ্ছক্তিরহিত। মাটিহইতে উঠিয়া, দুইপদ দূরবর্ত্তী গাছের ফুলহইতে পরাগ আনিয়া যে নিজের ফুলে দিবে, এমন সামর্থ্য কোন উদ্ভিদেরই নাই। প্রকৃতির বিধানে মাটি দুইতেই ইহারা

খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং মাটিতে মূল প্রোথিত করিয়া নিশ্চল থাকিলেই ইহাদের জীবনরক্ষা হয়।

মধু-মক্ষিকার প্রকৃতি উদ্ভিদের ঠিক্ বিপরীত। ইহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল। কাজেই জীবনরক্ষার জন্য ইহাদের অধিক খাদ্যের আবশ্যক হয়, এবং খাদ্যটুকুকে নিজেদেরই খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিতে হয়। অচল উদ্ভিদ, তাহাদের পুষ্পগুলিতে সচল মক্ষিকার জন্য প্রচুর মধু সঞ্চিত রাখে। মক্ষিকা মধুর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। সেই সযত্নসঞ্চিত মধু আকণ্ঠ পান করিয়া এবং পুষ্পের পরাগ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ইহারই অপর পুষ্পের গর্ভ-কেশরে তাহা লাগাইয়া আসে। এই ব্যবস্থায় মধুমক্ষিকা এবং উদ্ভিদ্ উভয়েরই উপকার হয়। মক্ষিকা মধুপান করিয়া তুষ্ট হয় এবং উদ্ভিদ মক্ষিকারই সাহায্যে পরাগের আদানপ্রদান করিয়া বংশের উন্নতিসাধন করিতে থাকে। প্রকৃতির নির্দ্দেশে জীবনের ধারাকে বিচিত্র পথে চালাইয়া দুইটি পৃথক জাতীয় জীব ঘটনা-ক্রমে মিলিত হইয়া যখন এইপ্রকার পরস্পরের উপকার করিতে থাকে, তখনি তাহারা সহযোগী হয়।

বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এবং কাণ্ডাদিতে বর্ষার শেষে যে এক প্রকার সবুজ ও সাদায় মিশানো ছাতা (Lichens) দেখা যায়, তাহার জীবনের ইতিহাস খুঁজিলে, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় উদ্ভিদের সহযোগিতার অদ্ভুত কার্য্য ধরা পড়ে!

শৈবাল (Algae) এবং ব্যাঙের ছাতা (Fungi) উভয়েই উদ্ভিদ্‌শ্রেণীভুক্ত হইলেও জাতিতে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক। শৈবাল উদ্ভিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদের অনেকেরই দেহখানি এক-কোষময়। এই কোষটিকেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইহারা বংশবিস্তার করে। অগভীর আবদ্ধ জলে যে সবুজ সর পড়ে, তাহা এই শ্রেণীরই কোটি কোটি উদ্ভিদের সমষ্টি। পুষ্করিণীর জলে সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় যে সকল উদ্ভিদকে ভাসিতে দেখা যায়, তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। তবে ইহারা অপরের তুলনায় কতকটা উন্নত। এই শৈবাল-গুলির জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু আকরিক পদার্থের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারা অপর উদ্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে মূল চালনা করে না। আর্দ্র স্থানই শৈবালের আবাস, এইসকল স্থানে জলের সহিত যে আকরিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উহাদের জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ঠ। মৃত্তিকার সহিত ইহাদের অতি অল্পই সম্বন্ধ থাকে। জীবনের কার্য্য চালাইতে গেলে যেসকল জৈব পদার্থের আবশ্যক, তাহা এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌গণ দেহের হরিৎ-কণার (Chlorophyll) সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া লয়।

ব্যাঙের ছাতা যে উদ্ভিদশ্রেণীভুক্ত তাহাও শৈবালের ন্যায় অপুষ্পক, কিন্তু মূলহীন নয়। উদ্ভিদমাত্রেই মূলদ্বারা আকরিক খাদ্য সংগ্রহ করে। উহারাও মূলের সাহায্যে হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন্, ফস্‌ফরস্, পটাসিয়ম্, ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ প্রভৃতি পদার্থ দেহস্থ করিতে থাকে। কিন্তু দেহে হরিৎ-কণা না থাকায়, সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় ইহারা জৈব পদার্থ নিজে নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। কাজেই যে সকল স্থলে পচা জৈব পদার্থ থাকে, তাহার উপরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সেই পচা খাদ্য দেহস্থ করিয়া ইহারা জীবন কাটাইয়া দেয়। এই কারণেই

গলিত গোময়-গোমূত্রযুক্ত স্থান এবং পচা পাতা এবং ডালই ব্যাঙের ছাতার প্রধান জন্মক্ষেত্র। উদ্ভিদ্ মৃত্তিকায় যে সকল খাদ্য পায়, তাহা সকল সময় ঠিক খাদ্যের আকারে থাকে না। মূল হইতে এক প্রকার দ্রাবক (Acid) নির্গত করিয়া এবং তাহারি সাহায্যে কঠিনকে দ্রব করিয়া উহারা অখাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করে। ব্যাঙের ছাতার যে সকল ছোট ছোট মূল আছে, সেগুলি হইতে ঐ দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, কাজেই আকরিক খাদ্য সংগ্রহে ইহাদিগকে একটুও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

এখন মনে করা যাউক ব্যাঙের ছাতা এবং শৈবাল ঠিক্ পাশাপাশি থাকিয়া বৃক্ষত্বক্ বা শিলাখণ্ডের উপর আশ্রয় লইয়াছে। বৃক্ষত্বকে জৈব বস্তু এবং আকরিক পদার্থ উভয়ই মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু কোনটিই উদ্ভিদের খাদ্যরূপে থাকে না। শিলাখণ্ডে আবার জৈব বস্তু একটুও মিলে না, ইহার আগাগোড়া কেবল আকরিক পদার্থ দিয়াই গঠিত। এই অবস্থায় ব্যাঙের ছাতা ও শৈবাল পৃথক জাতীয় উদ্ভিদ হইয়াও, পরম সখ্যতায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। দেহের হরিৎ-কণার সাহায্যে বায়ুর অঙ্গারক-বাষ্প (Carbonic Acid Gas) টানিয়া শৈবাল যে জৈব বস্তু প্রস্তুত করে, তাহার সমস্তটা গ্রাস না করিয়া সে একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতাকে দিতে থাকে। ব্যাঙের ছাতা এই দানের কথা ভুলে না। সে যখন মূল-নিঃসৃত দ্রাবকের সাহায্যে বৃক্ষত্বক্ বা শিলার আকরিক পদার্থগুলিকে খাদ্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রস্তুত খাদ্যের একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতার জন্য রাখিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় কাহারো খাদ্যের অভাব হয় না। উভয় উদ্ভিদই পরিতুষ্ট হইয়া বংশবিস্তার দ্বারা একএকটি ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। বৃক্ষত্বক্ শিলাখণ্ড বা পুরাতন প্রাচীরের গায়ে যে সাদা ও সবুজে মিশানো ছাতা দেখা যায়, তাহা শৈবাল এবং ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঙের ছাতারই উপনিবেশ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরস্পরের সাহায্য করিয়াই উহারা জীবিত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহই একা বৃক্ষত্বক বা শিলাখণ্ডের ন্যায় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না।

মটর, কড়াই, সিম প্রভৃতি সিম্বীপ্রদ (Leguminous) উদ্ভিদের জীবনের ইতিহাসেও সহযোগিতার কার্য্য দেখা যায়। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে জন্মিলে এই সকল উদ্ভিদ নাইট্রোজেনের অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় এক প্রকার জীবাণু (Bacillus) উহাদের মূলে বাসা বাঁধিয়া নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে থাকে। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই জীবাণু গুলিতে দেখা যায়। উদ্ভিদগুলিও তাহাদের মূলাশ্রিত অতিথি সম্প্রদায়ের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে ভুলে না। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত অনেক সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া জীবাণুগুলিকে খাওয়াইতে আরম্ভ করে। এই আদান-প্রদানে উদ্ভিদ্ ও জীবাণু উভয়েই পরম লাভবান্ হয়।

মনুষ্যসমাজে যেমন দস্যু তস্কর আছে, উদ্ভিদ-রাজ্যেও সে প্রকার নির্ম্মম জীব যথেষ্ট দেখা যায়। সদুপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেহ প্রাণ একত্র রাখার অভ্যাস ইহাদের মোটেই নাই। পরের ঘাড়ে চাপিয়া এবং আশ্রয়দাতার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উদরপূর্ত্তি করাই ইহাদের কাজ। পরজীবী উদ্ভিদ অর্থাৎ পরগাছা (Parasite)

এই দস্যুসম্প্রদায়ভুক্ত। সুস্থ গাছের উপর জন্মিয়া নিজেদের মূলের সাহায্যে এগুলি এমন নির্ম্মম ভাবে আশ্রয়দাতার রস শোষণ করিতে থাকে, যে অল্প দিনের মধ্যেই তাহার জীবনান্ত ঘটে। পরজীবী উদ্ভিদের বীজাদি মৃত্তিকায় বপন করিলে অঙ্কুরিত হয় না। মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহের শক্তি হইতে ইহারা একবারে বঞ্চিত। পরজীবী উদ্ভিদের ন্যায় পরজীবী প্রাণীরও অস্তিত্ব আছে। প্রাণীর অন্ত্রে (Intestine) যে সকল কৃমি জন্মায় তাহারা সম্পূর্ণ পরজীবী। দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং ভুক্ত খাদ্যে ভাগ বসাইয়া ইহারা প্রাণ ধারণ করে। দদ্রু-উৎপাদক জীব, উকুন এবং এঁটোলি প্রভৃতিকেও এই দলে ফেলা যাইতে পারে। ইহারা সকলেই আশ্রয়দাতার শোণিত শোষণ করিয়া জীবনরক্ষা করে। কিন্তু কেহই এই উপকারটুকুর বিনিময়ে আশ্রয়দাতাকে কিছুই দান করে না বরং নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি করিয়া উপকারীর জীবনান্তের চেষ্টা দেখে।

আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ গুলিকে কোনক্রমে সহযোগিতা বলা যায় না বরং উহাতে কতকটা প্রতিযোগিতার ভাবই বর্ত্তমান। কিন্তু প্রাণীর অন্ত্রে যে সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আশ্রয়দাতার সহিত সহযোগিতা করে বলিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্গণ মনে করিতেছেন। ইহারা উদরস্থ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত খাদ্য গুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, অঙ্গারক বাষ্প এবং মিথেন্ (Methane) প্রভৃতি বায়ু উৎপন্ন করিতে থাকে। বলা বাহুল্য ইহাতে আশ্রয়দাতার কোনই উপকার হয় না, বরং পেট-ফাঁপা ইত্যাদি পীড়া দেখা দেয়। কিন্তু ইহারি সঙ্গে জীবাণুগুলি আমোনিয়া (Ammonia) প্রভৃতির দ্বারা পাকযন্ত্রে আলবুমেন্ ইত্যাদি যে পরম পুষ্টিকর পদার্থের গঠন করে, তাহাতে আশ্রয়দাতার অশেষ উপকার হয়।

মনুষ্যসমাজে খাঁটি সহযোগিতা (Symbiosis) বা খাঁটি পরজীবিতা (Parasitism) কোনটারই উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, যাহাকে সহযোগিতা বলিব, কি পরজীবিতা বলিব, স্থির করা দায় হয়। ইউরোপের সোসিয়ালিস্ট সম্প্রদায়, ধনী মহাজন কণ্ট্রাক্টর ও বড় বড় কলকারখানার চালকদিগকে পরজীবী আখ্যা দিয়া থাকেন। সঙ্কটের সময় এই লোক গুলিই কি প্রকারে ক্ষুধার্ত্তের শূন্য উদর পূর্ণ করে, তাহা সোসিয়ালিস্টগণ ভুলিয়া যান। আবার যখন ধনী এবং মহাজনগণ অর্থ-সঞ্চয়ের আকাঙ্খায় নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া দরিদ্রসমাজের ভাতজল বন্ধ করেন তখন তাঁহাদের পরজীবী-মূর্ত্তিখানিই প্রকাশ পায়।

স্তন্যপায়ী মানব-শিশুকে এবং ইতর প্রাণীর নিঃসহায় শাবকগুলিকে অনেকে পরজীবী প্রাণীর দলে ফেলিতে চাহেন। খাঁটি প্রাণীতত্ত্বের দিক দিয়া লাভ ক্ষতির হিসাব করিতে বসিলে, ইতর স্তন্যপায়ী'দিগের সন্তানগুলিতে পরজীবীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা মানবশিশুকে পরজীবী বলিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তি তর্কের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। জীবতত্ত্বের মানদণ্ড দিয়া মানবের সুখদুঃখ আনন্দকে কখনই মাপা চলে না। জননী যখন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহাই বোধ হয় সেই দুগ্ধধারার ঋণ পরিশোধ করে। এই আনন্দ মানুষের

মনগড়া কৃত্রিম আনন্দ নয়। যে আনন্দের সাগরে বিশ্বনাথ এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, পুত্রের স্বাস্থ্যে জননীর আনন্দ তাহারি অংশ। ইহা সহজ সংস্কারজাত অতি পবিত্র আনন্দ। বাহিরের বৈরিতার অন্তরালে তলায় তলায় প্রাণীতে উদ্ভিদে, জড়ে ও জীবে যে চিরন্তন সখ্যতা আছে, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধকে সেই সখ্যতাই সরস করিয়া রাখিয়াছে। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে মাতা ও সন্তানে, যে সে সম্বন্ধ নাই, তাহা কেহই বলিতে পারেন না; বরং থাকারই সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আমরা শিশুকে কখনই পরজীবী বলিতে পারিব না।

সহযোগিতা ও পরজীবিতার পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি আলোচনা করিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ একটা বৃহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহগুলি কোটি কোটি সহযোগী কোষেরই এক একটা বৃহৎ উপনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক গুণসম্পন্ন কোষগুলি বহুকাল সহযোগিতা করিয়া এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে এখন একের অভাবে অপরগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। বহুকালের সহযোগিতার এই প্রকার সম্বন্ধ অপর জীবের মধ্যেও দেখা যায়। যে সকল পিপীলিকা আপ্‌হাইড্‌ নামক কীট (পিপীলিকা-ধেনু) পালন করিয়া কীটদেহ নিঃসৃত রসপানে জীবন ধারণ করে, দীর্ঘ সহযোগিতায় তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা এপ্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে এখন উহারা আপ্‌হাইড্‌ কীটের সাহায্য ব্যতীত বাঁচে না এবং কীটগুলিও পিপীলিকার যত্ন ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবদেহকে যদি কতকগুলি সহযোগী কোষের সমষ্টি বলা যায়, তবে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। জীবনের অনেক কার্য্যে আজ কাল সহযোগিতার যে সকল পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে পোষণই করিতেছে। রক্তের শ্বেত-কণিকাগুলির (White Corpuscles) কার্য্য প্রাচীন শরীরবিদ্‌গণ জানিতেন না। এখন দেখা গিয়াছে, অনিষ্টকর জীবাণু রক্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, ঐ শ্বেত-কণিকাগুলিই সেগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তা'ছাড়া পিপ্‌টন্ (Peptones) হইতে আলবুমেনয়ডের (Albumenoids) উদ্ধার এবং ক্ষত স্থানের আরোগ্যবিধান প্রভৃতি আরো অনেক কাজে শ্বেত-কণিকার সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

প্রার্থনা।

আজিকার এই দিনে জীবনে আমার,
তোমার অমৃতধারা যেন অনিবার
লভি প্রাণে, তব পুণ্য মঙ্গল পরশ
করে দেয় মন প্রাণ সজীব সরস।
প্রতি কার্য্যে তোমারেই পাই দেখিবারে,
তোমারি মধুর নাম হৃদয়ে ঝঙ্কারে।
এত ক্ষুদ্র এত দীন ক্ষুদ্র তৃণ আমি
তবু দয়া তব এত, ওগো অন্তর্যামী।
সুধাধারা সম বর্ষি হৃদয়ে আমার
তোমারি করিয়া নেছ, কি জানাব আর
মনোভাব ভাষা মাঝে দিব প্রকাশিয়া
হেন শক্তি নাই মম, ক্ষুদ্র দীন হিয়া
লুটায় প্রণত হয়ে ও-চরণ পরে
হৃদয় ভরিয়া উঠে কৃতজ্ঞতা ভরে।

প্রার্থনা।

(১)

তোমার পূজার তরে পবিত্র করিয়া
লও জগদীশ তুমি এই ক্ষুদ্র হিয়া।
সংসারের প্রলোভন পাপের বাজার,
এখনো হয়নি ম্লান বাসনা আমার।

নিশীথে বিশ্রাম করি তব স্নেহ ছায়,
জাগিয়া মেলিনু আঁখি দীপ্ত রবিভায়
সুনীল অম্বর তলে, স্নিগ্ধ সমীরণ
কুসুম সুরভি রাশি করিছে বহন।
গাহিছে ললিত কণ্ঠে বিহঙ্গের দল,
এখনো এখনো প্রাণ রয়েছে নির্ম্মল।
এখনো সংসার কথা ভাবনা আসিয়া,
অন্য দিকে হিয়া মোর লয়নি টানিয়া।
এসো তুমি নিরালায় গোপন হৃদয়ে,
সার্থক জীবন হবে তোমারে পূজিয়ে।

(২)

আমার ভিতরে কিছু রাখনা গোপন,
সকলি করিয়া নেছ তোমারি আপন।
তোমার দৃষ্টির আড়ে কি লুকায়ে রাখি,
তুমি অন্তর্য্যামী তব ঐ দুটি আঁখি
সতত দেখিছ চেয়ে, লজ্জানত হয়ে
তোমার সম্মুখে দৃষ্টি লতেছি ফিরায়ে।
হে দেবতা হে আমার অন্তরের ধন,
রেখনা রেখনা আর কিছুই গোপন।
এ হৃদয় বিছাইয়া সমুখে তোমার,
দেখাতেছি একে একে, কর আপনার
আমার যা কিছু আছে সর্ব্বস্ব বিলায়ে
লভি প্রীতি, শান্তি স্নিগ্ধ এ হৃদয় ছায়ে।
লও লজ্জা, লও ভয় লজ্জা-নিবারণ
পাপ তাপ, হরি কর সুন্দর শোভন।

(৩)

কি বলে তোমারে আজি করি সম্বোধন,
তুমি অন্তরেতে আছ অন্তরের ধন।
কি করে করিব বন্দী ভাষার মাঝারে,
কি বলে প্রাণের কথা জানাই তোমারে?
নাহিক সে শক্তি মম, নিস্তব্ধ হইয়া
তোমারি সৃষ্টির পানে, চেয়ে মুগ্ধ হিয়া।
কি আশ্চর্য্য নিয়মেতে বিশ্ব চরাচর
বাঁধিয়াছ, একি ভাবে ঘুরে নিরন্তর।
আপন কর্ত্তব্যে মগ্ন জগৎ সংসার,
শুধু কি বিফলে দিন কাটিবে আমার?
কি হেতু পাঠালে মোরে বল সেকি কাজ,
কি ব্রত সাধিব হেতা ওগো রাজরাজ
যে আজ্ঞা করিবে মোরে দেখাবে যে পথ,
যেন তোমারেই পাই পূরে মনোরথ।

বিধবা।

(তাহেরপুরের স্বর্গীয়া রাজকুমারী
সুগতিদেবীর রচিত।)

কে চাও দেখিতে দেবী দেখ হেতা আসিয়া।
এমন মহিমাময়ী,
মানবীয় রিপুজয়ী,
দেবী আর নাহি কোথা এ ভারত ছাড়িয়া॥
শুভ্র বাস শুদ্ধ মতি,
তেজস্বিনী স্নিগ্ধ জ্যোতি,
সুখ শান্তি আত্মস্বার্থ বিলাসিতা ত্যাগিয়া।
আপন মহিমা ভরে,
অবনী উজ্জ্বল করে,
ভারতবিপিনে দেখ রহিয়াছে ফুটিয়া।
এবে এই দেশে ভাই,
দেখাবার কিছু নাই,
ভারতের বল বীর্য্য গেছে সব নিভিয়া॥
শুধু অই এক কোণে,
ফুটে আছে অযতনে,
ভারতের গর্ব্ব যাহা দেখ সবে চাহিয়া।
আন পুষ্প, আন বারি,
অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
জীবন সার্থক কর অই দেবী পূজিয়া॥

(ধর্ম্মপ্রচারক হইতে উদ্ধৃত)

নানা কথা।

বৌদ্ধধর্ম্ম।—২৮এ অক্টোবর তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসে প্রকাশ যে বৌদ্ধধর্ম্ম ইউরোপে বিস্তার লাভ করিতেছে। দিন দিন অনেকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। জার্ম্মেনি, ইংলণ্ড ও হঙ্গেরিতে এইরূপ দীক্ষিতের সংখ্যা অধিক।

বাইবেল।—১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বাইবেলের প্রথম (authorised version) সর্ব্ববাদী সম্মত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আগামী বৎসর আসিলে উহার ঠিক তিন শত বৎসর পূর্ণ হইবে। ঐ বৎসরকে স্মরণীয় করিবার জন্য আয়োজন হইতেছে।

মৃত্তিকা।—মৃত্তিকাতে আরোগ্যজনক গুণ নিহিত আছে। স্পেনের অন্তর্গত La Toja নামক স্থানের মৃত্তিকায় ঐ গুণ সমধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। ঐ মৃত্তিকামিশ্রিত জলে স্নান ও উহার প্রলেপ বাতরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বিলাতের অনেক চিকিৎসালয়ে ঐ মৃত্তিকার সামগ্রী ব্যবহৃত হইবার কথা চলিতেছে। London medical Exhibition এ পরীক্ষার্থ নানা স্থানের মৃত্তিকা আসিতেছে। মৃত্তিকাতে যে এরূপ নানা গুণ আছে, তাহা দেশীয় বৈদ্যশাস্ত্রে অপরিজ্ঞাত নহে।

নীরবতা।—George Montagu Hawkins বিগত ১১ বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র ৬টি বার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি যক্ষ্মা-রোগে Winchester work-house এ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সময়ের ভিতরে তিনি সহাস্য মুখে বেড়াইতেন। বাক্য উচ্চারণ করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, অথচ তিনি কথা কহিতেন না। ঔষধ ও পথ্য যখন যাহা তাঁহাকে দেওয়া হইত, তাহা তিনি অবাধে গ্রহণ করিতেন।

যন্ত্র।—বিমান-বিহারী-যন্ত্রের দিন দিন যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে উহা ভবিষ্যতে যুগান্তর আনয়ন করিবে। যদিও যাঁহারা এই যন্ত্রে পরিভ্রমণ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বিনাশ ও মৃত্যুর সংখ্যা সমধিক, তথাপি তাঁহাদের উদ্যম চেষ্টা অর্থব্যয় ও সাহস নিতান্তই বিস্ময়কর। এইরূপ দুর্দ্দাম্য চেষ্টা কেবল বিলাতেই সম্ভব।

বৃহৎ উল্কা।—একটি সুবৃহৎ উল্কা বিগত ৩ রা অক্টোবর ৮৷৷॰ টার সময় ট্রান্সভালের অন্তর্গত জোহানস্বর্গের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে সময়ে তাহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে ১৫০ মাইল মাত্র ছিল। আকাশ তিন মিনিট আলোকিত হইয়াছিল। লোকগণ সন্ত্রস্ত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিল; মনে করিয়াছিল যে প্রলয় বুঝি সম্মুখে। উহার দীর্ঘ লেজও পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

কাশীধাম।—কাশীতে সারদোৎসব উপলক্ষে কাশীধাম-ব্রাহ্মণসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। দেশ বিদেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ একদিন বক্তৃতা করেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

দেবালয়।—আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিগত ২৮ এ আশ্বিন শনিবার শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দিন গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে চারিজনকে বেদ-শিক্ষার্থ কাশীতে প্রেরণ করেন, কুমুদবাবু তাঁহাদের অন্যতম ৺রমানাথ তত্ত্ববাগীশের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র।

মাংস ভোজন।—মাংসের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় ফ্রান্স দেশে ইতর সাধারণের মধ্যে নিরামিষ ভোজনের পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। ডাক্তার Pascal পাস্কল সাহেব ঘোটক-মাংস ব্যবহারের পরামর্শ দিতেছেন। তিনি বলেন ঐ মাংস পুষ্টিকর অথচ সুলভ। কিন্তু ঘোটক-মাংস-ভক্ষণ অনেকের সংস্কারবিরুদ্ধ। ১৮৬৬ খৃঃ পারিসে কেবলমাত্র একজন ঘোটক-মাংস বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু এক্ষণে সমগ্র ফরাসী দেশে ৮০০ জন এবং তাহার মধ্যে কেবলমাত্র পারিসে ও তাহার সান্নিধ্যে ৫৫০ খানি ঘোটক-মাংস বিক্রেতা আছেন। বিগত ১৯০৭ সালে ৬০১৭১ ঘোটক মাংসার্থ নিহত হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ১১৪১টি গর্দ্দভ (donkey) এবং ৪৬৩টি অশ্বতরের প্রাণ ঐ কারণে বিনষ্ট হয়। বলা বাহুল্য নিহত অশ্বগুলির মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল। লোকে জঠর জ্বালায় ও দারিদ্র্যে ঘোটক-মাংসের প্রতি পূর্ব্ব সংস্কার ছাড়িতেছে।

অমৃতবাজার। ২৮এ অক্টোবর।

---

২০ শে আশ্বিন হইতে ৩০ শে আশ্বিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	১৲
„ „ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	ঘোষনগর	৪৲
„ „ মহেশচন্দ্র ঘোষ	বাঁকুড়া	৬৷৷০
„ „ সুশীলকুমার ঘোষ	বর্ম্মা	৫৲
„ „ প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত	কুমিল্লা	৩৷০
„ „ হরকুমার সরকার	ঘোড়ামারা	৯৷৷/০

সপ্তদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।

৮০৯ সংখ্যা ১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

গীতার প্রশ্ন উত্তর।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

১৮। প্রঃ।

নিম্নলিখিত ভাবের শ্লোকগুলি লিখিয়া দেও।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ ২।৬২-৬৩

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং ২।৬৯

গীতার অসাম্প্রদায়িক ভাব ৪।১১

ভগবানের অবতার গ্রহণ ৪।৭-৮

স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম হইতে শ্রেয় ৩।৩৫

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং ২।৭০

যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত চক্র ৩।১৪, ১৫

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র ৬।৩০

আপনি আপনার বন্ধু ও শত্রু ৬।৫, ৬

১৮ উঃ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

প্রিয়ম্বদা।

ইন্দিরা।

১৯। প্রঃ

যোগ শব্দের ভিন্নার্থ বল।

যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং—ইহার অর্থ কি?

ব্রহ্মশব্দের ভিন্নার্থ বল।

শব্দব্রহ্ম—ব্রহ্মনির্ব্বাণ ইহার অর্থ কি?

মাত্রাস্পর্শ, যোগক্ষেম, অনসূয়া, গুড়াকেশ, নিস্ত্রৈগুণ্য, নির্দ্বন্দ্ব, অপরিগ্রহ,

তাবস্য পরিপন্থিনৌ—এই সকলের অর্থ বল।

১৯। উঃ।

যোগ = সমত্ব ॥

যোগ = ঈশ্বর সম্মিলন ॥

যোগ = কর্ম্ম নিপুণতা ॥

যোগ = অতীন্দ্রিয় সুখের অবস্থা।

যোগ = সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈধ বোধ এবং পুরুষের কৈবল্য স্বরূপে অবস্থান।

যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং—ইহার অর্থ এই যে যদিও কর্ম্মই আমাদের বন্ধনের কারণ, তবুও যদি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিতে পারি, তবে আর সে কর্ম্মে আমরা আবদ্ধ হই না। যোগসিদ্ধ পুরুষ এইরূপ কর্ম্ম করিতে সক্ষম। যোগ আমাদের সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি এবং হৃদয়ে নিষ্কাম-বুদ্ধি উদ্বোধিত করে এবং নিবৃত্তচিত্তে কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভোগ করিতে হয় না। এই নিমিত্ত যোগকে কর্ম্মের কৌশল বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম = বেদ।

ব্রহ্ম = পরব্রহ্ম

শব্দব্রহ্ম = বেদ।

ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ = পরব্রহ্মের সহিত একান্ত সম্মিলন, যোগযুক্ত অবস্থা।

মাত্রাস্পর্শ = ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য।

যোগক্ষেম = যোগ কি না অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি।

ক্ষেম = প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ।

অনসূয়া = করুণা।

গুড়াকেশ = গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশঃ জিতনিদ্রঃ।

নিস্ত্রৈগুণ্য = সংসার প্রতিপাদক বিষয়ের অতীত।

নির্দ্বন্দ = দ্বন্দ অর্থাৎ দ্বিধা ভাব রহিত, যিনি সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়ে সমভাব, অবিকৃত চিত্ত।

প্রিয়ম্বদা।

১৯ উঃ। যোগ শব্দ কখনো 'সমত্ব', কখনো 'কর্ম্মকুশলতা', কখনো পরমাত্মায় আত্মার সংযোগ অর্থে ব্যবহৃত। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' ইহার অর্থ কর্ম্মের যে বন্ধনকারী দোষ তাহা নিষ্কাম ও কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানশূন্য ভাবে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিলে খণ্ডন হয়। সুতরাং এই প্রকারে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম করাও হইল, অথচ কর্ম্মের দোষও স্পর্শিল না, ইহাই কৌশল। এই যোগকেই কর্ম্মকুশলতা বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম শব্দ এক অর্থে ঈশ্বর, আর এক অর্থে বেদ। শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ। ব্রহ্ম নির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

মাত্রাস্পর্শ = ইন্দ্রিয়বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ।

যোগক্ষেম = কামনার বস্তু উপার্জ্জন এবং উপার্জ্জিত বস্তুরক্ষণ।

অনসূয়া = পরের দোষ না দেখা, নিন্দাবাদ না করা।

গুড়াকেশ = নিদ্রার অধিপতি। অপর মতে শিকড় বিশেষের ন্যায় কেশ যাহার।

নিস্ত্রৈগুণ্য = সত্ব রজ তম ত্রিগুণ লইয়া সংসার। এই ত্রিগুণ-রহিত যিনি, অর্থাৎ যিনি সংসারে লিপ্ত নহেন।

নির্দ্বন্দ = সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দভাব শূন্য, অর্থাৎ দুয়েতেই যাহার সমভাব।

অপরিগ্রহ = পরিবার বা আত্মীয় স্বজনে মমতাশূন্য।

তাবস্য পরিপন্থিনৌ = এই দুই ইহার শত্রু, বিঘ্নকারী।

ইন্দিরা।

২০ প্রঃ।

অর্জ্জুন বলিতেছেন—আততায়ী বধেও আমাদের পাপ আছে—কি প্রকারে?

কৌরবসৈন্যবল অপর্য্যাপ্ত—পাণ্ডবসৈন্যবল পর্য্যাপ্ত—ইহাদের অর্থ কি ?

অব্যক্তাদীনি ভূতানি—অব্যক্তনিধনানি

না সতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। অর্থ কর।

২০। উঃ।

অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপানির্ধনাপহঃ,
ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ।

শাস্ত্রতঃ আততায়ীকে বধ করিলে কোন পাপ স্পর্শে না, বরং আততায়িকে দৃষ্টিমাত্রে বধের আদেশ শাস্ত্রে আছে। তবুও দুর্য্যোধনাদি আত্মীয়বর্গ এবং আচার্য্যগণকে বধ করায় পাপস্পর্শ করিবে ইহাই অর্জ্জুনের আশঙ্কা; যুদ্ধের পরিণাম বহু লোকক্ষয়—বহু পতি-পুত্র-পিতা-ভ্রাতার বিনাশ, অভিভাবকহীন স্ত্রী সকল দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হইবে, ইহাই অর্জ্জুনের অন্যতর পাপের আশঙ্কা।

কুরুসৈন্য অপর্য্যাপ্ত এবং পাণ্ডব সৈন্য পর্য্যাপ্ত ইহার দুই অর্থ হইতে পারে। অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত অসীম এবং পর্য্যাপ্ত অর্থে স্বল্প বোঝায়, এবং অপর্য্যাপ্ত যথেষ্ট নয় এবং পর্য্যাপ্ত অর্থে যথেষ্ট বোঝাইতে পারে। তবে দুর্য্যোধনের ন্যায় দাম্ভিকের মুখে স্বীয় সৈন্যবল বহু অপরিমিত এবং পাণ্ডবদিগের সৈন্যবল পরিমিত, স্বল্পসংখ্যক অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু টীকাকারগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থে যথেষ্ট নয় এবং পর্য্যাপ্ত অর্থে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন কেননা পাপকারী দুর্য্যোধনের মনে সজ্জীকৃত পাণ্ডবদিগের বিশাল চমু ভয়ের উদ্রেক করিয়াছিল, তাই তিনি পাণ্ডবদিগের সৈন্যবল অধিক ও আপন সৈন্য বল স্বল্প মনে করিয়াছিলেন।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি=ভূত সকলের অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের আদি অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বকাল পূর্ব্বজন্ম আমাদিগের নিকট অপ্রকাশিত, এবং তাহাদের নিধন অর্থাৎ মরণোত্তর কালও আমাদের অজানিত।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ= অসতঃ অভূতজীবস্য ভাবঃ অস্তিত্বো ন বিদ্যতে নাস্তি ইতি যাবৎ, সতঃ বর্ত্তমানস্য অভাবঃ ন বিদ্যতে ন ভবতি। অর্থাৎ যাহা নাই তাহা যেমন আছে হইতে পারে না, তেমনি যাহা আছে তাহাও তেমনি নাই হইতে পারে না।

প্রিয়ম্বদা।

২০ উঃ। আততায়ী বধে যদিও শাস্ত্র মতে দোষ নাই, কিন্তু এ স্থলে আত্মীয়ই যখন শত্রু, সেই আত্মীয় বিনাশ করিলে কুলধর্ম্ম ক্ষয় হইবে, কুলধর্ম্ম নাশে কুলস্ত্রীর অধঃপতন হইবে, কুলস্ত্রী দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হইবে, এবং বর্ণসঙ্করকারীর নরকে গতি হয় শাস্ত্রে বলে। সুতরাং এই প্রকার আততায়ী-বধে পাপে লিপ্ত হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে।

কৌরবসৈন্যবল অপর্য্যাপ্ত, পাণ্ডবসৈন্যবল পর্য্যাপ্ত, এই পংক্তিতে অপর্য্যাপ্ত ও পর্য্যাপ্ত কথার অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'অপর্য্যাপ্ত, অর্থে 'যথেষ্ট নয়' আবার 'প্রচুর'; এবং 'পর্য্যাপ্ত' অর্থে 'যথেষ্ট' আবার 'অপ্রচুর' এই দুইই হয়। কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া 'কৌরবসৈন্যবল যথেষ্ট নয় এবং পাণ্ডবসৈন্যবল যথেষ্ট' এই অর্থই ঠিক বলিয়া বোধ হয়।

'অব্যক্ত' সহজ ভাষায় অর্থ অপ্রকাশ, যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে। দার্শনিক ভাষায় বলিলে জীবগণ আদিতে এবং অন্তকালে প্রকৃতিতে লীন থাকে, সৃষ্টিকালে জীবরূপে অভিব্যক্ত হয়।

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।' অর্থাৎ যাহা 'অসৎ' বা নিত্যবস্তু নহে, তাহার অস্তিত্ব হয় না, কিম্বা যাহা মিথ্যা তাহা স্থায়ী হয় না। এবং যাহা 'সৎ' বা

নিত্যবস্তু, তাহার বিনাশ হয় না। আত্মা-রূপ সৎ বস্তুর বিনাশ নাই এই ভাবার্থ।

ইন্দিরা।

২১ প্রঃ।

যে ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় তাহাকেও মিথ্যাচারী কখন্ বলা যায়?

রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ইহার অর্থ কি?

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥

অন্বয় পূর্ব্বক অর্থ কর।

২১। উঃ।

যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত রাখিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল নিরন্তর স্মরণ করে, তাহাকেই কপটাচারী বলা যাইতে পারে।

কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকলকে যে ত্যাগ করিয়াছে, সে যথার্থ নিবৃত্ত নয়। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভোগের অভিলাষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই যথার্থ নিবৃত্ত।

কতরাং নিত্য বিক্ষিপ্তানাং ইন্দ্রিয়ানাং যৎ মনঃ চিত্তং অনুবিধীয়তে অনুসরতি, হি অস্য জনস্য তৎ মনঃ প্রজ্ঞাং স্থিরবুদ্ধিং অম্ভসি মহাসমুদ্রে বায়ুঃ নাবং প্লবমিব হরতি।

যদা যস্মিন্ সময়ে নিবাতস্থো নির্ব্বাত-প্রদেশস্থঃ দীপঃ প্রদীপঃ ন ইঙ্গতে ন চলতি, ন চঞ্চলো ভবতি, যোগং যুঞ্জতঃ যুক্তবতঃ যতচিত্তস্য সংযত হৃদয়স্য যোগিনঃ আত্মনঃ সা উপমা স্মৃতা।

বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র নৌকা যেমন সমুদ্রে হারাইয়া যায়, তেমনি চঞ্চল ইন্দ্রিয় দিগের অনুসরণকারী চিত্তেরও প্রজ্ঞা স্থির-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়।

নির্ব্বাত প্রদেশস্থ স্থির-জ্যোতি প্রদীপ যেমন, সংযত-হৃদয় যোগপর যোগীর আত্মাও সেইরূপ। বায়ুহীন স্থানের প্রদীপ যেমন চঞ্চল হয় না, যেমন নিষ্কম্প-শিখা যোগীর চিত্তও তদ্রূপ।

প্রিয়ম্বদা।

২১ উঃ। যে ব্যক্তি বাহ্যেন্দ্রিয় দমন করিয়াছে, অথচ মনকে বিষয়-বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই, তাহাকে মিথ্যা-চারী বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ বাহিরে এক প্রকার, ভিতরে অন্য প্রকার। পর-বর্ত্তী শ্লোকার্দ্ধের সহিত ইহার যোগ আছে, অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তি 'রসবর্জ্জং' বা বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্ত, কিন্তু 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে', অর্থাৎ সেই পরমা-ত্মাকে দেখিলে রস বা বিষয় বাসনা পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয়।

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

মনঃ চরতাং ইন্দ্রিয়ানাং হি যৎ অনুবিধীয়তে তৎ অস্য প্রজ্ঞাং হরতি বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।

অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত বা ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন যেটিরই বশ হইয়া পড়ে, সেইটিই তাহার বুদ্ধি লোপ করে; যেমন ঝড়েতে জলে নৌকাডুবি হয়।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥

দীপঃ ন ইঙ্গতে সা উপমা স্মৃতা (তথা) যতচিত্তস্য যোগিনঃ আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ।

অর্থাৎ বায়ুহীন স্থানে রক্ষিত প্রদীপ যেমন বিচলিত হয় না উপমায় কথিত হই-য়াছে, সেইরূপ সংযতমনা যোগী আত্মার যোগ সাধন করেন।

ইন্দিরা।

২২। প্রঃ।

কৃ, অস্, আস্, শী, প্র × স্থ—ধ্যা—ধ্মা জ্ঞা; হা, হু, আপ্, স্বপ্, বিদ্, বচ্, ব্রূ, অশ্, বন্ধ, শক্, রুধ্—এই সকল ধাতুর ক্রিয়ারূপ দেও (যাহা এই ছয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়)

উপসর্গযোগে সদ্, ভূ, হৃ, ও চর ধাতুর কিরূপ অর্থ ভেদ হয় তাহা দেখাও

হন্, কৃ, বন্ধ, সনজ্, বি+চল, নী, হা, জন্, বচ— এই গুলির অকর্ম্মক (Passive) দেও।

তিজ্, জিব, কৃ, যুধ, মুচ, রুহ, জ্ঞা, এইগুলির সনন্ত (Desiderative) দেও।

২২ উঃ।

কৃ=করোতি, অস=অস্তি, আস্=আস্তে, গম=গচ্ছতি। প্র+সূ=প্রসবিষ্যতে, প্রসবিষধ্বম্। ধ্যা=ধ্যায়তঃ, ধ্মা=দধ্মৌ, দধ্মতুঃ দধ্মুঃ। জ্ঞা=জ্ঞাস্যা, জানাতি, জানীত। হা=প্রজহাতি বিহায়। হু=জুহোতি। আপ=আপ্নোতি। স্বপ=স্বপন্ স্বপিতি। বিদ=বিদ্যতে। বচ=প্রবক্ষ্যতি, প্রোক্তবান্, উবাচ। ব্রূ=ব্রবীতি, অশ্—অশ্নাতি, অশ্নতঃ, অনশ্নতঃ। বন্ধ=বধ্নাতি। শক্=শক্নোতি

সদ ধাতুর অব উপসর্গ যোগে অর্থ হয় অবসাদ, নিরুৎসাহ; আবার প্র উপসর্গ যোগে অর্থ হয় প্রসাদ, চিত্তের প্রফুল্লতা। ভূ ধাতুর অর্থ বর্ত্তমানতা।

হৃ=হরণ, অপ+হৃ ধাতুর অর্থ চৌর্য্যবৃত্তি, সং+হৃ ধাতুর অর্থ সঙ্কোচ করিয়া আনা।

চর ধাতুর সহজ অর্থ চলা ফেরা, বি+চর ধাতুর অর্থ আলোচনা করা, অপ উপসর্গের যোগে অর্থ অন্যায়রূপ চলা, অপ+চর।

হন ধাতু অকর্ম্মক—হন্যতে, ঘাতিতে
কৃ —কারয়তি কারয়তে।
বন্ধ —বধ্যতে।
সনজ —সজ্জতে।
বি+চল —বিচাল্যতে
নী—নীয়তে—হা—হীয়তে
জন্—জায়তে

তিতিক্ষা, জিজীবিষা, চিকীর্ষা, যুযুৎসা মুমুক্ষা, আরুরুক্ষা, জিজ্ঞাসা।

প্রিয়ম্বদা।

২২ উঃ।

অকুর্ব্বত, অস্তি, আসীত, গচ্ছতি, প্রসবিষ্যধ্বম্, ধ্যায়তঃ, দধ্মুঃ প্রদধ্মতুঃ দধ্মৌ, বিজানতঃ, প্রহাস্যসি, আহুঃ; আপ্নোতি, স্বপিতি, বিদ্মঃ, উবাচ, অব্রবীৎ, অশ্নাতি অশ্নতঃ, নিবধ্নাতি, শক্নোমি।

প্রসাদ=প্রসন্ন ভাব, অবসাদ=বিষণ্ণ ভাব। সম্ভব=জন্ম, প্রভব=প্রতিপত্তি। সংহরণ=টেনে নেওয়া, সঙ্কোচন; অপহরণ=চুরি। আচার=নিয়ম, নিত্যকর্ম্ম, বিচার=মীমাংসা করা, প্রচার=লোকে প্রচলিত করা।

ঘাতয়তি, কারয়তি, বধ্নাতি, সজ্জায়তে, বিচাল্যতে বিনীয়তে, প্রহাস্যসি, জায়তে, উচ্যতে বা আহ?

তিতিক্ষা, জিজীবিষাম, যুযুৎসবঃ, চিকীর্ষা, মুমুক্ষু, আরুরুক্ষু, জিজ্ঞাসা।

ইন্দিরা।

২৩। প্রঃ।

নিম্নলিখিত পদগুলির সমাস ও সন্ধি ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যা কর—

মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূঃ
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
অনার্য্যজুষ্টং। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং
অবাপ্য ভূমাবসপত্নরাজ্যং
সমাধাবচলা বুদ্ধিঃ
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু

২৩। উঃ।

কর্ম্ম ফলস্য হেতুঃ মা ভূঃ—কর্ম্মফলস্য হেতুর্মাভব।

কর্ম্মফলের কারণ হইও না।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ—বিগতা ইচ্ছা ভয়ঃ ক্রোধো যস্য সঃ।

যাহার ইচ্ছা ভয় এবং ক্রোধ বিগত হইয়াছে সেই ব্যক্তি।

কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ—কার্পণ্য দোষেণ উপহতঃ স্বভাবো যেষাং তে।

অনার্য্যজুষ্টং—অনার্য্যানাং নীচানাং প্রাকৃতজনানাং জুষ্টং যোগ্যমিতি যাবৎ।

সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ—সম লোষ্টঃ ইষ্টক অশ্ম পাষাণঃ কাঞ্চনঃ সুবর্ণঃ যস্য সঃ।

যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মানং—যোগে সন্ন্যস্তং সম্যক্ স্থাপিতং কর্ম্মযস্য সঃ যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মা তং।

অবাপ্য ভূমাবসপত্নরাজ্যং—ভূমৌ পৃথিব্যাং অসপত্নং শত্রুবিরহিতং রাজ্যং অবাপ্য প্রাপ্য।

সমাধাবচলা বুদ্ধিঃ—সমাধৌ ধ্যানে অচলা স্থিরা বুদ্ধিঃ—ধৃতিঃ যস্য সঃ।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু—সুহৃৎ স্নেহশীলো বন্ধুঃ, মিত্রং সখা, অরি শত্রু, উদাসীনঃ স্নেহ-পক্ষপাতশূন্যঃ, দ্বেষ্যঃ হিংসাযোগ্যঃ, বন্ধু আত্মজনঃ তেষু।

প্রিয়ম্বদা।

২৩। উঃ।

মা ভূঃ কর্ম্মফলহেতুঃ ;

অর্থাৎ কর্ম্মফলের আশাই যাহার কর্ম্মের কারণ, এমন লোক হইও না, সকাম ভাবে কর্ম্ম করিও না।

বিগত ইচ্ছা ভয় ক্রোধঃ—

ইচ্ছা ভয় এবং ক্রোধ বিগত হইয়াছে যাহার, অর্থাৎ ইচ্ছা ভয় ক্রোধ শূন্য ব্যক্তি।

কার্পণ্যদোষ উপহত স্বভাবঃ—

কার্পণ্য দোষে উপহত হয়েছে স্বভাব যাহার, অর্থাৎ কৃপা বা করুণাস্বরূপ দুর্ব্বলতায় যাহার চিত্ত অভিভুত।

অনার্য্য জুষ্টং—

আর্য্য যাহারা নহে, সেই অনার্য্যের দোষ যুক্ত হইয়াছে যাহা, অর্থাৎ আর্য্যগুণ যুক্ত নহে।

সম লোষ্ট অশ্ম কাঞ্চনঃ—

মাটির ঢেলা, পাথর ও সোনা যাহার নিকট সমান, অর্থাৎ সাম্য গুণযুক্ত লোক।

যোগ সন্ন্যস্ত কর্ম্মাণং—

যোগেতে ন্যস্ত হয়েছে কর্ম্ম যাহার, অর্থাৎ কর্ম্মযোগতত্ত্ব যে বুঝিয়াছে।

অবাপ্য ভূমৌ অসপত্ন রাজ্যং—

এই পৃথিবীতে একাধিপত্য লাভ করিয়া।

সমাধৌ অচলা বুদ্ধিঃ—

সমাধিতে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে যাহার, স্থিরপ্রজ্ঞ।

সুহৃৎ মিত্র অরি উদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুষু—

প্রত্যেক শব্দের অর্থ ভিন্ন, বাঙ্গালায় সংক্ষেপে শত্রু মিত্র স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়পক্ষ অনুভয়পক্ষ এ সকল সম্বন্ধে—

ইন্দিরা।

২৪। প্রঃ।

এই বাক্যগুলির ভ্রম সংশোধন কর

ন যোৎস্যোত্যুবাচ
সিদ্ধাসিদ্ধো সমোভূত্বা
প্রাণানি ধনাংশ্চ ত্যক্ত্বা
কার্য্যং কর্ম্মং কুরু
ব্রহ্মে আধায় কর্ম্মাণি
যস্যাং জাগর্ত্তি ভূতানি

২৪। উঃ।

কার্য্যং কর্ম্ম কুরু।
ব্রহ্মণি আধায় কর্ম্মাণি।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি।
প্রাণান্ ত্যক্ত্বা ধনানিচ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং ভূত্বা।

প্রিয়ম্বদা।

২৪। উঃ।

ন যোৎস্যামি ইত্যুবাচ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা, প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা, কার্য্যং কর্ম্ম কুরু। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি।

ইন্দিরা।

২৫। প্রঃ।

নিম্ন লিখিত বাক্যগুলির সংস্কৃত অনুবাদ কর

১। অশস্ত্র যে আমি আমাকে যদি শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বধ করে তা হলে আমার ক্ষেমতর হয়।

২। সম্ভাবিতের অকীর্ত্তি অপেক্ষা মরণ ভাল।

৩। আমি তোমার শিষ্য আমাকে শিখাও।

৪। কামরূপ শত্রুকে হনন কর।

৫। জ্ঞানিরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবে।

৬। অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেয়।

৭। এই যোগ বিবস্বতের দ্বারা ইক্ষাকুকে বলা হইয়াছে তুমি আমার সখা আজ তোমাকে বলিলাম।

৮। যিনি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল গো হস্তী কুকুরে সমদর্শী তিনিই পণ্ডিত।

৯। আপনাতে আপনি যে সন্তুষ্ট সেই সুখী।

১০। যে সুখ লাভ করিয়া পরম সুখ লব্ধ হয়, যাতে স্থিত হইয়া গুরু দুঃখ দ্বারাও বিচলিত হয় না, তাহাই দুঃখ সংযোগ বিয়োগ যোগ জানিবে।

২৫। উঃ।

১। জহি শত্রুং কামরূপং দুরাসদং।

২। পুরা অয়ং যোগঃ বিবস্বতা ইক্ষাকবে উক্তবান্। মম হি ত্বং সখা ; অদ্যাহং তুভ্যং কথিতবান্।

৩। কর্ম্ম শ্রেয়ো অকর্ম্মণঃ।

৪। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।

৫। অশস্ত্রং মাং চেৎ শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।

৬। শিষ্যোহম্ তব জনার্দ্দন, শাধি মাং।

৭। আত্মন্যেব আত্মনা তুষ্টঃ সুখী হি স নরঃ

৮। যং লব্ধ্বা পরং সুখং লভেত, যস্মিন্ স্থিতে সতি গুরুণা দুঃখেনাপি ন বিচাল্যতে, তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগংজানীহি।

৯। সম্ভাবিতস্য অকীর্ত্তেঃ মরণং হি শ্রেয়ঃ।

১০। জ্ঞানিনঃ ত্বাং (তুভ্যং) জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তি।

প্রিয়ম্বদা।

২৫। * * *

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তি মরণাদতিরিচ্যতে।
শিষ্যোহহং শাধি মাং তে প্রপন্নং।
জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানং উপদেক্ষন্তি।
জ্যায়ান্ কর্ম্ম অকর্ম্মণঃ।

* * *

(বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে) ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স সুখী।
যং সুখং লব্ধা আত্যন্তিকম্ সুখমশ্নুতে
গুরুদুঃখেনাপি ন বিচাল্যতে
তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগং বিদ্ধি।

ইন্দিরা।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(ষষ্ঠ উপদেশের অনুবৃত্তি)

আমাদের আত্মার ভিত্তিভূমি যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা যেরূপ আমরা ঈশ্বরেতে আরোপ করি, সেই একই প্রকারে, ন্যায় ও মৈত্রীও তাঁহাতে আমরা আরোপ করিয়া থাকি। মানুষের মধ্যে, ন্যায় ও মৈত্রী মানুষের ধর্ম্মরূপে অবস্থিত, কিন্তু ঈশ্বরের উহা উপাধি। আমাদের মধ্যে যে স্বাধীনতা শ্রমার্জ্জিত, সেই স্বাধীনতা ঈশ্বরের স্বরূপগত। অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যদি ন্যায়ের মূলগত ভাব হয় এবং আমাদের আত্মমর্য্যাদার নিদর্শন হয়, তবে ইহা কখনই হইতে পারে না—সেই পূর্ণ পুরুষ, ক্ষুদ্রতর জীবদিগের অধিকারসমূহকে অবজ্ঞা করিবেন, কেন না ঐ সকল অধিকার তাঁহা হইতেই জীবেরা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরেতেই সেই পরম ন্যায় অবস্থিত, যাহা প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার উচিত প্রাপ্য প্রদান করে। এই যে সীমাবদ্ধ জীব মানুষ, এই মানুষের যদি আপনা হইতে বাহির হইবার শক্তি থাকে, আপনাকে ভুলিবার শক্তি থাকে, আর একজনকে ভালবাসিবার শক্তি—অন্যের প্রতি আত্মসমর্পণ করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে এই নিঃস্বার্থ প্রেম, এই মৈত্রী—যাহা মনুষ্যের একটি পরম ধর্ম্ম—তাহা কি ঈশ্বরের স্বরূপে অনন্তগুণে থাকিবে না? হাঁ, জীবের প্রতি ঈশ্বরের অসীম প্রেম: সেই বিশ্ববিধাতার বিশ্ববিধানের অসংখ্য নিদর্শনে এই প্রেম পরিব্যক্ত। ঈশ্বরের এই প্রেমের কথা প্লেটো বিলক্ষণ অবগত ছিলেন; সেই প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি যে মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন তাহা এই:—"সেই পরম বিধাতা, যে কারণে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলি শুন:—তিনি মঙ্গলস্বরূপ; তিনি মঙ্গলস্বরূপ, তাই তাঁহার কোন প্রকার ঈর্ষ্যা নাই; যেহেতু তিনি ঈর্ষ্যা হইতে মুক্ত—তিনি ইচ্ছা করিলেন, সকল পদার্থ যতটা সম্ভব, তাঁহার সদৃশ হউক।" ঈশ্বরের মৈত্রীরও অন্ত নাই—ঈশ্বরের স্বরূপেরও অন্ত নাই। জীবকে আরও বেশী দান করা অসম্ভব; সীমাবদ্ধ জীব হইয়া যতটা পাইতে পারে, ঈশ্বর জীবকে ততটাই দিয়াছেন। ঈশ্বর জীবকে

সমস্তই দান করিয়াছেন—এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন,যতটা সম্ভব ততটাই দান করিয়াছেন। এত দান করিয়াও তাঁহার কিছুই ক্ষয় হয় না; কেন না তিনি পূর্ণ, নিত্য ও অক্ষয়; তিনি আপনাকে প্রসারিত করিয়াও—আপনাকে প্রদান করিয়াও অক্ষুণ্ণ থাকেন - সমগ্র থাকেন। তাঁহার অনন্ত মৈত্রী অনন্ত শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সেই অমৃত আদর্শ হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি,—যার যতটা আছে, সেই পরিমাণে সে দান করুক। কিন্তু মানবের প্রেম এত দুর্ব্বল যে তাহার সহিত একটু অহমিকা,—একটু স্বার্থপরতা মিশ্রিত থাকেই থাকে। যেমন আমাদের অন্তরে একদিকে পরসেবানিষ্ঠা ও আত্মবিসর্জ্জনের উদার ভাব নিহিত আছে, তেমনি আবার তাহার পাশাপাশি এই স্বার্থপরতারও দুর্জ্জয় মূল সকলের হৃদয়ে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

যদি ঈশ্বর পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ ন্যায়স্বরূপ হন, তাহা হইলে তিনি মঙ্গল ও ন্যায় ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না; আবার যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি করিতে পারেন, —সুতরাং তাহাই তিনি করিয়া থাকেন। এই জগৎ ঈশ্বরেরই রচনা; অতএব ইহা সম্যক্‌রূপে রচিত—সম্যক্‌রূপে তাঁহার উদ্দেশ্যের উপযোগী করিয়া রচিত।

তথাপি, এই জগতে এমন একটা বিশৃঙ্খলাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ঈশ্বরের ন্যায় ও মঙ্গলভাবে দোষারোপ করে বলিয়া মনে হয়।

মঙ্গলের ধারণার সহিত যে একটি নিয়ম সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই নিয়মটি এই কথা বলে যে, নৈতিক কার্য্যের কর্ত্তামাত্রই ভাল কাজ করিলে পুরস্কার পায় ও মন্দ কাজ করিলে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। এই নিয়মটি সার্ব্বভৌমিক, অবশ্যম্ভাবী, ও অকাট্য। এ জগতে যদি এই নিয়মের প্রয়োগ না হয় তবে, হয় এই নিয়মটির কথা মিথ্যা, নয় এই জগৎ সুব্যবস্থিত নহে।

এখন,—ইহা একটা বাস্তব তথ্য যে ভালো কাজের অব্যর্থ পরিণাম সকল সময়ে সুখ নহে, এবং মন্দ কার্য্যের অব্যর্থ পরিণাম সকল সময়ে দুঃখ নহে।

এ কথাটা সত্য হইলেও, ঈশ্বরের প্রসাদে, ইহা অতীব বিরল ও ইহা কতকটা ব্যতিক্রম-স্থলের মতো বলিয়া মনে হয়।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ধর্ম্ম; এই সংগ্রাম যেমন গৌরব-পূর্ণ তেমনি কষ্টকর; আবার পাপের কষ্ট অতীব দারুণ, সে কষ্টের শেষ নাই, সে অশান্তির অন্ত নাই।

ধর্ম্মের কতকগুলি কষ্ট থাকিলেও ধর্ম্মের সহচর—পরমসুখ, যেমন অধর্ম্মের সহচর—মহা দুঃখ। কি ক্ষুদ্র কি বৃহতের মধ্যে, কি আত্মার গুপ্ত স্থানে, কি জীবনের প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে, সর্ব্বত্রই এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য—সুখ দুঃখের একটা বৃহৎ অংশ বই আর কিছুই নহে।

এই সম্বন্ধে, মিতাচারের সহিত অমিতাচারের, সুশৃঙ্খলার সহিত বিশৃঙ্খলার, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের তুলনা করিয়া দেখ। আমি মিতাচারের অর্থে বুঝি—পরিমিত আচরণ, উহা কঠোর তপশ্চরণ নহে। আমি ধর্ম্ম অর্থে বুঝি, যুক্তি সঙ্গত ধর্ম্ম, তাহা নিষ্ঠুর পৈশাচিক ধর্ম্ম নহে।

Hufeland নামক একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক বলেন যে, সাধুভাবসমূহ স্বাস্থ্যের অনুকূল এবং অসাধুভাবগুলা তাহার বিপরীত। প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা যেমন শরীরকে উত্তেজিত করে, দগ্ধ করে, বিক্ষুব্ধ করে, সেই-

রূপ সাধুভাব সকল, সমস্ত দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য ও স্বচ্ছন্দতা বিধান করে।

আরও তিনি বলেন, যাঁহাদের সাধু জীবন, সুনিয়ন্ত্রিত জীবন, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হয়েন।

এইরূপ স্বাস্থ্যের পক্ষে, বলের পক্ষে, জীবনের পক্ষে,—অধর্ম্ম অপেক্ষা ধর্ম্মই উপযোগী। আমার মনে হয় এই কথাতেই অনেকটা বলা হইল।

তার পর পাপপুণ্যের সাক্ষী আমাদের অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মার শান্তি কিংবা অশান্তির উপর আমাদের আভ্যন্তরিক সুখ দুঃখ নির্ভর করে। এই হিসাবে, আবার সুশৃঙ্খলার সহিত বিশৃঙ্খলার, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের তুলনা করিয়া দেখ।

আবার অন্তরাত্মার কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি জনসমাজের কথা ধরা যায়,—জনসমাজে শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা, মান অপমান কিসের উপর নির্ভর করে? অবশ্য লোকমতের কখন কখন ভুলও হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভুল অধিক কাল স্থায়ী হয় না। সাধারণত,—ভণ্ড ও প্রবঞ্চকেরা, কখন কখন লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিলেও, একথা স্বীকার করিতে হইবে, লোক-সমাজে সততাই সুযশ লাভের ধ্রুব ও অমোঘ উপায়।

পাপপুণ্যের যে একটি চমৎকার নিয়ম আছে সেই নিয়মটির দ্বারাই বিশ্বমানবের অদৃষ্ট নিয়মিত হইয়া থাকে। এই পাপপুণ্যের নিয়মের উপরেই সমস্ত জনসমাজের, সমস্ত রাজ্যের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, এবং ধর্ম্মই সুখলাভের একমাত্র ধ্রুব উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহাই সক্রেটিস ও প্লেটোর মত; ইহাই ফ্র্যাঙ্কলিনের মত। এবং আমিও মানব-জীবন মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া, আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই মতে উপনীত হইয়াছি। তবে এ কথা স্বীকার করি, ইহার কতকগুলি ব্যতিক্রমস্থলও আছে। একটিমাত্র ব্যতিক্রমস্থল থাকিলেও তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক।

একটা দৃষ্টান্ত। মনে কর, একজন সুশ্রী, ধনশালী, লোকপ্রিয় সৌম্য যুবক একটা বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছে—হয় তাহার ফাঁসি কাষ্ঠকে বরণ করিতে হইবে, নয় বিশ্বাসঘাতক হইয়া একটা পবিত্র সদনুষ্ঠানের পক্ষকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাই হোক, অবশেষে তাহার ২০ বৎসর বয়সে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক, ফাঁসিকাষ্ঠকেই বরণ করিল। সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে যে আপনাকে বলিদান দিল—ইহার সম্বন্ধে তুমি কি বলিবে? এস্থলে পাপপুণ্যের নিয়মানুসারে ত কোন কার্য্য হইল না। তুমি কি ধর্ম্ম-নিয়মের নিন্দা করিতে সাহসী হইবে? অথবা, কেমন করিয়া তাহার উচিত-প্রাপ্য অযাচিত পুরস্কার তাহাকে এই পৃথিবীতে প্রদান করিবে?

ভাবিয়া দেখিলে, এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

জড় কি অক্ষয়?

"তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
হারায় না কভু অণু পরমাণু।"

কবির এই উক্তিটির মধ্যে গভীর বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। অতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক বালুকণা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহচন্দ্রতারা ক্ষুদ্রবৃহৎ কোন বস্তুরই ক্ষয় নাই, এই মহাসিদ্ধান্তটিই আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন। প্রকৃতিতে প্রতিমুহূর্ত্তে জড়ের যে রূপান্তর চলিতেছে, তাহাতে কোন বৈজ্ঞানিকই জড় বা শক্তির ক্ষয় দেখিতে পান নাই।

আমাদের ক্ষুদ্র কর্ম্মশালাগুলিই কেবল অপচয়, লাভক্ষতি, এবং দুঃখদৈন্যে পূর্ণ। যে বিরাট কর্ম্মশালায় সহস্র সূর্য্যোপম জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতিসূক্ষ্ম জীবাণু পর্য্যন্ত ছোটবড় সকল বস্তুরই সৃষ্টি চলিতেছে, তাহাতে একটুও অপচয় নাই। কাজেই লাভ ক্ষতির হিসাব কাহাকেও রাখিতে হয় না। জড় ও শক্তি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াই, প্রকৃতির এই নিত্য-নূতন আনন্দমূর্ত্তি দেখাইতেছে, নিজেকে ক্ষয় করিয়া নয়। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের এই গভীর তত্ত্বটি গত শতাব্দীর পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানুগত প্রথায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞানের বর্ত্তমান সমৃদ্ধি ইহারি উপরে প্রতিষ্ঠিত।

পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশটি কি, তাহা জানিবার জন্য রসায়ন-শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে, পরমাণুর (Atoms) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন, এবং গন্ধক প্রভৃতি অধাতু মূলপদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকেই রসায়নবিদ্‌গণ পরমাণু বলিয়া আসিতেছেন। পরমাণুগুলিকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না। তার পর ইহাঁরা বলেন, প্রায় সত্তরটি মূল পদার্থের সত্তর জাতীয় পরমাণু যখন দুই-দুইটি, তিন-তিনটি বা ইহারো অধিক পরিমাণে একত্র হইয়া জোট বাঁধে, তখন এক একটি অণুর (molecule) গঠন হয়। আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের মতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিসই এই প্রকার বহুসংখ্যক অণুর যোগে উৎপন্ন। জল একটা যৌগিক পদার্থ। রসায়নশাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, জিনিসটা কোটী কোটী অণুর একটা প্রকাণ্ড সমষ্টি। ইহার প্রত্যেক অণুটি আবার দুইটি হাইড্রোজেনের এবং একটি অক্সিজেনের পরমাণুর যোগে উৎপন্ন। লৌহ একটি মূল পদার্থ। ইহাও কতকগুলি অণুর সমাবেশ মাত্র। পার্থক্যের মধ্যে যে, ইহার অণুগুলিতে অপর কোন মূল পদার্থের পরমাণু যুক্ত নাই। লৌহের এক একটি অণুতে ইহারি পরমাণু যুক্তাবস্থায় বর্ত্তমান।

পরমাণুগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া অণুর উৎপত্তি করে না, এবং অণুগুলিও একেবারে নিরেটভাবে থাকিয়া পদার্থের গঠন করে না। অণু বা পরমাণু একত্র হইলে তাহাদের মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যবধানগুলিকে সেই সর্ব্বব্যাপী ঈথারে পূর্ণ বলিয়া মনে করেন।

পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ ঐ পরমাণুরই নানাপ্রকার সংযোগ বিয়োগ দেখাইয়া আজকাল জড়ের অবিনশ্বরতা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক যেন একটি মোমবাতি পুড়িতেছে। কিছুক্ষণ আলোক দিয়া সেটি নিঃশেষে পুড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই ব্যাপারটি আমাদের স্থূল-দৃষ্টিতে ক্ষয় বলিয়া বোধ হইলেও, সত্যই তাহা ক্ষয় নয়। বাতির উপাদান এমন কতকগুলি রূপান্তর গ্রহণ করিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে যে, অবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি তাহার খোঁজ পায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সেই সকল রূপান্তরিত পদার্থ কৌশলে সংগ্রহ করিয়া বাতির যে একটি অণুও ক্ষয় পায় নাই তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেন্। কেবল বাতি নয়, পদার্থ মাত্রই যখন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকিয়া ক্ষয় পায়, দক্ষ রসায়নবিদ্ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের রূপান্তর দেখাইতে পারেন। আধুনিক রসায়নী-বিদ্যা জড়ের এই অবিনশ্বরতার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

জড়ের ন্যায় শক্তিরও যে ক্ষয় নাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহাও জানা গিয়াছে। জুল (Joule) হেলেম্‌হোজ (Helmholtz), রমফোর্ড (Rumford) এবং ডেভি প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ গত শতাব্দীতে এ সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এন্‌জিনের চুলোতে কয়লা পুড়িলে, কয়লার শক্তি একটুও ক্ষয় পায় না। উহাই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া কলকে গতিশীল করে। বিদ্যুতের শক্তি, বিদ্যুতের উৎপাদক কলে প্রযুক্ত কয়লার শক্তিরই রূপান্তর। দস্তা ও তাম্রফলক দ্রাবক-পদার্থে ডুবাইয়া যখন আমারা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি, তখন রাসয়ানিক শক্তি বিদ্যুতের রূপ গ্রহণ করিয়া দেখা দেয়। প্রকৃতির ভাণ্ডার যে পরিমাণ জড় এবং শক্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে তাহার এক কণারও ক্ষয় নাই। নানাপ্রকার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বহিঃপ্রকৃতিতে বিচিত্র কার্য্য দেখানো উহাদের একমাত্র কাজ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিশাল বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব এবং তাহার বিচিত্র লীলা কেবল জড় ও শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই চলিতেছে। এই দুইটিই বিজ্ঞানের পরম সত্য। ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধটা এমন নিগূঢ় যে, একের অভাবে অপরটি থাকিতে পারে না। শক্তিহীন জড় জগতে নাই; এবং জড় নাই অথচ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এপ্রকার ঘটনাও দেখা যায় না। জীবজগতে দেহ ও প্রাণের সম্বন্ধ যেমন অবিচ্ছেদ্য, বহির্জগতে জড় ও শক্তির সম্বন্ধেও কতকটা সেইপ্রকার। জড় চিরদিনই নিশ্চেষ্ট, শক্তি সর্ব্বদাই প্রাণময়। এই দুইয়ের যোগ হইলে, আমরা শক্তিকে শক্তি বলিয়া চিনিতে পারি, এবং জড়কে জড় বলিয়া জানিতে পারি।

বিশ্বের ভাণ্ডারে যে পরিমাণ জড় আছে, তাহা বাড়াইবার বা কমাইবার শক্তি মানুষের নাই। প্রকৃতির কার্য্যের সহিত আমাদের যে টুকু পরিচয় আছে, তাহাতেও জড়ের সৃষ্টি দেখা যায় না। কিপ্রকারে হঠাৎ একদিন জড় ও শক্তি উৎপন্ন হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছিল, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন্, সর্ব্বব্যাপী ঈথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তগুলিকে জড়কণিকা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন ঈথরের ন্যায় জিনিসে কোন প্রকারে আবর্ত্ত তুলিতে পারিলে, সেগুলিকে পার্শ্বস্থ অচঞ্চল ঈথর হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায়। সম্ভবতঃ অপার ঈথর সমুদ্রের এইপ্রকার ছোট ছোট আবর্ত্তগুলিই পৃথক্‌গুণ বিশিষ্ট হইয়া আমাদের নিকটে জড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈথরে আবর্ত্ত উঠিলে, তাহার লয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জড়ের অবিনশ্বরতারও একটা ব্যাখ্যান ইহা হইতে পাওয়া যায়। লর্ড কেল্‌ভিনের এই অনুমানটী লইয়া গত শতাব্দীর শেষে খুব আলোচনা চলিয়াছিল। জার্ম্মাণ পণ্ডিত হেলম্‌হোজও এই আলোচনার যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে অনুমানটি বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। স্বয়ং কেলভিনও ইহাতে কতকটা অবিশ্বাসী হইয়াছিলেন।

জড়ের যে উৎপত্তি নাই তাহা সুনিশ্চিত, কিন্তু ইহা যে একেবারে অক্ষয় সে সম্বন্ধে সম্প্রতি একটু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। রণজেনের রশ্মি (Rantgevn's Rays) ক্যাথোড্-রশ্মি প্রভৃতির আবিষ্কার এবং রেডিয়ম্ প্রভৃতি ধাতুর অদ্ভুত কার্য্য

এই সন্দেহকে ক্রমেই বদ্ধমূল করিতেছে।

প্রায় বায়ুশূন্য নলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইলে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম জড়কণা ঋণাত্মক-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া নলের ঋণাত্মকপ্রান্ত হইতে অপর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। পদ্মরাগমণি (Ruby) বা এলুমিনিয়াম ঘটিত কোন পদার্থ দ্বারা উহাদের গতি রোধ করিলে এগুলি একপ্রকার অনুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া পড়ে। এগুলি যে অণু বা পরমাণু নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আলোকের বেগে ধাবিত হইবার শক্তি কোন অণু পরমাণুতে অদ্যাপি দেখা যায় নাই, কিন্তু এগুলি সত্যই আলোকের সমান বেগে ছুটিয়া চলে। অধ্যাপক টমসনের (Sir J. J. Thomson) পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। সূক্ষ্ম গণনা এবং পরীক্ষায় ইনি একপ্রকার সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি এই অধ্যাপকটি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বিদ্যুৎপূর্ণ সূক্ষ্ম কণিকাগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের অন্ততঃ ১৭০০টি একত্র না হইলে সমবেত গুরুত্ব হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর সমান হয় না। টম্‌সন সাহেব কণিকাগুলিকে অতি-পরমাণু (Corpuscles) নামে আখ্যাত করিয়াছেন। পাত্রস্থিত বায়ুর অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের পরমাণু বিভক্ত হইয়া যে ঐ সকল অতি পরমাণুর সৃষ্টি করে, তাহা নহে। নলে যে কোন বায়বীয় পদার্থ রাখিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে ঠিক একই জাতীয় অতি-পরমাণুর উৎপত্তি হয়।

ইহা দেখিয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, স্বর্ণ-লৌহ প্রভৃতির পরমাণুগুলিকেই যে আমরা মূল পদার্থ বলিয়া আসিতেছিলাম তাহা ঠিক নয়। পরমাণুকে ভাগ করা চলে, এবং এই বিভাগ হইতে যে অতিপরমাণুর উৎপত্তি হয় তাহাই অবিভাজ্য ও মূল জড় পদার্থ। ইহাদের জাতিভেদ নাই, এবং আকার ও গুরুত্বে সকলেই সমান। বিচিত্র ভাবে এবং বিচিত্র সংখ্যায় মিলিত হইলে ইহারাই আমাদের পরিচিত এক একটি পরমাণুর উৎপত্তি করে। অক্সিজেনের এক একটি পরমাণুর গুরুত্ব হাইড্রোজেনের পরমাণুর ১৬ গুণ। যদি ১৭০০ অতি-পরমাণুর মিলনে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু জন্মায়, তবে উহারই ১৬ গুণ অতি-পরমাণু একত্র না হইলে, একটি অক্সিজেনের পরমাণুর উৎপত্তি হইবে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, অতি-পরমাণুগুলিতে যে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ থাকে তাহার কি হয়? ইহারও সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছে সম্ভবতঃ ঋণাত্মক অতি-পরমাণুর ন্যায় (Negative Corpuscles) ধনাত্মক-জড় কণাও আছে। ইহারই চারিদিকে যখন ঋণাত্মক অতি-পরমাণু যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়া মিলিত হয়, তখন দ্বিবিধ তাড়িতের মিলনের পরমাণুতে বিদ্যুতের চিহ্ন থাকে না, কিন্তু ঋণাত্মক অতি-পরমাণুর সংখ্যা যদি যথেষ্ট না হয় বা অধিক হয়, তখন পরমাণুতে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বিদ্যুতের প্রকাশ পাইয়া পড়ে।

ঋণাত্মক অতি-পরমাণুগুলিকে যেমন সাক্ষাৎ দেখা গিয়াছে, পদার্থের ধনাত্মক কণিকাগুলিকে আজও সে প্রকার দেখা যায় নাই। কিন্তু ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ এখন এত অধিক পাওয়া যাইতেছে যে তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। জড় পদার্থমাত্রই যে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত অতি-পরমাণুর মিলনে উৎপন্ন

তাহা এখন অনেকেই স্বীকার করিতেছেন।

জড় পদার্থের সংগঠন সম্বন্ধে এই বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তটি আধুনিক বিজ্ঞানে এক নূতন আলোক প্রদান করিয়াছে। ইহারই সাহায্যে অপর যে দুই চারিটি তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে সেগুলি আরও অদ্ভুত।

১৮৯৬ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল সাহেব (M. Bacquerel) ইউরেনিয়াম নামক ধাতু পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহা হইতে সর্ব্বদাই এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন। ফ্রান্সের মাডাম কুরি পিচ ব্লেণ্ডি নামক শিলা পরীক্ষা করিতে গিয়াও উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই শিলানির্গত তেজের প্রাখর্য্য পরীক্ষা করিয়া তাহা কেবল ইউরেনিয়ামের নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে পিচ্‌ব্লেণ্ডি শিলাতে ইউরেনিয়াম ছাড়া রেডিয়ম্, পলোনিয়াম্, এবং আক্‌টিনিয়াম্ নামক আরো তিনটি তেজ-নির্গমনক্ষম ধাতুর অস্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। এগুলির মধ্যে রেডিয়ামের তেজ যে পরিমাণে ও প্রাখর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা সকলেই দেখিয়াছিলেন। পরীক্ষায় আবার ইহাতে সুস্পষ্ট তিন প্রকার তেজের মিশ্রণ আবিষ্কার হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রথম তেজ যে সেই ঋণাত্মক-বিদ্যুতে পূর্ণ অতি-পরমাণু তাহা স্বয়ং মাডাম্ ক্যুরি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, এবং অপর আর একটিকে ধনাত্মক-বিদ্যুতের অতি-পরমাণু বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। তার পর তৃতীয় তেজটিকে লইয়া পরীক্ষা করায় তাহাতে অতি দ্রুত ঈথর কম্পনের সমস্ত লক্ষণ একে একে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে আলোকরশ্মি আজ কাল x'rays বলিয়া পরিচিত বৈজ্ঞানিকদিগের মতে রেডিয়মের তৃতীয় তেজ সেই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অবিরাম এই তিন জাতীয় তেজ বিকীরণ করার পর কোন পরীক্ষকই রেডিয়মের একটুও ক্ষয় দেখিতে পান নাই।

এই আবিষ্কারের পর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনে করিয়াছিলেন, তেজনির্গমনক্ষমতা কেবল রেডিয়মের নিজস্ব নয়। এই শক্তিটি জড়ের সাধারণ ধর্ম্ম। লি বন্ (Lee Bon) সাহেব এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। ইনি নানা প্রকার ধাতু লইয়া দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়া অনুমানটির সত্যতা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন। অনেক ধাতু এবং অধাতু যে রেডিয়মের ন্যায়ই তেজ বিকীরণক্ষম তাহা এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন।

রেডিয়ম্ হইতে নির্গত অতি-পরমাণুর কণা লইয়া আজকাল নানা প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। অল্প দিনের গবেষণায় এই সকল সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা আরও বিস্ময়কর। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড সাহেব (Rutherford) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তেজ বিকীরণ করার পর পদার্থের ক্ষয় ধরা না পড়িলেও তাহাতে জিনিসটার রাসায়নিক প্রকৃতি অনেকটা বদলাইয়া যায়। তা' ছাড়া যে অতি-পরমাণুগুলি নির্গত হয় তাহারও রাসায়নিক কার্য্য মূল-পদার্থের অনুরূপ দেখা যায় না। রেডিয়মের আণবিক গুরুত্ব ২২৫। অর্থাৎ একটি হাইড্রোজানের পরমাণু অপেক্ষা ইহার এক একটি পরমাণুর গুরুত্ব ২২৫ গুণ অধিক। কিন্তু দীর্ঘকাল অতি-পরমাণু ত্যাগ করার পর রেডিয়মকে সীসকের (Lead) ন্যায় লঘুতর পদার্থে রূপান্তরিত হইতে দেখা গিয়াছিল। সীসকের আণবিক গুরুত্ব ২০৬ এবং রাসায়নিক

প্রকৃতিও রেডিয়াম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রকারে একটি মূল পদার্থকে আপনা হইতেই আর একটি লঘুতর ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছেন। প্রাচীন রসায়নবিদ্‌গণ লৌহকে সুবর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য যে "পরশ পাথরের" অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন আজ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছেন। রেডিয়মের ক্রমিক বিয়োগে যখন সীসকের উৎপত্তি হইতেছে তখন তাহারই বিপরীত ক্রিয়ায় যে সীসক রেডিয়ম হইতেছে না এবং লৌহ স্বর্ণে রূপান্তরিত হইতেছে না এ কথা কখনই বলা যায় না।

যাহা হউক পূর্ব্ব বর্ণিত আবিষ্কারগুলির সাহায্যে এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরমাণু পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ নয়। অতি-পরমাণুই সূক্ষ্মতম মূলপদার্থ ইহাদেরই জটিল মিলনে এক একটি পরমাণুর উৎপত্তি হয়। তা'ছাড়া জড়ের ক্ষয় নাই এ কথাটা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল নয় তাহা উহা হইতে বুঝা যাইতেছে। প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুটি অতি-পরমাণু ত্যাগ করিয়া যখন নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তখন জড়কে কেমন করিয়া অক্ষয় বলা যায়? ক্ষয়জাত পদার্থ যদি নূতন জড়ের উৎপত্তি করিত তাহা হইলে জড়কে অক্ষয় বলা চলিত। কিন্তু পরীক্ষায় নূতন জড়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল এক প্রকার নূতন শক্তি (Intratomic energy) উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া অনেকেই বলিতেছেন যে, জড় সত্যই ক্ষয়শীল। ইহার বিয়োগে কেবল শক্তির উৎপত্তি হয় মাত্র। ইঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শক্তি ছাড়া আর কোন সত্যকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। শক্তিই অব্যয় ও অক্ষয় এবং ইহাই পৃথক পৃথক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জড় জীবের লীলা দেখায়।

অন্তরে বাহিরে।

অন্তরে চেতনা অনুভবে নানা
বাহিরে সে ধরে
নানামত রূপ,
অন্তরে বাহিরে নেহারে যে তারে
ঘুচে তার ভব
বন্ধনের দুখ।
ছিন্ন হয় তার নিদারুণ মোহ,
ভিন্ন আর তার নাহি থাকে কেহ,
আপনাতে তার মিটে হে সন্দেহ,
ফুটে হে তাহার
তুচ্ছ আশা সুখ।
চিত্ত মাঝে তার বিরাজে অভয়,
মুক্তি মাঝে তার বাঁধনের ক্ষয়,
নিত্য সনে তার সত্য পরিচয়,
চির সুখে তার
ভরি উঠে বুক।
পরশিয়া তায় আলোকে আঁধারে,
বরষে অমৃত শত শত ধারে,
অচেতন মাঝে চেতন আকারে
ভাসি উঠে কার
চির হাসি মুখ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

ভগবান প্রার্থনার উত্তর দেন।

জানি না পূজা অর্চ্চন মনোমত উপায়ন
যাহে তুষ্ট হয়েন ঈশ্বর।
জানি এই মাত্র আমি দয়াময় বিশ্বস্বামী
প্রার্থনায় অর্পেণ উত্তর॥
ঐকান্তিক ভক্তিভরে যে জন প্রার্থনা করে
ব্যর্থ কভু হইবার নয়।
কখন্ সে ভগবান প্রার্থনায় দেন কান
নাহি জানি নির্দ্দিষ্ট সময়॥
নিশ্চয় জানি কেবল আসিবে প্রার্থনা ফল
বিলম্বে অথবা শীঘ্রগতি

সে হেতু ধৈরজ ধরি' এস হে প্রার্থনা করি
জেন শুনিবেন বিশ্বপতি ॥
যাহে মোর অভিলাষ মাগিয়া তাঁহার পাশ
জানি না আসিবে কি আকারে।
যাঁর জ্ঞানে মোর জ্ঞান তুলনে তৃণ সমান
সমর্পিনু বিচারিতে তাঁরে ॥

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ।

নানা কথা।

ধর্ম্ম-সঙ্ঘ।—আগামী ৯ই ১০ই ও ১১ই জানুয়ারিতে এলাহাবাদ নগরে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের ধর্ম্মমত আলোচনা করিবার জন্য বিরাট সভা বসিবে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ইহার একজন বিশেষ উদ্যোগী। উদারভাবে এইরূপ আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে যে বিশেষ কল্যাণকর তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভারতীয় বৌদ্ধ-প্রচারক।—Dr. J. Takakasu নামক জনৈক পণ্ডিত জাপানের প্রাচীন সরকারি কাগজ দৃষ্টে জানিতে পারিয়াছেন যে ৭৪৯ খৃ অব্দে ভারতীয়গণের জাপানে গতিবিধি ছিল। আর একজন খ্যাতনামা জাপানী পণ্ডিত এইরূপ কয়েকটি ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারকের নাম উল্লেখ করেন, যাঁহারা সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে গমন করিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে বোঁধিসেনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চীনদেশে দিয়া তথা হইতে ৮৩৬ অব্দে জাপানে যান। জাপানী সম্রাট তাঁহাকে (Sako) অর্থাৎ ধর্ম্মযাজক এই উপাধি প্রদান করে। অনেকের মতে তাঁহার সমাধি অদ্যাপিও জাপানে বর্ত্তমান। এরূপ অনেক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত চীনদেশে গিয়া একেবারে বসবাস করিয়াছিলেন। প্রবুদ্ধ ভারত, নবেম্বর।

দীক্ষা।—বিগত ২১শে অগ্রাহায়ণ প্রভাতে শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী, শ্রীমান্ হেরম্ব চন্দ্র দাস ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরলা দাসী, আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বালিগঞ্জস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম দীক্ষার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করায় তিনি তাঁহাদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কুশলে ধর্ম্মে পরিচালিত করুন, ইহাই তাঁহার চরণে একান্ত প্রার্থনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত তিনকড়ি আঢ্য, শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্যারিলাল সেন, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র শেঠ ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাধুখাঁ বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, ভগবান ইঁহাদের আত্মাকে উন্নত করুণ।

উৎসব।—বিগত ৩০এ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রাতে শ্রীঅশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অতুলচন্দ্র সরকার উপাসনার কার্য্য করেন; বৈকালে পারায়ণের কার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন করেন। সন্ধ্যার পরে আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও স্থানীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় উপাসনাদি করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সমাগত দর্শক ও উপাসক সংখ্যা প্রায় ৫০০ হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে প্রায় ৪০০ ব্যক্তি কার্য্যাধ্যক্ষের বাটীতে আহারাদি করেন। বেহালা ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ একটি জলন্ত উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

হিন্দুদর্শন।—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ সাহিত্য-সভায় দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে যে গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা করেন তাহার ইংরাজি অনুবাদ খণ্ডাকারে উক্ত সভা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পণ্ডিত কামাখ্যানাথ দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। অনুবাদ ও সুন্দর হইতেছে।

প্রদর্শনী।—এলাহাবাদেতে প্রদর্শনী বসিয়াছে। ভারতীয় বিশেষ দ্রষ্টব্য দ্রব্য-সম্ভার এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। দেশীয় অত্যুজ্জ্বল কারুকার্য্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইতে হয়। কি দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র কি দেশীয় শিল্প-চাতুরী যতই ইহাদের উপর আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, ততই দেশের ও জন-সমাজের মঙ্গল।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১, শ্রাবণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩০০৮৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩১৬৬।/৩
সমষ্টি	...	৩৪৬৭। ৬
ব্যয়	...	৪১০৮০
স্থিত	...	৩০৫৬॥ ৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৪৫৬॥৬

৩০৫৬॥৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	...	২১০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয় ২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত নরনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৲

২১০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫২৶০
পুস্তকালয়		১০৵৩
যন্ত্রালয়	...	৩৲
ব্রঃ সঃ স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		২৫॥৵০
সমষ্টি	...	৩০০৮৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৪ ৫৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৫৵০
পুস্তকালয়	...	২১৵৯
যন্ত্রালয়	...	১৩২৶০
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৫।৶৬
ইলেকৃট্রিক্ লাইট	...	২৮০
সমষ্টি		৪১০৮০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

একাশীতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ বুধবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনায়।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সপ্তদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।
৮১০ সংখ্যা
১৮৩২ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, মঙ্গল।

(ষষ্ঠ উপদেশের অনুবৃত্তি)

এই জগতের সমস্ত নিয়মই সাধারণ নিয়ম; কাহারও জন্য এই নিয়মের তিলমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির পাপ পুণ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই নিয়ম-সকল আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি বদ্ মেজাজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, কোন দুর্জ্ঞেয় অথচ সুনিশ্চিত ভৌতিক নিয়মই তাহার কারণ। কি জীব জন্তু, কি বৃক্ষলতা, সকলেই এই নিয়মের অধীন। যে নিজে নির্দ্দোষী তাহাকেও হয়ত চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিতে হয়। মহামারী, ব্যাপক রোগ, মহা-বিপদ—কি সাধু কি অসাধু—সকলকেই যদৃচ্ছাক্রমে আক্রমণ করে।

মানব-ন্যায়বিচার, নির্দ্দোষীকে বড় একটা দণ্ডিত করে না বটে, কিন্তু অনেক সময়ে দোষীকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেয়। তা ছাড়া মানুষ-বিচারক মানুষের অনেক দোষ আদৌ জানিতেই পারে না। কত অপরাধ, কত নীচ অপকর্ম্ম অন্ধকারের আবরণে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং দণ্ডনীয় হইলেও তাহার জন্য অপরাধী দণ্ডিত হয় না! আবার এরূপ নিঃস্বার্থ পর-সেবার কত কাজ গোপনে অনুষ্ঠিত হয়—ঈশ্বরই যাহার একমাত্র সাক্ষী ও বিচারকর্ত্তা। অবশ্য, পাপ পুণ্যের সাক্ষী অন্তরাত্মার দৃষ্টি হইতে কিছুই এড়াইয়া যায় না, এবং অপরাধী-আত্মা স্বকীয় অপরাধের জন্য অনুতাপের যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু অনুতাপের মাত্রা, সকল সময়ে অপরাধের মাত্রার অনুরূপ হয় না। এই অনু-তাপবোধের তীব্রতা, অনেকটা অন্তঃকর-ণের কোমলতার উপর, শিক্ষার উপর, অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। এক কথায়, এই জগতে সাধারণত পাপপুণ্যের নিয়মানুসারে কাজ হইলেও, উহা গণিতের গণনার ন্যায় "কড়ায়গণ্ডায়" ঠিক্ হয় না।

ইহা হইতে কী সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? এই জগৎ সুগঠিত নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত? না, তাহা হইতেই পারে না,—আসলেও তাহা ঠিক্ নহে। কারণ, ইহা নিঃসংশয় যে, এই জগতের যিনি স্রষ্টা তিনি মঙ্গলময়, ও ন্যায়বান্; তাছাড়া, সাধা-

রণত আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে একটা সুশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। যে সুশৃঙ্খলা আমরা চতুর্দ্দিকে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই, কতকগুলি ঘটনাকে আমরা তাহার সামিলে আনিতে পারিনা বলিয়াই কি সেই সুশৃঙ্খলাকে একেবারে অস্বীকার করিতে হইবে?—ইহা যার পর নাই অসঙ্গত। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এখনও টিকিয়া আছে—অতএব ইহা সুগঠিত।

ভল্‌টেয়ারের ন্যায় এক দল বলেন, জগৎ ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাইতেছে; আবার একদল বলেন, জগতের কিছুই খারাপ নহে—সবই ভাল। একটা বিশ্বমঙ্গলবাদ; আর একটা,—বিশ্ব-অমঙ্গলবাদ। জগতের তথ্যসমষ্টি বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উহা মঙ্গলবাদ, অপেক্ষা অমঙ্গলবাদেরই প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়। এই দুই বিপরীত মতবাদের মধ্যস্থলে বিশ্বমানব, পারলৌকিক আশাকে স্থাপন করিয়াছে। বিশ্বমানব দেখিয়াছে যে, নিয়মের কতকগুলি ব্যতিক্রমস্থল আছে বলিয়া একটা মূল-নিয়মকে অগ্রাহ্য করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; তাই বিশ্বমানব এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, ঐ সকল ব্যতিক্রম স্থলগুলিকে একদিন নিয়মের মধ্যে আনা যাইতে পারিবে, একদিন তাহার কোনপ্রকার প্রতিবিধান অবশ্যই হইবে। হয় এই সিদ্ধান্তটিকে স্বীকার করিতে হইবে, নয় পূর্ব্বস্বীকৃত দুইটি মহাতত্ত্বকে অস্বীকার করিতে হইবে। সেই দুইটি মহাতত্ত্ব কি? না, ঈশ্বর ন্যায়বান এবং পাপপুণ্যের নিয়মটি অনতিক্রম্য ও অকাট্য।

এই দুইটি মহাতত্ত্বকে অস্বীকার করিলে, বিশ্বমানবের সমস্ত বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটিত করা হয়।

আবার এই দুইটি মহাতত্ত্বকে স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে পরজন্মের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়।

কিন্তু দেহ ধ্বংস হইয়া গেলেও, আত্মা থাকিবে—ইহা কি সম্ভব?

বস্তুত,—যে নৈতিক আত্মা, ভাল মন্দ কাজ করিয়া দণ্ডপুরস্কারের পাত্র হয়, সেই নৈতিক আত্মা একটা জড়-শরীরের সহিত এখানে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই আত্মা শরীরের সহিত একত্র বাস করিতেছে, কিয়ৎপরিমাণে শরীরের উপর নির্ভর করিয়া আছে, তথাপি সেই আত্মা শরীর নহে। শরীর কতকগুলি অংশে বিভক্ত; শরীরের বৃদ্ধিও হইতে পারে, হ্রাসও হইতে পারে; শরীর বিভাজ্য,—শরীর অসীম অংশে বিভক্ত হইতে পারে। বিভাজ্যতাই শরীরের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু সেই যে একটা-কিছু যে আপনাকে আপনি জানে, যে আপনাকে "আমি" বলিয়া, "অহং" বলিয়া অভিহিত করে, যে আপনার স্বাধীনতা, আপনার দায়িত্ব অনুভব করে, সে কি ইহাও অনুভব করে না যে, তাহার "আমি"র মধ্যে কোন খণ্ডতা নাই, কোন খণ্ডতা থাকা সম্ভবও নহে,—সে একটি অখণ্ড "আমি"? "আমি" কি কখন কম "আমি" কিংবা বেশী "আমি" হইতে পারে? "আমি"র কি অর্দ্ধভাগ হইতে পারে?—সেকি ভাগ হইতে পারে? আমার "আমি"কে আমি কখনই ভাগ করিতে পারি না। হয়, এই "আমি" যাহা আছে তাহাই আছে—নয়, এই "আমি" একেবারেই নাই। এই "আমি" বিচিত্র ব্যাপার প্রকটিত করিলেও, ইহা যে আমি সেই আমি,—ইহার তদাত্মতা সম্পূর্ণরূপ বজায় থাকে। "আমি"র এই তদাত্মতা, এই অভাজ্যতা, এই অখণ্ডতাই "আমি"র আধ্যাত্মিকতা। অতএব অধ্যাত্মিকতাই "আমি"র মূলগত ভাব। "আমি"র

এই তদাত্মতা সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সহিত, আত্মার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধীয় বিশ্বাসটি জড়িত রহিয়াছে; তাহা কোন জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব অস্বীকার করিতে পারে না। অতএব আমরা যখন বলি, আত্মার সহিত শরীরের মূলগত প্রভেদ আছে—ইহা শুধু একটা অনুমানের কথা নহে। তা-ছাড়া, আমরা যখন আত্মার কথা বলি, তখন এই "আমি"র কথাই বলিয়া থাকি। মনন ও ইচ্ছাশক্তি এই দুইটিই "আমি"র উপাধি। অতএব আমি মনন করিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি—এইরূপ আমার যে আত্মচৈতন্য,—এই আত্মচৈতন্যের সহিত "আমি"র কোন প্রভেদ নাই। কোন আত্মচৈতন্যহীন জীবের আমিত্ব থাকিতে পারে না। এই আমিত্বই তাদাত্ম্যবিশিষ্ট, অখণ্ড ও অমিশ্র। উপাধির দ্বারা "আমি" পরিপুষ্ট হইলেও, "আমি"র বিভাগ হয় না! এই "আমি" অবিভাজ্য, ধ্বংসহীন, এবং বোধ হয় অমর। অতএব ঐশ্বরিক ন্যায়ের সার্থকতার জন্য যদি আত্মার অমরত্ব নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে এ আবশ্যকতা অসম্ভব নহে। আত্মার আধ্যাত্মিকতাই, আমাদের অমরতার অবশ্যম্ভাবী ভিত্তি। পাপপুণ্যের নিয়মটিই ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ। প্রাগুক্ত আধ্যাত্মিকতার প্রমাণটিকে দার্শনিক প্রমাণ এবং পাপ-পুণ্যের প্রমাণটিকে নৈতিক প্রমাণ বলা যায়। এই নৈতিক প্রমাণটাই বেশী প্রসিদ্ধ, বেশী লোকপ্রিয়, বেশী প্রত্যয়-জনক ও হৃদয়গ্রাহী।

সকল বস্তুরই একটা সীমা আছে। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে—এই মূল সূত্র-টির যেরূপ কোন স্থলেই অন্যথা হয় না, সেইরূপ সকল বস্তুরই একটা সীমা আছে—এই মূল সূত্রটিরও কোথাও ব্যতিক্রম হয় না। অতএব মানুষেরও একটা সীমা আছে। এই সসীমতা, মানুষের সমস্ত চিন্তায়, সমস্ত ব্যবহারে, সমস্ত ভাবে, সমস্ত জীবনে প্রকাশ পায়। আবার আর এক দিকে, মানুষ যাহাই করুক, যাহাই অনুভব করুক, যাহাই চিন্তা করুক না কেন, মানুষ অসীমকেই চিন্তা করে, অসীমকেই ভালবাসে, অসীমের দিকেই তাহার প্রবণতা। এই অসীমের অভাববোধই,—বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের প্রধান উদ্দীপক, সমস্ত আবিষ্ক্রিয়ার মূলীভূত কারণ। প্রেমও অসীমে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে। যাত্রারম্ভে প্রেম কতকগুলি আপাত-রম্য জ্বলন্ত সুখ সম্ভোগ করে বটে, কিন্তু সেই সুখের সহিত যে গুপ্ত গরল মিশ্রিত থাকে, তাহাতে করিয়া মানুষ পার্থিব সুখের অতৃপ্তি ও শূন্যতা শীঘ্রই অনুভব করে। অনেক সময়ে তাহার সকল সৌভাগ্যের মধ্যে, সকল সুখের মধ্যে, একটা অতৃপ্তি আসিয়া, নৈরাশ্য আসিয়া, তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়।—এইরূপ অতৃপ্তি, এইরূপ নৈরাশ্য কোথা হইতে আইসে? যদি কাহারও অন্তর্দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিবে,—সংসারের কোন বস্তুই যে তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না, তাহার কারণ,—তাহার প্রাণের বাসনা আরও উচ্চ-তর, অসীম পূর্ণতার প্রতিই তাহার আন্ত-রিক স্পৃহা। মানুষের চিন্তা ও প্রেমের যেমন সীমা নাই, সেইরূপ মানুষের চেষ্টা উদ্যমেরও সীমা নাই। মানুষের চেষ্টা উদ্যম কোথায় গিয়া থামিবে, ইহা কি কেহ ব-লিতে পারে? ইহলোকের সহিত আমাদের একরকম চেনা-পরিচয় যদি হইয়া থাকে তবে শীঘ্রই আমাদের লোকান্তরে যাওয়া আবশ্যক হইবে। মানুষ অনন্ত পথের যাত্রী, অনন্তকে মানুষ ক্রমাগতই অনুসরণ করি-তেছে। মানুষ অসীমের ধারণা করিতেছে,

অসীমকে অনুভব করিতেছে,—এমন কি, অসীমকে আপনার অন্তরে বহন করিতেছে বলিলেও হয়। অতএব অসীম ছাড়া মানুষের আর কোন্ দিকে গতি হইতে পারে? ইহা হইতেই মানুষের সেই অমরত্বের দুর্নিবার অনুভূতি, সেই পরলোকের বিশ্বজনীন আশা—যাহা সকল ধর্ম্ম, সকল কাব্য,সকল ঐতিহ্য সাক্ষ্য দিতেছে। অসীমের দিকেই আমাদের প্রবল প্রবণতা। এই অসীমের পথে মৃত্যু আসিয়া আমাদের যাত্রা ভঙ্গ করিয়া দেয়; আমাদের জীবনের কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে। অতএব মৃত্যুর পরেও কিছু আছে ইহাই সম্ভব। কেন না,মৃত্যুতে আমাদের কিছুরই পরিসমাপ্তি হয় না। এই ফুলটিকে দেখ, এই ফুলটি কাল আর থাকিবে না। আজই ইহা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে। এটি যে-জাতীয় ফুল, সেই জাতীয় ফুলের পক্ষে ইহা যতটা সুন্দর হইবার তাহা হইয়াছে; ইহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আমার যে পূর্ণ পরিণতি, আমার যে নৈতিক পরিণতি, তাহার সম্বন্ধে আমার একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে। যাহার দুর্জ্জয় অভাব আমি অনুভব করি, এবং যাহার জন্য আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়, সেই পূর্ণপরিণতি পাইবার জন্য আমার কত আগ্রহ ও কত চেষ্টা; কিন্তু ইহলোকে সে পূর্ণতায় আমি কখনই উপনীত হইতে পারি না, কেবল সেই পূর্ণতা লাভের আশামাত্র আমার মনে থাকিয়া যায়। এই আশা কি একদিন পূর্ণ হইবে না? এই আশা কি একটা মিথ্যা আশা? আর সকল জীবই স্বকীয় জীবনের পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, আর শুধু মানুষই কি তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে? জীবের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহার প্রতিই কি এইরূপ অবিচার হইবে? মানুষ যদি অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, তাহার সমস্ত সহজসংস্কার যে লক্ষ্যের প্রতি তাহাকে আহ্বান করিতেছে সেই লক্ষ্য যদি তাহার সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সে ত এই সুব্যবস্থিত সৃষ্টির মধ্যে একটা অস্বাভাবিক সৃষ্টিছাড়া জীব। অতএব, আত্মার অমরত্ব ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান আর কিছুতেই হইতে পারে না। আমাদের মতে,—আমাদের সমস্ত বাসনার—সমস্ত চিত্তবৃত্তির এই যে অসীমের দিকে প্রবণতা, ইহা আত্মার অমরত্বের নৈতিক প্রমাণকে ও দার্শনিক প্রমাণকে আরও সুদৃঢ় করে।

(ক্রমশঃ)

গীতার পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা, তোমরা গীতা পরীক্ষার প্রশ্ন সকল যেরূপ ভাবে উত্তর দিয়াছ এবং যেরূপ মনোযোগ এবং যত্নের সহিত তাহা পাঠ করিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিও গীতা মন্ত্র পাঠ মাত্র নয়, তাহা সাধনা, গীতাভ্যাসের সার্থকতা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নয়, জীবনের পরীক্ষায়। এই মন্ত্র বলে তোমরা যদি মৃত্যু-ভয়, মৃত্যু-শোক অতিক্রম করিতে পার, যদি ফলাফল নিরপেক্ষ হইয়া নিষ্কাম ভাবে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পার, আদ্যন্তবন্ত অনিত্য আর্থিক বিষয়ের উর্দ্ধে শাশ্বত পরমার্থতত্ত্ব উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হও, তবেই বুঝিব তোমাদের গীতাভ্যাসের ফলোদয় হইয়াছে। গীতা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া কর্ম্মত্যাগ অনুমোদন করেন না,

নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানই গীতার বীজ-মন্ত্র।

গীতার যোগসাধন প্রণালী তোমরা পাঠ করিয়াছ, সে সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে দু একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। গীতানুমোদিত যোগের নিয়ম পালন আমাদের সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে সামান্যত এইটুকু বলা যাইতে পারে, অহোরাত্র নিরন্তর আমরা যে বিষয়-চিন্তা বিষয়-ধ্যানে মগ্ন থাকি তাহা উচিত নয়। এ জীবনে পশুত্ব অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে তাই বিষয় কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া বিরলে একান্তে দিনে সপ্তাহে কিম্বা মাসে একবারও কিয়ৎকালের জন্য আত্মানুসন্ধান আবশ্যক। আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে সতত যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। যোগসাধনের প্রথম সোপান আত্মশক্তি অর্জ্জন। কেন না আত্মাই আত্মার বন্ধু, এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। যিনি আত্মজয়ী আত্মবান তিনি আত্মার বন্ধু, যিনি অনাত্মবান আত্মজয়ে অক্ষম তিনিই আত্মার বৈরী।

গীতায় তোমরা যে দুঃখহা যোগের কথা পড়িয়াছ তাহা নিত্য নিয়ত স্মরণ রাখিও।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

তিনিই দুঃখহারী যোগ লাভ করেন, যিনি আহার বিহার কর্ম্মচেষ্টা নিদ্রা জাগরণ সকল বিষয়ে যুক্ত অর্থাৎ সংযত; তোমরাও এই দুঃখহা যোগে অভ্যস্ত হও, মিতাহারী, মিতাচারী হইয়া স্বাস্থ্যসুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

আমাদের এই যে মানব জীবন তাহা দুঃখ-বিপদসঙ্কুল। তাই আমার অন্যতম আশীর্ব্বাদ তোমরা যোগীশ্রেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা এবং অভ্যাস কর, তোমাদের মমতা তোমাদের সহানুভূতি বিশ্ব-ব্যাপিনী হউক, আত্ম-পরের তারতম্য ভুলিয়া যাও; তোমরা শ্রদ্ধাবান এবং অনন্যশরণ হইয়া সেই পরম পুরুষকে ভজনা কর, সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্ব নিয়ামক তিনি তোমাদের সকল অভাব মোচন করিবেন। এই সম্বন্ধে গীতায় এই দুইটি শ্লোক মনে রাখিও :—

(১) আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।

(২) যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।

আত্মশক্তি এবং ভগবদ্ভক্তিই জীবন পথে মানবের একান্ত সম্বল। ধন মান স্বাস্থ্য সুখ কিছুই অবিনশ্বর নহে, আমাদের হৃদয়ের বল তাহাও অক্ষয় নহে; কেবল চিরন্তন সেই পরমপুরুষের করুণা এবং তাঁহারি মঙ্গল নিয়ম। আত্মশক্তি অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনা অপেক্ষা এক উচ্চতর শক্তির উপর নির্ভর ভিন্ন দুর্ব্বল মানবের আর অন্য গতি নাই। চারিদিকেই এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর বিষয় সমূহের মধ্যে একমাত্র তিনিই মানবের অটল চির নির্ভর। যখন বিঘ্ন বিপদ আক্রমণ করে, বন্ধুজন বিমুখ হয়েন, এতদিন যাহা কিছু অবলম্বন ও লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিলাম তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, তখন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারি। তিনিই সেই পরম পদ যাহা আশ্রয় করিতে পারিলে গুরুতর দুঃখও আমাদের বিচলিত করিতে পারে না। তবেই আমরা সেই যোগীর মত হইতে পারি যিনি সংসার বাত্যায় বিক্ষুব্ধ নহেন,

"সংসার দুর্দ্দিনে ঝড় অসামান্য ঘোর
দিবারাত তাঁহার উপরে করে জোর;

অস্থির আশ্রিত গাছপালা অতিশয়
অচল অটল তবু একই ভাবে রয়।"

যেমন কোন অভ্রভেদী পর্ব্বত বক্ষে বজ্র বিদ্যুৎ বর্ষণের উপদ্রব সহ্য করে, কিন্তু তাহার শিখর দেশ চিরদিনই সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত থাকে, আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের জীবনও সেইরূপ হউক। শান্ত হও, সংযত হও, কর্ত্তব্যে চিরদিন অবিচলিত থাক, আনন্দ সঞ্চয় কর। ভগবানের প্রতি চিত্ত স্থির রাখিয়া তাঁহার নিয়মিত ধর্ম্ম পালন করিয়া যাও।

উৎসব।

মনুষ্য স্বভাবতঃ উৎসবাকাঙ্ক্ষী—আনন্দের ভিখারী। সকলে মিলিয়া উৎসবানন্দ উপভোগ করিবার জন্য তাহার আন্তরিক ব্যাকুলতা। আপনাকে লইয়া উৎসব হয় না, নিরবচ্ছিন্ন নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া উৎসব হয় না। বন্ধু বান্ধব চাই, প্রতিবেশীমণ্ডলী চাই, স্বদেশ বিদেশস্থ আত্মীয় স্বজন চাই; সকলে মিলিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে না পারিলে উৎসব হয় না। পরস্পরের মধ্যে আনন্দের বিনিময়, হাস্যোল্লাসের বিনিময়, উদারভাবে একই লক্ষ্যের প্রতি সমবেত দৃষ্টি-স্থাপন, একই ভাবের ভাবুক হওয়া, ইহা না হইলে উৎসব হয় না। এই যে শারদীয় উৎসব, এই যে মুসলমানের পর্ব্ব, এই যে খৃষ্টানের নিকট ঈশার জন্মদিন, এই যে বৌদ্ধগণের নিকট বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাবদিবস, এই যে গৌরাঙ্গের জন্ম ও তাঁহার দীক্ষার দিন ও তাঁহার অন্তর্দ্ধানের শুভক্ষণ, যখন তৎতৎ ধর্ম্মাবলম্বী উহা আনন্দ ও আশার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া ভগবৎচরণে প্রণত হয়, ঐ দিনের গুরুত্ব যখন সকলে মিলিয়া অনুভব করে, জগতের তুচ্ছ বস্তুর কথা ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়া অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি পবিত্রার ভাব কলিকালে জাগ্রত হইয়া তোলে, স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া পরসেবায়, আত্মীয়-স্বজনের পানভোজন-ব্রতে, দুঃখীও ক্ষুধার্ত্তকে অন্নমুষ্টি দানে প্রবৃত্ত হয় তখনই উৎসব সুসম্পন্ন হয়। উৎসব দুর্ব্বলকে সবল করে, মোহাক্রান্তকে জাগ্রত করে, পাপীকে কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করে, শোকাক্রান্তকে অভয় দান করে, নিরুৎসাহকে উৎসাহিত করে, জড়েতে চৈতন্য সঞ্চার করে, সকলকে ধর্ম্মের দিকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। উৎসব ঈশ্বরের বিশেষ দান। উৎসবানন্দ উপভোগ করিবার জন্য মানবের স্বাভাবিক পিপাসা। উৎসব যে করিতে হইবে,এ শিক্ষা মানুষকে কেহ কোন যুগে প্রদান করে নাই। হৃদয়ের সুকোমল তন্ত্রী গুলিকে মধ্যে মধ্যে যে ঝঙ্কৃত করিতে হয়, এ কথা কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই। পক্ষী-শাবককে মুক্ত গগণে বিহার করিবার জন্য যেমন শিক্ষা দিতে হয় না, নির্ম্মল আকাশ সন্দর্শন করিলেই যেমন তাহার সদ্যোজাত পক্ষগুলির ভিতরে অস্থিরতার আপনা হইতে সঞ্চার হয়, তেমনি উৎসবে ডুবিয়া অমৃতানন্দ উপভোগ করিবার জন্য মানবের অন্তর্নিহিত তৃষা। প্রচীন মানব এইভাবেই উৎসবানন্দ উপভোগ করিয়াছে, অমৃতপানে এইভাবেই আপ্তকাম হইয়াছে, বিভোর হইয়া গিয়াছে।

আজকালকার দিনে উৎসবের ভিতরে আমরা আপনাদের দোষে যতই কেন মলিনতা সঞ্চয় করি না, ইহার গাত্রকে যতই কেন কলঙ্কিত করি না, ইহার গৌরবকে যতই কেন ম্লান করিয়া ফেলি না, উৎসব চিরকালই স্বর্গীয় আনন্দের উৎস। প্রকৃতভাবে ইহাকে সম্ভোগ করিতে পারিলে,হৃদ-

য়ের কোমলবৃত্তি গুলিকে উৎসব উপলক্ষে বিকশিত করিতে পারিলে, অমৃতরসে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয় না।

প্রাচীন যুগে মানব যে ভাবে উৎসব উপভোগ করিতেন, যাঁহারা যে ভাবের ভাবুক হইয়া উৎসবে ডুবিতেন, বর্ত্তমানে তাহার অন্তরায় ঘটিলেও, গতানুগতিকের ন্যায় উৎসবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রবৃত্ত হইতে হইলেও, আমরা যতই কেন কঠোর হৃদয় হই না, উৎসব বিফলে অতিবাহিত হয় না। উৎসব যাঁহাদের প্রাণের সামগ্রী, ভক্ত হৃদয়ের নিজস্ব ধন, উৎসব আনন্দে যখন তাঁহারা প্রমত্ত হইয়া উঠেন, জ্বলন্ত উৎসাহে যখন তাঁহারা ভাস্বর হইয়া থাকেন, মুক্তহস্তে অকাতরে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন, দারিদ্র-বিমোচনে বদ্ধ-পরিকর হন, সকাতরে ঘন ঘন ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন, পূজার্চ্চনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া তাঁহাতে ডুবিয়া যান, তখন তাঁহাদের সে মূর্ত্তি—সে ভক্তি-গদগদভাব, চক্ষু হইতে প্রবাহিত সে দরদর ধারা, নাস্তিকের—ঘোর পাপীর—সংসারবিমুগ্ধ দিশাহারার পাষাণপ্রতিম হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া দেয়, তাহাদিগকে সচকিত করিয়া তোলে, জীবনের আদর্শকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়।

আমরাত দিনে নিশীথে ঈশ্বরের উপাসনা করি, খৃষ্টানত প্রাতে সায়াহ্নে ঈশ্বরের প্রসাদ ভিক্ষা করে, মুসলমানত প্রতিদিন পাঁচবার আরাধনা করে, কিন্তু তাহা সত্বেও তাহারা উৎসব চায়। নিত্যকর্ম্মত আমাদের মধ্যে আছেই, কিন্তু নৈমিত্তিক সাধনা চাই। সেই নৈমিত্তিক পূজাই উৎসবের নামান্তর মাত্র। উৎসব মনুষ্যের ধর্ম্মজীবনকে জাগাইয়া রাখে। একটি ঘড়িকে চালাইয়া দাও, দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে তাহা আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইবে, ইহাই জড়ের ধর্ম্ম। তাহাকে সচল করিতে হইলে দম দিবার আবশ্যক হয়। স্প্রীংএর এই যে আবর্ত্তন, তাহারই বলে ঘটিকাযন্ত্র আবার চলিতে থাকে। ধর্ম্মের সহিত মানবাত্মার স্বাভাবিক যোগ থাকিলেও, বাহির হইতে তাহাকে উত্তেজনা দিতে হয়, তাহা না হইলে সংসারের ঘোরে পড়িয়া তাহার চৈতন্যের অভাব হইয়া পড়ে। সেই অসাড়তা দূর করিবার জন্য তীর্থদর্শন, শাস্ত্রপাঠ, সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা আছে এবং তাহার সঙ্গে উৎসবের ব্যবস্থা সকল জাতির ভিতরে সকল জনসমাজের ভিতরে বিদ্যমান। উৎসবের আবেগে মনুষ্যজীবন যেরূপ সুপথে পরিচালিত হইবার সুবিধা হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। নৌকাত হালবাহীর তাড়নে জল কাটিয়া লক্ষ্যাভিমুখে গমন করে, কিন্তু তাহার উপরে বায়ুর আনুকূল্য পাইলে সে যেমন দ্রুতবেগে উদ্দেশ্য স্থানে সহজে উপনীত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। আমাদের প্রতিদিনের সাধনা নিত্য-উপাসনা সম্বন্ধেও ঠিক তাই। উৎসবের অনুকূল বায়ুর স্পর্শে আমাদের আত্মার বন্ধন যেরূপ সহজে শিথিল হইয়া আইসে, এমন আর কিছুতেই নহে। সাধারণ মনুষ্যের উপরে উৎসব আশ্চর্য্য রূপ কার্য্য করে, তাহাদের হৃদয়ের কোমল বৃত্তি গুলি উৎসবের প্রভাবে যেরূপ সহজে খুলিয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নহে।

আমাদের সমক্ষে ১১ই মাঘের পবিত্র দিন আসিতেছে। আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরদূরান্তরে কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতরে অবস্থান করিতেছি, ঐকিক সাধনার উপরে আমাদের ধর্ম্মজীবন নির্ভর করিতেছে। যখন সকলে মিলিয়া এককণ্ঠে সমস্বরে ঈশ্বরের

নাম কীর্ত্তন করিব, তখন ঈশ্বরের বিশেষ প্রসাদ আমাদের মস্তকের উপরে অবতীর্ণ হইবে। যাঁহারা সাধনে সমুন্নত তাঁহাদের পুণ্য হৃদয়ের পুণ্য মলয়সমীরণ স্পর্শে আমরা ধন্য হইব, এই আশায় উৎসব-দিন প্রতীক্ষা করিতেছি। যিনি উৎসবের দেবতা তিনি আমাদের হৃদয়ের জড়তা অপসারিত করিয়া দিবেন এই আশায় প্রাণ ধারণ করিতেছি। পবিত্র উপদেশ ও মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণে আমরা স্বর্গীয় অমৃতের আস্বাদন পাইব, হৃদয়ের সকল প্রকার মলিনতা দুর্ব্বলতা অপসারিত হইবে, অহঙ্কার অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, অন্তর্দেশ উদার উদাস ভাব ধারণ করিবে, এই প্রতীক্ষায় উৎসবের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছি। যিনি উৎসবের দেবতা তিনি আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ করুন ইহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।

নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্মে দ্বিতীয় কথা নাই, দ্বিতীয় চিন্তা নাই—তিনি কেবল এই একই কথা বলেন--আত্মা। আত্ম-চিন্তনই ব্রাহ্মের মুক্তির সোপান। "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" আত্মার দ্বারাই পরমাত্মার দর্শন হয়। যিনি আত্মার দ্বারা পরমাত্মার দর্শন করেন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং মোহগ্রন্থি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃত হয়েন। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মবিচার চাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান কালের অস্থতৃপ্ত মনুষ্যেরা ভূতত্ত্ববিচার পরিত্যাগ করিয়া আর আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হন না। পণ্ডিত এবং জ্ঞানী দুইটি স্বতন্ত্র সামগ্রী। পণ্ডিত মান যশে মণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানী মুক্তি-রসামৃত পানে সমাসক্ত থাকিয়া অনন্ত-জীবন ভোগ করেন। প্রাচীনকালে আত্মবিচার ছিল। আত্ম-বিচার ছিল বলিয়াই দুঃখ ক্লেশ বিমোচক উপনিষদের সৃষ্টি হইয়াছে। আত্মবিচার ছিল বলিয়াই অরণ্যে অরণ্যে তাপসাশ্রম সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল, আত্মবিচার ছিল বলিয়াই মানবকগণের জন্য গুরুকুল সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। আত্মবিচার ছিল বলিয়াই জরা ব্যাধি সহজে গৃহ-পরিবারে প্রবেশ করিতে পারিত না, আত্মবিচার ছিল বলিয়াই শান্তি ও স্বস্তি সংসারকে আনন্দময় রাখিত।

পদ থাকিতে যিনি তাহাতে ভর দিতে না পারেন, তিনি দণ্ডায়মান হইবেন কি প্রকারে? তেমনি আত্মা থাকিতে, যিনি তাহার বিচার না করেন, তিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইবেন কি প্রকারে? আত্মা বলিতে জীবের আপনাকে যেমন বুঝায়, পরমাত্মা বলিতে তেমনি তাহার স্রষ্টা নিয়ন্তা অনন্ত ঈশ্বরকে বুঝায়। বেদবাক্যে এই দুইটি "দ্বাসুপর্ণা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই সংসারে জীবাত্মা শরীর-রূপ পিঞ্জরে আজন্ম বদ্ধ রহিয়াছেন। আজ আমাদের ব্রহ্মোৎসব। এই উৎসবের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আত্মানুসন্ধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, স্বরূপতঃ জীবাত্মা কি এ অনুসন্ধান বৃথা। কারণ জীবাত্মার স্বরূপ কোন প্রকার বুদ্ধির গোচর হইতে পারে না। জীবত্মার কেন? জড় পদার্থেরও কি স্বরূপ জানা যাইতে পারে? এই জগতের কোন বস্তুরই স্বরূপ জানিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল গুণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু গুণের আধার যে, সে যে কি পদার্থ তাহা

আমাদিগের জানিবার উপায় নাই। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ বা স্পর্শ দ্বারা জড় পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে, কিন্তু যাহার সেই রূপ রস গন্ধ শব্দ বা স্পর্শ গুণ, তাহাকে আর আমরা কোন প্রকারে জানিতে পারিতেছি না এবং শরীর ও ইন্দ্রিয় যে পর্য্যন্ত থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমরা তাহা কোন প্রকারে জানিতে পারিব না। ইহা নিশ্চয় বাক্য যে যত দিন জীবাত্মা শরীরের মধ্যে বসতি করেন এবং জ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত দিন তাঁহার ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্ভর থাকে, তত দিন আর তাঁহার কোন বস্তুর গুণগত লক্ষণ ব্যতীত স্বরূপ লক্ষণ জানিবার সম্ভাবনা নাই।

ঈশ্বর যিনি তাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায়, আর সৃষ্ট মনুষ্যদিগের পৃথক পৃথক যে আত্মা তাহাকে জীবাত্মা বলা যায়। অসংখ্য জীবাত্মার যেমন ভিন্ন ভিন্ন শরীর দেখা যাইতেছে, পরমাত্মার তদ্রূপ কোন আধার নাই, তিনি নিরাধার, তিনি অশরীরী। জ্ঞানের নিমিত্ত জীবাত্মাদিগের যেমন ইন্দ্রিয় সকলের প্রতি নির্ভর, তদ্রূপ পরমাত্মার কোন ইন্দ্রিয় নাই এবং তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন না। তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়া স্বাভাবিক এবং তিনি সমুদায় বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ এবং গুণ-গত লক্ষণ এক কালেই জানিতেছেন।

> ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
> ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
> পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
> স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ॥

এই সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে কেবল একমাত্র শরীর-রহিত ইন্দ্রিয়-রহিত জ্ঞান-স্বরূপ নিত্য পরমাত্মা বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যেমন ইচ্ছা করিলেন, সেই প্রকার এই জগৎ উৎপন্ন হইল; তিনি জড় এবং চেতন উভয়েরই সৃষ্টি করিলেন। জড় পদার্থের মধ্যে সূর্য্য কি শ্রেষ্ঠ পদার্থ। তদভাবে তিমিরাচ্ছন্ন এই জগৎকে কে প্রকাশ করিত?

> "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং
> অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ"

এই কোন লক্ষণ-বিহীন, অপ্রজ্ঞাত, অন্ধকারের মধ্যে সূর্য্যকে সৃষ্টি না করিলে কে জগৎকে প্রকাশ করিত? এই অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে যদি পরমাত্মা চৈতন্যের সৃষ্টি না করিতেন, যদি কোন একটিও জীবাত্মার সৃষ্টি না হইত, তবে কে এই মনোহর জগৎ উপভোগ করিত? সূর্য্যের উদয়াস্ত হইত, ঋতুর পরিবর্ত্তন হইত, বৃক্ষ ফলবান হইত, কিন্তু কোন চক্ষু নাই যে সূর্য্যকে দর্শন করে, কোন রসনা নাই যে ফল আস্বাদন করে। সুতরাং জীবাত্মার অভাবে সৃষ্টি বিচিত্র হইয়াও নিরর্থক হইত। আত্মবিচারে দৃষ্টি অন্তর্মুখী হয়, আত্মবিচারে দেহাত্মবাদ নির্ব্বাণ হয়, আত্মবিচারে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জড় চৈতন্যের সত্য মিথ্যার পার্থক্য প্রতীয়মান হয়।

লোক সকল বাহিরের বস্তুকে দেখে, আপনাকে দেখে না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ-স্পর্শ-বিশিষ্ট বস্তুকে সর্ব্বদা দেখিতেছে, কিন্তু যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শকে দেখিতেছে, তাহাকে তাহারা ভাবিয়া দেখে না। সর্ব্বদা কেবল বাহ্য বস্তুকে দেখিয়া শুনিয়া স্পর্শ করিয়া লোকদিগের এমন সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তাহারা এমন কোন বস্তুর পৃথক সত্ত্বারই অনুভব করিতে পারে না, যাহাতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বিশিষ্ট যে বস্তু সেইই বস্তু, তাহা ভিন্ন আর বস্তু নাই, এই তাহাদিগের নিশ্চয় বুদ্ধি। যখন

প্রথম ইহা বুঝা যায় যে, যে রূপকে দেখিতেছে, যে রসকে আস্বাদন করিতেছি, যে গন্ধকে আঘ্রাণ করিতেছে, যে ত্বককে স্পর্শ করিতেছে, তাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, তখন কি আশ্চর্য্য হইতে হয়! সুবোধ ব্যক্তিরা ইহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন যে, যে সকল বস্তুকে দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন করা যায়, সেই সকল বাহ্য বস্তু; আর যে দেখে, যে শুনে, যে স্পর্শ করে, যে আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, কিন্তু যাহাকে দেখা যায় না, শুনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, আস্বাদন করা যায় না, সেই আমি—সেই জীবাত্মা। হায়! চতুর্দ্দিকে বাহ্য বস্তুর দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া সর্ব্বদাই বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া, লোক সকল কি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি কিছুই হইলাম না, কেবল সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি বাহ্যবস্তু সকলই বস্তু হইল! এ বিবেচনা নাই যে, আমি যদি না থাকিতাম, তবে কোথায় বা সূর্য্য, কোথায় বা চন্দ্র, কোথায় বা গ্রহ নক্ষত্র, কোথায় বা এই জগৎ থাকিত।

আমি কি বস্তু, ইহা যদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তবে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, আমি শরীর নহি কিন্তু আমি যে পদার্থ, সে এই শরীরের অন্তর্বর্ত্তী রহিয়াছি, তাহাকে জীবাত্মা বলা যায়। জীবাত্মা জ্ঞান পদার্থ, শরীর জড় পদার্থ। কিন্তু পরমেশ্বরের এই আশ্চর্য্য মহিমা যে এমত দুই স্বভাবতঃ বিপরীত পদার্থকে তিনি একত্র বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে জীবাত্মার ক্লেশ হয়, এবং জীবাত্মার শোক তাপে শরীর আশু শুষ্ক হয়, ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে। এই প্রকার কত অসংখ্য জীবাত্মা ইহলোক পরলোককে পূর্ণ করিয়া জগদীশ্বরের বিশ্বকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। প্রতি শরীরে স্বতন্ত্ররূপে এক একটি জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে। সেই প্রত্যেক জীবাত্মা "একএব" একই। জীবাত্মা যে, আমিও সেই, এক বস্তুর দুই নাম মাত্র। আমি শব্দে যে বস্তু বুঝায়, জীবাত্মা শব্দে সেই বস্তুই বুঝায়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, আমি কখন দুই নহি, আমি একই, অংশবিশিষ্ট নহি, সম্যকরূপে অংশ-বিহীন। কোন জড় বস্তুকে এতাদৃশ অংশবিহীন বলা যায় না। অতি সূক্ষ্ম যে একবিন্দু বালুকা তাহারও অনেক অংশ আছে। বস্তুর স্থান ব্যাপ্তির নাম বিস্তার, জড় বস্তু মাত্রেই স্থান ব্যাপী, সুতরাং জড়বস্তু মাত্রেরই বিস্তার আছে। যাহার বিস্তার আছে, তাহার অবশ্য অনেক অংশ আছে, এই হেতু জড় বস্তু মাত্রেরই অনেক অংশ আছে। অতএব অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইলেও তাহার অবশ্য অংশ থাকিবে। তাহার অবশ্য পূর্ব্বাংশ থাকিবে, পশ্চিম অংশ থাকিবে, উত্তর অংশ থাকিবে, দক্ষিণ অংশ থাকিবে; ঊর্দ্ধদেশ থাকিবে, নিম্নদেশ থাকিবে। কিন্তু পরমেশ্বর যে সকল জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক যথার্থ একই পদার্থ, তাহাদের কোন অংশ কি ভাগ নাই। জীবাত্মার ঊর্দ্ধভাগ নাই, অধোভাগও নাই, পূর্ব্বভাগও নাই, পশ্চিম ভাগও নাই, উত্তর ভাগও নাই দক্ষিণ ভাগও নাই, জীবাত্মা সম্যক রূপে বিস্তৃতি-বিহীন, অংশ-বিহীন এবং "একএব" একই।

পরমাত্মা যিনি তিনি 'একএবাদ্বিতীয়ঃ'। প্রত্যেক জীবাত্মা যদিও এক, তথাপি জীবাত্মার সংখ্যা অগননীয়। কোন এক জীবাত্মার সমান যেমন অনেক জীবাত্মা আছে, পরমাত্মার সমান আর দ্বিতীয় নাই। জড়

হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। জড় এবং জীবাত্মা এত ভিন্ন যেমন অন্ধকার আর আলোক! এই দুই বস্তুতে কোন সমান গুণ নাই—এমত কোন গুণ নাই যাহা এই দুই বস্তুতেই আছে—যাহা এই দুই বস্তুতেই সমান। জড়েতে যে সকল গুণ আছে তাহা জীবাত্মাতে নাই, জীবাত্মাতে যে সকল গুণ আছে তাহা জড়েতে নাই, জড় হইতে জীবাত্মা এত ভিন্ন। আবার জড় হইতে জীবাত্মা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। তাঁহার সমান আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়। কেবল অদ্বিতীয় নহেন, তিনি পূর্ণানন্দ পরব্রহ্ম। তাঁহার আনন্দ আমরা কি প্রকারে অনুভব করিব, সে আনন্দ কোন্‌ আনন্দের সহিত তুলনা হইতে পারে? তিনি আনন্দের সাগর, সে আনন্দের ক্ষয় নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। তিনি অপার আনন্দ নিত্য উপভোগ করিতেছেন, আপনার আনন্দে আপনি নিত্য পূর্ণ রহিয়াছেন। সেই প্রেমাস্পদ পরম পুরুষ সংকল্প করিলেন যে, আমি আমার প্রীতিপাত্র জীবাত্মা সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে আনন্দ বিতরণ করিব, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রীতি-পূজা গ্রহণ করিব। প্রীতি প্রদানে আমাদের কল্যাণ সাধিত হয় এবং পবিত্রতা রক্ষিত হয়। প্রীতি গ্রহণে সেই পরমানন্দময়ের পূর্ণ-মঙ্গলভাব প্রকাশ পায়। এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া দেওয়ান হাফেজ বলিয়াছিলেন—

তোরা মে বীনম্ ও মাইলম যেরাদৎমে সওয়দ-হর্দম্
মেরা মে বিনীও হয়্‌দম যেরাদৎমে কুনীদর্দম্।

অতএব অন্তরস্থ পরমাত্মাকে প্রীতি দ্বারা উপাসনা করিতে কেন বিরত হও। স্বভাবকে বিকৃত না করিলে আর তাঁহার উপাসনাতে অশ্রদ্ধা জন্মে না। আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর, অদ্য রাত্রি হইতেই প্রীতি দ্বারা সেই অন্তর্য্যামী অন্তর্গত পরমাত্মার উপাসনা আরম্ভ কর। কেবল শ্রবণ করিলে কোন ফল নাই। তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে এ দেশের মঙ্গল কোথায়। যে দেশে ঈশ্বরের পূজা নাই, যে পরিবারের মধ্যে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ হয় না, যে হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র আসন নাই, সেই শূন্য দেশ সেই শূন্য পরিবার, সেই শূন্য হৃদয় কেবল ঘন বিষাদের আলয়। অদ্য হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় কর, তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। তোমাদের শুনিবার উপায়ের অভাব নাই, তোমরা জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়াছ, তবে জ্ঞান ও কার্য্যে বিশ্বাস ও আচরণে কেন না মিলিত কর। তোমরা অদ্য হইতে তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর, তাহার ফল অচিরাৎ পাইবে। যাঁহার প্রসাদে জীবনের সমুদয় সুখ ভোগ করিতেছ, কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। ভয় ও বিপদের সময় তাঁহাকে আশ্রয় কর; মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া শিশু যেমন নির্ভয় হয়, সেই প্রকার ভয়শূন্য হইবে। পাপে তাপিত হইলে অনুতাপ ও অশ্রুপাত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি শরণাগত বৎসল, তিনি তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যিনি জগতের ঈশ্বর, রাজাধিরাজ, দেবতার দেবতা, তাঁহার আরাধনা কর। যাঁহাদের জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারা আপনাকে পবিত্র করুন, ঈশ্বরের নিকটে মুক্ত-হৃদয়ে প্রার্থনা করুন, যত্ন করুন, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিবেন। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মাম ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু" ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না

করি; এই বাক্যের অর্থ তাঁহাদের হৃদগত হইবে।

চতুরাশ্রম।

বৈদিক সময় হইতে এদেশে চারিটী আশ্রম প্রসিদ্ধ আছে—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্য। পুরাকালের ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে ভারতসন্তানদিগের জীবনের ভিত্তি সংস্থাপিত হইত। এই আশ্রমে গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবা করিতে হইত। শিষ্য গুরুর জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিতেন, ভৃত্যের ন্যায় গুরুর সেবা করিতেন এবং গুরুও শিষ্যকে সন্তানবৎ জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। গুরুদিগের শাসন এবং শিষ্যগণের গুরুআজ্ঞা প্রতিপালনে যত্ন সম্বন্ধে মহাভারত ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে বিশেষতঃ উপনিষদে ভূরি ভূরি আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। মহাভারতে দেখি ধৌম্য নামক জনৈক আচার্য্যের তিনজন শিষ্য ছিল—আরুণি, উপমন্যু ও বেদ। ধৌম্য আরুণিকে আদেশ করিলেন, বৎস! আমার ক্ষেত্রে আলবাল প্রস্তুত করিয়া জলরক্ষার কোন উপায় উদ্ভাবন কর। আরুণি অনেক চেষ্টা করিয়াও জলস্রোত বন্ধ করিতে না পারিয়া স্বয়ং স্রোতোমুখে আলবাল হইয়া শয়ান করিয়া স্রোত বন্ধ করিলেন। আচার্য্য শিষ্যদিগের কার্য্যের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার মানসে সকলকে আহ্বান করিলেন। উপমন্যু ও বেদ উভয়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আরুণি না আসায় আচার্য্য তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে আদেশ দিলেন। শিষ্যদ্বয় গুরুর ক্ষেত্রে গিয়া দেখে যে আরুণি ক্ষেত্রে শয়ান রহিয়াছেন। তাহা শুনিয়া গুরু তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আরুণি উপস্থিত হইলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আরুণি সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে আচার্য্য তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তদনন্তর উপমন্যুকে তাঁহার কার্য্যবিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন আমি প্রাতঃকালে নগরে ভিক্ষা করিয়া তলব্ধ বস্তু আপনাকে আনিয়া দিয়া থাকি। কিছু দিন অতিবাহিত হইলে গুরু উপমন্যুর শরীর পূর্ব্ববৎই আছে দেখিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, উপমন্যু তুমিত একটুও কৃশ হও না, কি উপায়ে নিজের শরীর ধারণ কর। উপমন্যু বলিলেন যে তিনি দুইবার ভিক্ষা করেন, একবারের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি তাঁহাকে দেন, দ্বিতীয়বারে লব্ধ ভক্ষ্য স্বয়ং ভক্ষণ করেন। আচার্য্য তাহা নিবারণ করিলেন। কয়েক দিন যায় গুরু উপমন্যুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি উপায় অবলম্বন করিয়া শরীর ধারণ করিতেছ? উপমন্যু বলিলেন এখন গো-দুগ্ধ পান করি। গুরু তাহাও নিষেধ করিলেন। উপমন্যু তখন গো-বৎসদের মুখনির্গত ফেন পান করিতে লাগিলেন। গুরু তাহাও যখন নিষেধ করিলেন তখন তিনি অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বৃক্ষপত্র ভোজন করিতে লাগিলেন এবং অর্কপত্র ভোজন দ্বারা দৃষ্টিহীন হইয়া অরণ্যে গহ্বর মধ্যে পতিত হইলেন। কথিত আছে যে গুরুর আজ্ঞা ক্রমে উপমন্যু দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট আপনার দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া পরে চক্ষুলাভ করিয়াছিলেন। গুরুর কঠিন শাসন এবং শিষ্যের ধীরতা এই উপন্যাসে অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থার ক্লেশ বৈদিক সময়ে যেরূপ ছিল, এখন তাহার শতাংশের একাংশও নাই।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা দিবার প্রথা ছিল। এখন তিন দিনেই ব্রহ্মচর্য্য শেষ হয়। নাট্যাকারে এখন সেই সমস্ত জীবনের পরমোপকারী ব্রত সকল উদ্‌যাপিত করা হয়। বৈদিক সময়ে দ্বাদশ-বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যের ন্যূনতম কাল ছিল। একচতুর্ব্বিংশতি বৎসর ঊর্দ্ধতম কাল নিরূপিত হইত। যাঁহারা এক বেদ অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের পক্ষে দ্বাদশবর্ষ এবং যাঁহারা সকল বেদ অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের পক্ষে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর প্রয়োজন হইত। শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত গুরুগৃহে ছিলেন। কোন কোন ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন না।

দ্বিতীয় আশ্রম।

এই আশ্রমকে গৃহমেধী অথবা বিবাহ-জীবন বলে। গার্হস্থ্যাশ্রম পবিত্র আশ্রম। এই আশ্রমে থাকিয়া লোকে যে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করে, তদ্দ্বারা জগতের হিত সাধিত হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নিজ জীবন গঠিত হয়, কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে জগতের কল্যাণ সাধিত হয়। মনুষ্য বিবাহ না করিলে জনস্রোত রক্ষা পাইত না। উপনিষদে সেইজন্য উক্ত হইয়াছে "আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মাব্যবচ্ছেৎসীঃ।" গুরুদক্ষিণা দিয়া গৃহমেধী হইবে, প্রজাতন্তু কর্ত্তন করিবে না। গৃহমেধীর প্রতি পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিধি আছে। গৃহস্থের পঞ্চবিধ পাপ সঞ্চয় হয়। তন্নিবারণের জন্য পঞ্চ-মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হয়, নতুবা সে পাপ ক্ষয় হয় না; সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ মনুসংহিতার এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে;

"অধ্যাপনংব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনং।"

অধ্যাপনকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে, পিতৃপুরুষদিগের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এই জীবনেই

এবং তাঁহাদের জীবদ্দশায় শেষ হইল না এই জ্ঞানানুসারে পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি যাহাকে প্রাচীন ধর্ম্ম-সাধকেরা তর্পণ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহাকে পিতৃযজ্ঞ বলে। জীবজন্তুকে আহার দান এবং অতিথি সেবা এই সমস্ত প্রাচীন সাধকদিগের নিত্য কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে গৃহে প্রতিদিন এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, ব্রহ্মচর্য্যব্রতাপেক্ষা তাহা কি শ্রেষ্ঠ নহে? অনুতাপ ও আত্মতিরস্কারের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা সেই ঋষিকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া তাঁহাদেরই অবমাননা করিতেছি। প্রাচীন সাধকেরা ঋষিদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য প্রতি-দিন বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন, পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য তর্পণ করিতেন এবং জনসমাজের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে যে ঋণ আছে, তাহা পরিশোধের জন্য অতিথি সেবা করিতেন। শাস্ত্রে ইহা শ্রবণ করিলেও মন উৎসাহে নৃত্য করিতে থাকে। যদি কেহ কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারেন, তিনিই ধন্য তিনি আমাদের পূজ্য।

যে সমাজে মানবের পাপসঞ্চার দূরীকরণ সম্বন্ধে এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছিল, সে সমাজ জীবন্ত সমাজ—সে দেশ পুণ্য ভূমি, সে কাল ধর্ম্মযুগ। একবার ভাবিয়া দেখুন এইরূপ সুন্দর যাঁহারা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহারা মানব না দেবতা?

তৃতীয় আশ্রম।

এই আশ্রমকে বানপ্রস্থাশ্রম বলে। ইহার অনুরূপ আশ্রম এখন দৃষ্ট হয় না। এখন লোকে বারাণসী বৃন্দা-বন প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাসার্থ গমন করিয়া থাকে। শ্রুত হওয়া যায় কদলীবনে একটি বানপ্রস্থ সম্প্রদায় বাস করেন। আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের চরণ দর্শন করিতে পারি নাই।

প্রাচীন বানপ্রস্থ সম্প্রদায় বৃক্ষতলে বাস করিতেন, গ্রাম্য আহার পরিত্যাগ করিতেন, ভূমিতে শয়ন করি-তেন, নানাপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন। মনু ঐ সম্প্র-দায়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ
অপত্যস্যৈবচাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।
সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদং
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা।"

স্নাতকদ্বিজগণ যথাবিধি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বিজিতে-ন্দ্রিয় হইয়া বক্ষ্যমান রীতি অনুসারে বানপ্রস্থাশ্রমের অনু-ষ্ঠান করিবেন। গৃহী যৎকালীন আপনার শরীরের চর্ম্ম শিথিল ও কেশ পক্ক হইতেছে দর্শন করিবেন এবং পৌত্র মুখ দর্শন করিবেন, তখন বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি-বেন। গ্রাম্য আহার ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাকে পুত্র হস্তে সমর্পণ করিয়া অথবা তিনি যদি সহধর্ম্মিণী হইতে চাহেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিবেন। গ্রাম্য আহার ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া অযত্ন-লব্ধ ফল মূল দ্বারা প্রাণধারণ করিবেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় অনেক কৃচ্ছ্র-সাধনের উল্লেখ দেখা যায়। যথা,—পাদাগ্রে দিবাভাগে দণ্ডায়মান, মৃত্তিকায় শয়ন, বল্কল পরিধান, গড়াইয়া স্থান পরিবর্ত্তন (চলিবার পরিবর্ত্তে)। কিন্তু পর সময়ে এই সমস্ত কৃচ্ছ্র ও অরণ্যগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পাছে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণ হয় এই ভয়ে অরণ্যগমন নিষিদ্ধ হয়।

আর্য্যগণ ইহাও বলিয়াছেন যে অরণ্যগমন দ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধি পায় না, মৌন হইলেও মুনি হয় না। মহাভারতে পুনঃ পুন এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। মনু বলেন "ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং।

চতুর্থ আশ্রম।

এই আশ্রমে পরিব্রাজ্যাশ্রম বা ভৈক্ষ্য কহে। পরমায়ুর তৃতীয় ভাগে বিষয়ানুরাগ নিহত হইলে এই চতুর্থাশ্রমে বিষয়সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক ঈশ্বরে মনঃ সমাধান করিয়া পরি-ব্রাজ্য অর্থাৎ এই সন্ন্যাস আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে, এবং এই রূপে ঈশ্বরে লীন হইবে।

কয়েকটি কথা।

(প্রাপ্ত)

নব্যভারত-পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্যারী শঙ্কর দাস গুপ্ত এম. এম. এস, অসাম্প্রদায়িক-একেশ্বরবাদ নামক প্রস্তাবে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন। আজকালকার দিনে তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ ভাবে সত্যকথার ও ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত অবস্থার আলো-চনা করিতে অনেকেই বিমুখ। প্রায় ৮০ বৎসর হইল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের এবং ব্রাহ্মসংখ্যার সেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে কি না, তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত হিতৈষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরই আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। রাজা রাম-মোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, একেশ্বরবাদ প্রচারই তাঁহার মুখ্য বলি কেন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অখণ্ড যুক্তি প্রভাবে দেশীয় সমগ্র শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া একেশ্বরবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, একেশ্বর

বাদের গুরুত্ব ও মর্য্যাদা সকলের সমক্ষে ধারণ করিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে একেশ্বরের পূজায় জাতিনির্ব্বিশেষের অধিকার প্রদান করিলেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে মহাত্মা রামমোহনের দুইটি বিষয়ের উপর প্রধানতঃ দৃষ্টি, ছিল প্রথম একেশ্বরবাদ-প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় সেই একেশ্বরের পূজায় সর্ব্বসাধাণকে অধিকার দান। বেদ উপনিষদ যাহা এতদিন ধরিয়া ব্রাহ্মণ জাতির একপ্রকার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, তাহা তিনি সকল জাতির সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিলেন।

তাঁহার পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। একই লক্ষ্য লইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভারতে প্রচার করা অথচ তাহার বিশ্বব্যাপী উদারতা রক্ষা করা তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। কিন্তু একদিকে বেদান্তের শুষ্কতা অন্য দিকে বেদের অভ্রান্ততা, অন্য কথায় উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ-রাহিত্য ও মায়াবাদ এবং অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রবাদ দেখিয়া তিনি প্রথমে চিন্তিত হইলেন। সত্যের যে একটি অসাম্প্রদায়িক ভাব আছে, সত্য যে কোন দেশে বা কালে আবদ্ধ নহে,এ কথা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সায় খুঁজিতে ছিলেন। তিনি উপনিষদ্ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু আজকালকার মত বেদগ্রন্থ সে সময়ে সুপ্রাপ্য ছিল না। বঙ্গদেশে তাহার পঠনপাঠন আদৌ হইত না। তাই তিনি প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য চারিজন ব্রাহ্মণকে নিজ ব্যয়ে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে বেদ শাস্ত্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিবার জন্য। আজ কালকার দিনে যে অধীরতা ও হঠকারিতা আমাদের মধ্যে অনেকের অঙ্গের ভূষণ, দেবেন্দ্রনাথে তাহার বিন্দুমাত্র ছিল না। অন্য কিছুর জন্য না হইলেও সত্য-নির্ণয়ে এই যে ধীরতা ও সহিষ্ণুতা, যাহা মহর্ষিদেবের চরিত্রে ঠিক এই খানে পরিলক্ষিত হয়, অন্য কিছুর জন্য না হইলেও কেবল তাহারই জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নাম সংস্কারকগণের মধ্যে অতি উচ্চে। ধ্বংস করা সহজ, কিন্তু গঠন কার্য্য অতীব সুকঠিন। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ সংস্কার করিতে—দোষ-বিশোধন করিতে আসিয়াছিলেন, প্রচলিত ধর্ম্মের গাত্রে যে মলিনতা স্পর্শ করিয়াছিল তাহাই প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। অকারণ নিন্দা বা গ্লানি করিয়া কাহারও মর্ম্মপীড়া দিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত ছিলেন। তাই রামমোহন রায় সম্পাদিত আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিন্দাবাদের ভুয়োভুয়ঃ সুস্পষ্ট নিষেধ-বাক্য রহিয়াছে। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সত্য নিরূপণের দিকে যত দিন ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ছিল, দেশীয় শাস্ত্রের উপর যত দিন ঐকান্তিক নির্ভর ছিল, ততদিন ব্রাহ্মসমাজ অনেকানেক লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিত। যাঁহারা সমধিক আকৃষ্ট হইতেন, তাঁহারাই পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মসমাজেরআচার্য্য হইয়া পড়িতেন। ক্রমে সামাজিক অনেক সমস্যা ব্রাহ্মসমাজের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিল। পৌত্তলিক এই কথাটি বিষেষ বহন করিতে লাগিল। যাঁহারা মূর্ত্তিপূজার সহিত কিছুমাত্র যোগ, বাধ্য হইয়াই হউক আর অন্য কারণেই হউক, রক্ষা করিতেন, তাঁহাদের আর নিস্তার রহিল না। জীবনের পবিত্রতা রক্ষা কর্ত্তব্যপালন ঈশ্বরানুরক্তি বিদ্যাবত্তা প্রার্থনা-শীলতার দিক দিয়া লোকের বিচার না হইয়া পৌত্তলিকতার দিক দিয়া ব্রাহ্মসমাজ অপরকে বিচার করিতে আরম্ভ করিল। এখনও যে সে ভাবের তিরোভাব হইয়াছে সে কথা বলিতে পারি না। আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কার আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ করিল। নরহত্যা চৌর্য্য দস্যুবৃত্তি শঠতা ও প্রবঞ্চনার ন্যায় পৌত্তলিকতাও পাপ বলিয়া পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিল।

অবশ্য যাঁহারা সমুন্নত, পৌত্তলিকতার সহিত সর্ব্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিতে সক্ষম হইলেন, তাঁহারা অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান গ্রহণ করিতে লালায়িত হইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি সংরচন করিলেন। এই অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সংরচনেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন গৃহ্য-অনুষ্ঠান-পদ্ধতির ভাব যথাসম্ভব রক্ষা করিয়াছেন। এখানেও তাঁহার ধীরতার পরিচয়। এরূপ অপৌত্তলিক-অনুষ্ঠান-পদ্ধতির যে একটি আবশ্যকতা আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না।

ব্রাহ্মসমাজ পরে আরও এক পদ অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে যখন সকল জাতির সমান অধিকার, যখন সকলেই ধর্ম্মভ্রাতা—একই পিতার সন্তান—তাঁহার পূজক ও উপাসক, তখন জাতিভেদের গণ্ডী কেন আর অকারণ পার্থক্যের সৃষ্টি করে, পরস্পরের মিলনের কেন আর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, এই যুক্তিবলে ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে জাতিভেদের বন্ধন অল্প বিস্তর শিথিল করিতে লাগিলেন। অনেকে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সঙ্কর-বিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলতঃ সঙ্কর বিবাহ ও উপবীত-ত্যাগ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেকদিন হইতে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আসিয়াও এতদূর উন্নত হইতে না পারিলেন, তাঁহারা স্থিতিশীল আখ্যা পাইলেন, এবং উন্নতদল উন্নতিশীল আখ্যা গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক লইয়া কথা উঠিত, এখন ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি

হইল। বেদ উপনিষদ ছাড়িয়া অনেকে বাইবেল কোরাণ জেন্দাভেস্তার উপদেশে শান্তি পাইলেন। স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা সমাজে নবভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। অভ্রান্ত গুরুবাদ ও আচার্য্যবাদ কোন কোন স্থানে প্রবেশ করিল। উপরে অধুনাতন সময়ের ব্রাহ্মসমাজের ছবি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ব্রাহ্মগণের ভিতরে যে কিছু পরিবর্ত্তন স্থান পাইতেছে তাহার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ যুক্তি আছে। এই সমস্ত পরিবর্ত্তন যাহা আজ কাল ঘটিতেছে তাহার গতিরোধ করা সুকঠিন। পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের সম্মুখে। তাহার প্রভাব এতই অধিক যে, ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও ধীরতা তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারে না। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে সকল সংস্কারই যেন ধর্ম্ম প্রণোদিত হয়। ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাস, তাঁহাতে নির্ভরশীলতা, চরিত্রের বিশুদ্ধিতা, প্রার্থনাশীলতা সকল সময়ে প্রহরীরূপ জাগিয়া না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে না। যাঁহারা সামাজিক-সংস্কারে এতদূর অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মে প্রেমে ভক্তিতে নিষ্ঠায় উদারতায় সহিষ্ণুতায় ক্ষমায় যে কতদূর উন্নত হইলে মত ও চরিত্রের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা পায়, তাহা তাঁহাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে। ইহা তাঁহাদের যেন মনে থাকে যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-বিহীন সমাজ ও সমাজসংস্কার এবং ভিত্তিহীন অট্টালিকা উভয়েই সমান ; উহা বিনাশের ও দুর্গতির অভিমুখীন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা পৌত্তলিক বলিয়া যদি অপরকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন,তবে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মের বিনাশ ঠিক সেই খানে। যদি উন্নতিশীল বলিয়া স্থিতিশীলকে ঘৃণার কেহ চক্ষে দৃষ্টি করেন, তবে তাঁহার আধ্যাত্মিক বিনাশ সেই খানে। ধর্ম্ম-জগতে ঘৃণা অহঙ্কার বা মাৎসর্য্যের স্থান নাই। জীবনের প্রতিকর্ম্মে প্রতি ব্যবহারে উন্নত মতের সহিত জীবনের সঙ্গতি না থাকিলে কেমন করিয়া লোকে তাঁহাকে উন্নত বলিবে। আপনাকে আপনি উন্নত বলিয়া ঘোষণা করিলে চলিবে না। যাহারা দুর্ব্বল তাহাকে তুলিয়া লইতে হইবে, পথ দেখাইতে হইবে। প্রভূত গবেষণা ও বিদ্যাবুদ্ধি সত্তেও যাঁহারা পুরাণ-তন্ত্রের জটিলতার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে ধীরতা ও বিনয়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্র উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিতে হইতে। আদরের সহিত তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। অন্ত ধর্ম্মের কুৎসা বা নিন্দা ঘোষণা করা ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব স্বীকারের পরিচায়ক নহে। জীবনকে পবিত্র পরিশুদ্ধ কর, সাধনা নিরত হও, জ্ঞানে সমুন্নত হও, নিখিল বিদ্যাতে পারদর্শী হও। তাহা হইলে তুমি তোমার জীবনের সৌগন্ধে কতলোককে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইবে। নিজে অমানী হইয়া অপরকে মর্য্যাদা দান কর, যে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে। তাহাহইলে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে লোকের অল্পতা বলিয়া আর দুঃখ করিতে হইবে না। নিশ্চয় জানিও, ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা ও দীক্ষা এই খানেই প্রতিষ্ঠিত। যদি ঠিক এই ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পার, হটকারিতা পরিত্যাগ করিয়া সৎভাবে সাধুভাবে সকলের সহিত মিলিত হইতে পার, দেখিবে অচিরে ব্রাহ্মসমাজের কলেবর পরিপুষ্ট হইবে। তুমি নিজে যদি ব্রাহ্ম হও তাহা হইলে আর কি হইল। অপরকে আকর্ষণ করিবার দায়ীত্ব তোমার হস্তে। আপনাকে কোন কোন বিষয়ে পশ্চাদপদ রাখিয়াও যদি আর দশজনকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতে পার, আপনার গতিবেগকে সংযত করিয়া যদি অপরকে তোমার সহযাত্রী করিয়া লইতে পার, তবে নিশ্চয় জানিও ব্রাহ্মসমাজে যে আসিয়াছ সিদ্ধিলাভ করিবে। আজকাল শিক্ষিত লোক মাত্রই অল্লাধিক পরিমাণে ব্রাহ্মভাবাপন্ন, জ্ঞানোন্নত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও আমাদের শত্রু নহেন। আমরা আমাদের অসহিষ্ণুতা দোষে তাঁহাদিগকে সাথী করিয়া লইতে পারিতেছি না। তাঁহারাও আমাদের জীবনের সকল কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে না পাইয়া ঘৃণার চক্ষে অনেক সময়ে আমাদিগের কার্য্য কলাপ আলোচনা করেন। প্রেমের ধর্ম্ম আমরা লাভ করিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম চাই, মনুষ্য সমাজের প্রতিও প্রেম চাই। প্রেমের রজ্জুতে যেন সকলকে বাঁধিবার জন্য আমরা সচেষ্ট হই, সর্ব্ববিধ ঔদ্ধত্য পরিহার করি, ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ জয়যুক্ত হইবে।

আজ কাল আবার ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে সকল ধর্ম্মই সত্য। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহার ধর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তান্ত্রিক-শাস্ত্রসম্মত প্রাণীহিংসা, বৈষ্ণবগণের প্রচারিত অহিংসা, বৌদ্ধধর্ম্মের নাস্তিকতা, উপনিষদের আস্তিক্য-বুদ্ধি, পুরাণের অবতারবাদ, ব্রাহ্মসমাজের তৎবিপরীত মত, তান্ত্রিক বীরাচার ও বামাচার, অন্যান্য ধর্ম্মের তৎপ্রতিকুল ভাব, ইহার মধ্যে আমরাত সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাই না। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় যে কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণায় আইসে না। অবশ্য সকল ধর্ম্মের ভিতরে যে সকল সত্য নিহিত আছে, তাহা গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মসমাজ চিরকালই প্রস্তুত। সত্য যে দেশেও কালে বদ্ধ নহে এ মতত ব্রাহ্মসমাজ চিরকালই পোষণ করিতেছেন। "ধর্ম্ম সমন্বয়" "সকল

ধর্ম্ম সত্য" এ কথা শ্রুতি-মধুর হইতে পারে, কিন্তু কেবল মাত্র মিলনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমরা সত্যের অবমাননা করিতে পারি না, ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্বকে হীন করিতে পারি না। অতিরিক্ত মাত্রায় আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যারও আমরা পক্ষপাতী নহি। অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত অনেক বিষয়ে মিলনের যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে। ঐ সকল সার-সত্যকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আমরা সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে পারি। অন্যান্য ধর্ম্মে যাহা কিছু আমাদের মতের বিরোধী তাহা লইয়া অনর্থক তর্ক সংগ্রাম বা অকারণ নিন্দাবাদের আমরা পক্ষপাতী নই। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহানভাব সকলের সমক্ষে যাহাতে ধারণ করিতে পারা যায়, তাহার দিকে সাধারণের দৃষ্টি যাহাতে আকর্ষণ করিতে পারা যায়, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সেইরূপ অবসরই অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা উদারতার পক্ষপাতী, কিন্তু অতিরিক্ত উদারতা যাহা সত্যকে ম্লান করিয়া দেয়, আদর্শকে হীন করিয়া তোলে, অসত্যকে সত্য বলিতে প্রবৃত্তি দেয়, আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। আমরা সাম্যের বিরোধ নহি কিন্তু ইহাও স্পষ্টস্বরে বলি যে সত্যের সিংহাসন সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত।

প্রার্থনা।

আমার অন্তর যেন মুগ্ধ নাহি হয়
কভু আশা ভেঙ্গে গেলে, হে মঙ্গলময়
তোমাতে সর্ব্বস্ব সঁপি বিশ্বাস রাখিয়া
যেন সদা মোহ-মুক্ত থাকে মোর হিয়া।
রজনীর অন্ধকার দূরে যায় চলে,
হেরিয়া কনক রবি পূরব অচলে।
তেমনি দেখিয়া তোমা, লভি ও পরশ,
যেন হিয়া হয় মম পবিত্র সরস।
আপনার সুখ চিন্তা অসার বাসনা,
যেন এ অন্তর মম আকুল করে না।
সব সুখ সব আশা হয় তোমাময়,
তোমাতে মিলিয়া মিশে যায় এ হৃদয়।
আমি শুধু হই তব চরণ ভিখারী,
এ হৃদয় মন প্রাণ হউক তোমারি।

প্রার্থনা।

শুধু কি সময়ে বদ্ধ রহিবে হৃদয়,
একি স্থানে একি ভাবে হে রহস্যময়
তুমি কি আবদ্ধ আছ? যে দিকেতে চাই,
তোমারি মহিমা শুধু দেখিবারে পাই।
কোথা তুমি, আছ তুমি অনল অনিলে,
রবি, শশী, তারকায়, ভূধরে সলিলে।
সর্ব্বত্র সকল ভাবে রয়েছ ঘেরিয়া,
অবোধ বাহিরে দেখি, দেখি না চাহিয়া।
অন্তরে রয়েছ মম, অন্তরের সার,
মঙ্গল কল্যাণে ঘিরে হৃদয় আমার।
এই দয়া কর বিভু এ দুটি নয়ন,
পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, নেহারি যখন
যা কিছু সম্মুখে মোর, দেখি তোমাময়,
তোমারি পরশ লভে এ ক্ষুদ্র হৃদয়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানা কথা।

শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৪ই পৌষ বৃহস্পতিবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম পুত্র পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরপত্নীর আদ্য-শ্রাদ্ধবাসর ছিল। কন্যারা তৎপূর্ব্বে ৪র্থ দিবসে শ্রাদ্ধ ও দান উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এইদিন তাঁহার খ্যাতনামা পুত্র শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ শ্রাদ্ধাদি করেন। কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রাদ্ধ-কার্য্য দর্শনে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া বিদায় লইয়া পরে শ্রাদ্ধ ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সপ্তদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।
৮১৪ সংখ্যা
১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"
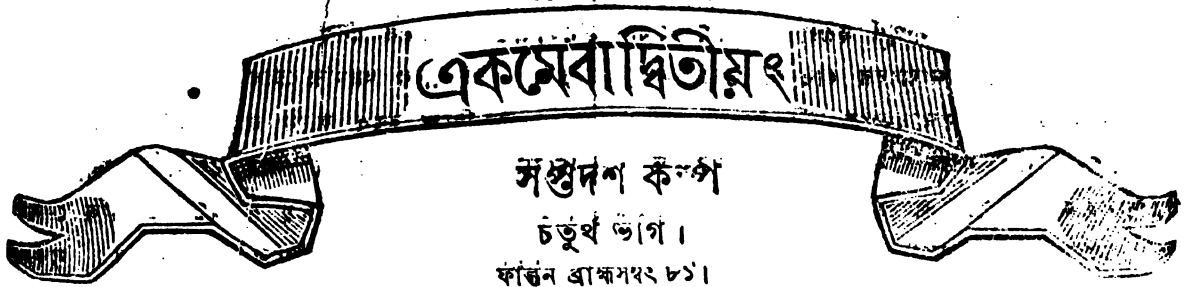
শান্তিনিকেতনে বিংশ সাম্বৎসারিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা।

প্রতিদিন আমাদের যে আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বলবেশ পরে আমাদের সকলের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন—জাগো আজ, আশ্রমবাসী সকলে জাগো!

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শস্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে বিশ্বের কত হাজার রকম আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠ্‌তে থাকে তখনি আমাদের জাগা;—আমাদের শক্তির সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুইদিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারচে, বল্‌চে জাগো। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আস্‌চে বল্‌চে জাগো। যেখানে সেই বড়র আহ্বানে আমাদের ছোটটি তখন সাড়া দিচ্চে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়্‌চে, প্রত্যেক তারটিকেই বল্‌চে, জাগো। যে তারটি জাগ্‌চে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সঙ্গীত। যে তার শিথিল, যে তার জাগচে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সঙ্গীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছিতে হয়।

এই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমারা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগ্‌তে এসেছি তা কি আমরা জানি! প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা, কি আমাদের স্মরণ আছে? জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দ্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে—মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে? অনন্তের মধ্যে, আমাদের এই যে জাগরণ, এই যে নানাদিকের জাগরণ, গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা ত এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ, যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন—তিনি তাঁর হাজার-মহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন—এই মনুষ্যত্বের মুক্তদ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌চে—সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না—ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে না যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল 'স কৃপণঃ' সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই যে জাগা, এও কি একটি মাত্র জাগ-

রণ ? গোড়াতেই তো আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে—সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা। আমাদের চোক-কান আমাদের হাত-পা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ করে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের মধ্যে এমন কয় জন আছে ? তার-পর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে—বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে—এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে —যেখানে সাড়া দিচ্চে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্চে —যেখানে সাড়া দিচ্চে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্মউপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্চে, সেইখানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহাউদ্বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে—বলচে, ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড় করে জান ! বল্‌চে, নিজের কৃত্রিম আচারের কাল্পনিক বিশ্বাসের অন্ধসংস্কারের তমিস্র আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না—উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্য জাগ্রত হও—আত্মানং বিদ্ধি।

এই যে জাগরণ, যে জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি—যে জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সঙ্কোচ বিদীর্ণ করে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি—সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরব রাগিণীর প্রভাতীগান ধরেছেন—আজ আমাদের উৎসব সার্থক হোক্।

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোট আর-একদিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটাতে আমি কেবল মাত্রই আমি—সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি—কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা—যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সেদিকটাতে আমি ত একটি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মত ছোট আর কে আছে ! আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যে দিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শত সহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ির সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,—আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোক-লোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি ; সেই খানে আমার চেয়ে বড় আর কে আছে ! এই বড়র দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটর দিকে কখনই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহঙ্কারের অতীত সেই আমার বড় আমিকে সকলের চেয়ে বড় আমির মধ্যে দেখিবার দিনই হচ্চে আমাদের বড় দিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট ; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা' আর-কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্চে এই যে আমিত্ব বলে' একটি জিনিষ এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জান্‌চি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগ্‌চে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমি হচ্চি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চির-বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই যে ঘর ভাঙবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্চেন উনি। পৃথক্ না হলে মিলনও হয় না। তাই দেখ্‌তে পাচ্চি সমস্ত জগৎজুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলি পরস্পর বোঝাপড়া করচে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা ;—তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেল্‌চে আর এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্চে। এম্‌নি করে আমি এবং আমি-নার মধ্যে কেবলই আনা-গোনার জোয়ার ভাটা চলেচে। এম্‌নি করে আমি আমাকে জান্‌চি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানচি এবং সকলকে জান্‌চি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানচি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্য-কালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে বলে' আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব ! যেদিকে সে পৃথক্ সেই দিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ সেইদিকে তার পাপ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে ত্যাগ সেইদিকে

তার পুণ্য; যেদিকে সে পৃথক সেই দিকেই তার কঠোর অহঙ্কার, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্য্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আর একদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্চে দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রার্থনা; অসতোমা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন:—

যব হম রহল রহা নহিঁ কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ এই আমি একদিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্যদিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্চে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেল্‌তে চাননা, এ'কে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী; এ'কে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্চেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠ্‌চে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ, যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেই জন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই আমার মত তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোক-লোকান্তরে সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেই জন্যেই আমাকে নইলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নয়, সেই জন্যই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেই জন্যই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোট হয়ে সংসারী হয়ে সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু মানুষ আমির এই বড় দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাঁচবে কি করে? তাই প্রতিদিনের মধ্যে মধ্যে এক একটি বড়-দিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখতে চায়। বড়দিনগুলি হচ্চে সেই প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড় দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়দিনগুলি সূর্য্যকান্ত মণির মত গাঁথা হয়ে যাচ্ছে; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বল্‌ছিলুম আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে; আজ নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সেই যোগটি ঘোষণা করবার রসন্‌চৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজ্‌চে, কেবলি বাজ্‌চে, ভোর থেকে বাজ্‌চে আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দ ক্ষেত্র। কেন? কেন না, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চল্‌চে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের সেই বড় কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সঙ্গীতটি আজ কে বাজাবেন? সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্চে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুল্‌চেন; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদ-মিলনের ঝঙ্কারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলি উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়্‌চে; একই ধুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্চে, এবং একই ধুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্চে!

বীণার তারগুলো যখন বাজেনা তখন তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেয়—তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্য্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক কেউবা লোহার কেউবা পিতলের তবু এক কেউবা সরু সুরের কেউবা মোটা সুরের তবু এক—তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায় দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হোক্ গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বীণাতে সংসারের বীণাতে প্রতি-

দিন তার বাঁধা চল্‌চে, সুর বাঁধা এগচ্চে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর! তখন চেষ্টার মূর্ত্তি কষ্টের মূর্ত্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে এক এক সময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে!

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয় তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই—কেবলি বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি, দিনের পর দিন কেবলি খেটে মরা, কেবলি উঠা পড়া, কেবলি অহং যন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া—কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিমাণ নেই—কেবলি দিনযাপন মাত্র!

কিন্তু যিনি আমাদের বাজিয়ে তিনি কেবলি কি কঠিন হাতে, নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সুরই বাঁধ্‌চেন? তা ত নয়। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কারও দিচ্চেন। কেবলি নিয়ম? তা ত নয়! তার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ! প্রতিদিন খেতে হচ্চে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই মধুর স্বাদটুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠ্‌চে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিশ্বজগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মান্‌তে হচ্চে বটে কিন্তু সেই মেনে চলবার চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠচে। দায়ও যেমন কঠোর, খুসিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার সুবিধেই হচ্চে ঐ! তিনিই সব সুরের রাগিণীই জানেন। যে ক'টি তার বাঁধা হচ্চে, তাতে যে ক'টি সুর বাজে কেবলমাত্র সেই ক'টি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুল্‌তে পারেন। পাপী হোক্ মূঢ় হোক্ স্বার্থপর হোক্ বিষয়ী হোক্, যে হোক্ না, বিশ্বের আনন্দের একটা সুরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়? তা হলেই হল; সেই সুযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝঞ্চনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা কিছু সুর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চারদিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা কোনো সুর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে অহঙ্কারের সঙ্গে যার মিল নেই—যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে, যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে, সেই সুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতি ক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে; সেই সুরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই; সেই সুরে সত্য আমাদের দুঃসাধ্য সাধনের দুর্গম পথে অনায়াসে আহ্বান করে; সেই সুর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্ত্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই সুরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকায়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে সুর যখন বাজেনা তখন আমরা ধূলির ধূলি, তখন আমরা প্রকৃতির অতি ভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট করে দুই হাত জোড় করে অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে বাতাসকে আলোকে সূর্য্যকে চন্দ্রকে পর্ব্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড় বলে দেবতা বলে যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সকল সঙ্কীর্ণ, আমাদের আশা ছোট, আকাঙ্ক্ষা ছোট, বিশ্বাস ছোট, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোট। তখন কেবল খাও, পর, সুখে থাক, হেসে খেলে দিন কাটাও এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার সুর যখনি বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে তখনি কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্য্যের দর্শক, জগদৈশ্বর্য্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দভাণ্ডারের অংশী—তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভীষণ সঙ্গীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃত লোকে জাগ্রত হই! আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি মর্ত্তজীবনকে অনন্তজীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়—লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে! কত জীব তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে কত কালে, সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখ দুঃখের, জন্ম মৃত্যুর, আলোক অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত অভিঘাতে বাজে রূপে জীবনবীণা বাজে! ওগো আমার প্রাণ, [illegible]

আনন্দসঙ্গীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে ; এই আমিটুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মীড়ের পর মীড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্য্যের আলোর বাজ্‌চে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্চে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠ্‌চে। সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মত এমন কত আমির তার আকাশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌চে। কি সুন্দর আমি! কি মহৎ আমি! কি সার্থক আমি!

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মন প্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে তুলে ধরে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রতিদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে, বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার বাজতে থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সঙ্কোচ নেই, কোথাও সঙ্কোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই ;—স্বার্থের সঙ্কোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সঙ্কোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সঙ্কোচ—কিছুমাত্র না! সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্‌ করচে, তার উপর বিশ্বপতির আঙুল যখন যেমনি এসে পড়চে অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ বেজে উঠচে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্চে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্ম্মরিত হয়ে উঠ্‌চে, পশুপক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিল্‌চে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্চে না; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে সকল ধর্ম্মে তার উদার আত্মবিস্মৃত আনন্দ, সূর্য্যের সহস্র কিরণের মত অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়চে। সর্ব্বত্রই সে জাগ্রত, সে সচেতন, সে উন্মুক্ত ; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলেরই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানিনে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যত দিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জান্‌চি, ছোট চিন্তায় ছোট বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্চে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্ম্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারিদিকে শ্রী নেই, ততদিন তোমার জগদ্ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্চে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করচি ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই, ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলে গণ্য করি, ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারিনে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই, ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মত আপনাকে কেবলি পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চল্‌তে চাই ; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলিনে, ধর্ম্ম বাঁচিয়ে চলিনে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলিনে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারিদিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না—চতুর্দ্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্যবিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণশক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্ব্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি—কঠিন এবং প্রবল সঙ্কল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারিনে ;—কী অব্যবস্থাকে কী অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে প্রস্তুত হইনে পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারিনে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে মনে গৃহে গ্রামে সমাজে স্বদেশে সর্ব্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগরণের দিন হোক—আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্বোধনের বিপুলবাণী উদ্গীত হতে থাক, আমরা অতি দীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ম্ময় লোকে নিজেকে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে অনুভব করি, আনন্দ-সঙ্গীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে

চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্ম্মচেষ্টায়, হে রুদ্র! তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক্! আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল—তোমার আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্য্যের আলোক, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আমাদের মন্ত্র, অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই, আমরা মান্‌বনা পরাভব, আমরা জান্‌বনা অবসাদ, আমরা কর্‌বনা আত্মার অবমাননা, চল্‌ব দৃঢ়পদে, অসঙ্কুচিত চিত্তে—চল্‌ব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত করে—তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাক্‌বে, চারিদিক থেকে আহ্বান আস্‌তে থাক্‌বে, এস, এস; এস,—আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চিরজীবনের সিংহদ্বার—কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ—অন্তরে বাহিরে কল্যাণ,—আনন্দং আনন্দং, পরিপূর্ণমানন্দং।

মহর্ষির বার্ষিক শ্রাদ্ধ-বাসর।

বিগত ৬ই মাঘ শুক্রবার মহর্ষিদেবের তিরোধান উপলক্ষে তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় সভা হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারকগণ প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি কৃতবিদ্যলোকের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনা শেষে তিনি মহর্ষি সম্বন্ধে যে চিন্তাশীল প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। তৎপরে শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু তাঁহার বিচিত্র ও ওজস্বিনী ভাষায় মহর্ষি-চরিত্র আলোচনা করেন। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীমৎ মহর্ষি চারত্রের মৌলিকতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতা নিম্নে প্রকাশিত হইল। সঙ্গীত হইয়া সন্ধ্যার পরে সভা ভঙ্গ হইয়াছিল।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

মহাপুরুষদের মৃত্যু নাই, তাঁহারা অমর। মৃত্যুর পরেও তাঁহারা জীবন্তের ন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করেন; আমাদের হস্ত ধরিয়া অমৃতের পথে লইয়া যান—যাত্রী যারা পিছিয়ে আছে তাদের এগিয়ে যাবার সহায়তা করেন। বুদ্ধদেব যখন আপনার মঙ্গলব্রত সমাপন করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুরুদেব, আপনি ত আমাদের সকলকে ছাড়িয়া চলিলেন, এখন আমাদের গতি কি হইবে? আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?' বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "আমি তোমাদের জন্য যে সমস্ত নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছি, আমার শিক্ষা ও উপদেশ, সেই আমার প্রতিনিধি রহিল। তোমরা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না। তোমরা প্রত্যেকে আপনি আপনার প্রদীপ, আপনি আপন নির্ভরদণ্ড!" মহর্ষিদেব সম্বন্ধে ও এই কথাগুলি খাটে। তিনি যদিও এখানে সশরীরে বর্ত্তমান নাই, তবু তিনি আছেন। তিনি আমাদের জন্য তাঁহার পুণ্য জীবন রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা উপদেশ দৃষ্টান্ত তাঁর প্রতিনিধি। এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ—ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁর অমূল্য দান। আমি আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয়ে দুএকটি কথা বলিব। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে, ইহা সার্ব্বজনীন, সকল ধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি; ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম এই দুয়ের শুভমিলন—এই দ্বৈততত্ত্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে প্রথম দেখা আবশ্যক ধর্ম্ম কি? আমরা চারিদিকে সামান্যতঃ

দেখিতে পাই যে কতকগুলি বাহ্যিক আচার ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড জনসাধারণে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। জপমালা তিলক-ধারণ, তীর্থ ভ্রমণ, গঙ্গাস্নান, জাতিভেদের নিয়ম-পালন—এই সমুদয় ধর্ম্ম বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কিন্তু ভ্রাতৃগণ এ সমস্ত কেবল খোসা, বহিরাবরণ, সার বস্তু নয়। কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বর আসল ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক অন্তরের জিনিস; ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া আত্মত্যাগ—এই সমস্ত আধ্যাত্মিক উপকরণে ধর্ম্ম সংগঠিত। যখন আমরা অশেষ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া ন্যায়পথ অনুসরণ করি, যখন অসত্যের আবর্জনার মধ্য হইতে সত্যকে গ্রহণ করি, সত্যকে জীবনের অধিস্বামীরূপে বরণ করি, যখন শত্রুকেও অক্ষুব্ধচিত্তে ক্ষমা-করি, আপনাকে বঞ্চিত করিয়াও দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন করি, যখন স্বার্থত্যাগ করিয়া লোকহিত ব্রতে জীবন উৎসর্গ করি, যখন প্রবৃত্তির প্ররোচনা অগ্রাহ্য করিয়া বিবেকের আদেশ পালন করি, তখনই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয়। ধর্ম্ম সেই যার বলে আমরা সংসারের উপর জয়লাভ করিতে পারি—যার প্রভাবে আমাদের চরিত্রকে মহোচ্চ আদর্শে গঠিত করিতে পারি। মহর্ষির প্রসাদে আমরা উপনিষদের মহাবাক্য শিখিয়াছি

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি
হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃণীতে

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যের সম্মুখে আসে, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া লইতে হয়। বাছিয়া যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়, যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

এই শ্রেয় প্রেয়ের সঙ্ঘর্ষে আমরা প্রেয়কে পরাজয় করিয়া যে ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করি তাহাতেই আমাদের চরিত্র গঠিত হয়, সেই আমাদের অনন্তকালের সম্বল।

আমরা মহর্ষির জীবন পুস্তক হইতে আর একটি বিষয় জানিয়াছি যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা যায়। আমাদের মধ্যে সাধারণ সংস্কার এই যে ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া নির্জনে ধ্যান ধারণা করা আবশ্যক। কিন্তু মহর্ষি তাঁর জীবনে দেখাইলেন যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম পালন করাই শ্রেয়স্কর। তিনি সংসারী ছিলেন অথচ নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিচরণ করিতেন। তিনি মহাজনের হিসাবে যথাসর্বস্ব পণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন "এই আমাদের বিশ্বজিৎ যজ্ঞ," তখন হইতে তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী হইলেন। তিনি আপন প্রিয়তমকে অন্বেষণ করিতে করিতে যে উপানিষদের পাতা কুড়াইয়া পাইলেন তাহাতে কি লেখা ছিল?

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

ঈশ্বরের দান উপভোগ কর কিন্তু ত্যক্ত ভাবে নির্লিপ্ত ভাবে উহা ভোগ করিবে, পরধনে লোভ করিবে না। মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজে থাকিয়াই তাহার বিবিধ কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। সংসার আমাদের কর্ম্মের ক্ষেত্র—কর্ম্মই জীবন। সংসার ছাড়িয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ভীরুর ন্যায় পলায়ন করাতে মনুষ্যত্ব হয় না—সংসারের প্রলোভনরাশি অতিক্রম করিয়া তাহার উপর জয়লাভ করাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব। তা ছাড়া দেখিবে আমরা যেখানেই যাই সংসার ছায়ার ন্যায় আমাদের অনুগামী হয়, এক আকারে না হউক অন্য আকারে। প্রবৃত্তি বাসনা আমাদের সঙ্গের সঙ্গী—তাহাদের হস্ত এড়াইবার উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে একটি কবিতা মনে পড়িল—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যস্য বর্ত্তনং
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং।

রিপুর যে বশ বনে যায় সে কি লাগি?
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যার গৃহে সে বৈরাগী।
অনিন্দিত কর্ম্মে সদা আছে যার মন,
বীতরাগ সে জনার গৃহ তপোবন।

যিনি সংযমী গৃহই তাঁর তপোবন, আর যে ব্যক্তি অসংযতচিত্ত তপোবনও তার অশান্তির আলয়। এই বিষয়ে মহর্ষির যা

উপদেশ তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন—

তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব

ঈশ্বর প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন—জীবনের কর্ত্তব্য পালন—এই তাঁহার উপাসনা। প্রেম ও সেবা এই দুই একত্র না হইলে ব্রহ্মপূজা সম্পূর্ণ হয় না।

এই বীজমন্ত্র হইতে ঈশ্বর ও সংসারধর্ম্ম এ উভয়ের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিরূপিত হইতেছে। ভগবৎপ্রেম মূল প্রস্রবণ, তাহার জলে সংসারক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করিলে তবে সেই ক্ষেত্র সারবান হয় এবং পরিণামে অমৃতফল প্রসব করে। গীতাও উপদেশ দিতেছেন যে, ঈশ্বর উদ্দেশে কর্ম্ম করিবে নহিলে কর্ম্মের বন্ধনকারিতা দোষ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মে বাসনা ত্যাগের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এই ত্যাগের মূল্য কি, যদি ইহার দ্বারা সেই পরমধন লাভ করিতে না পারি। ধর্ম্মের উত্তমাঙ্গ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্ম সারহীন বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে। আমাদের অন্তরে যে সকল গভীর অভাব আছে তাহা পূরণ করা—অনিত্যের মধ্যে নিত্য সত্যবস্তু উপার্জ্জন, দুঃখময় সংসারে শাশ্বত সুখ, পরম শান্তি লাভ করা, এই যে আমাদের আত্মার আকাঙ্ক্ষা, সেই অনন্তজ্ঞান প্রেমস্বরূপ ভিন্ন এ আকাঙ্ক্ষা আর কেহই পূর্ণ করিতে পারে না।

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি

ভূমাতেই আমাদের সুখ—অল্পেতে সুখ নাই।

অনাসক্তি ও বৈরাগ্য সাধনার অঙ্গ। অনাসক্তি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ঈশ্বর প্রীতিতে পৌঁছিতে হইবে, বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে অনুরাগ বন্ধন করিতে হইবে। নৈতিক ধর্ম্ম ব্রহ্মধামে যাইবার সোপানমাত্র। এই ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত যে ধর্ম্ম তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রহ্মের স্বরূপ কি?

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে দেখিতে পাই

অদৃশ্যং অগ্রাহ্যং অরূপমব্যয়ং—

ব্রহ্ম নিরাকার নির্ব্বিকার, ইন্দ্রিয়ের অগোচর অথচ আমরা তাঁহার উপাসনার অধিকারী; মহর্ষির প্রসাদে আমাদের মধ্যে এই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কি প্রকারে হইতে পারে? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি কেনই বা না হইবে? সাকারের চেয়ে নিরাকার কি আমাদের বেশী নিকটের নয়? অদৃশ্যের সঙ্গে আমাদের কি নিকট সম্বন্ধ নাই? বলিতে গেলে, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় রাজ্যেই আমরা বাস করিতেছি। জড় জগতের ন্যায় অধ্যাত্মজগতেও আমাদের অবিশ্রান্ত গতিবিধি। আমরা যা চখে দেখি, কাণে শুনি, ধরিতে ছুঁতে পারি—তাই কি সত্য, তাই সর্ব্বস্ব? এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। এদিকে স্থূল শরীর—অপর দিকে সূক্ষ্ম আত্মা। আমরা যা চখে দেখি তা বাহ্য ক্রিয়া,তার মূল প্রবর্ত্তক অন্তরের ইচ্ছাশক্তি। যা কাণে শুনি তা কণ্ঠধ্বনি, যাহা হৃদয়ে বাজে তাহা সঙ্গীতরস-মাধুরী। আমরা একখানি সুন্দর চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হই, তাহার আকরভূমি চিত্রকরের সৌন্দর্য্যরসবোধ। আমরা সুরস কাব্য পড়িয়া আনন্দিত হই কিন্তু তাহার গোড়ার কথা হচ্চে কবির কল্পনা। স্মৃতির সূত্রে আমরা অতীতকে বাঁধিয়া রাখি, আশার জাল সদূর ভবিষ্যতে বিস্তার করি। সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, আশা সকলি অদৃশ্য অধ্যাত্ম-জগতের জিনিস, অথচ জীবনে ইহাদেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই জড়জগত সূর্য্য চন্দ্র তারা ইহাদের কিছুই গৌরব নাই, যদি ইহাদের মধ্যে এক চৈতন্যময় পুরুষের জ্ঞান ও কৌশল অনুভব না করি। আমরা যেমন আমাদের শরীরের ব্যবধানের মধ্য দিয়া আত্মাকে দেখিতেছি, জানিতেছি—তেমনি এই প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া সেই আত্মার আত্মা

পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি। এই জ্ঞানকে জড়রূপে কল্পনা করা—অসীমকে সীমাবদ্ধ করিয়া অর্চ্চনা করা আমাদের ভ্রমান্ধতা মূর্খতা মাত্র। তাই বলিতেছি আমরা যে অমূর্ত্ত ব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী হইয়াছি ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু এই ঈশ্বর শুধু যে বহির্জগতে দীপ্যমান তাহা নহে, তিনি অন্তরের অন্তর। মহর্ষি এই সত্যটি অনেকানেক উপদেশ দ্বারা আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সকল উপদেশের সারতত্ত্ব এই যে ঈশ্বরকে আত্মাতে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহাকে বাহিরে দেখা দূরে দেখা, আত্মাতে দেখাই যথার্থ দেখা। আশ্রিত কি আশ্রয় হইতে দূরে থাকিতে পারে? পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ বলিয়া গিয়াছেন। "তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন যে আত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জানিতেছে—তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা যখন তাঁহাকে স্পর্শ করে, তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করে, তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে, তাঁহার অমৃত রস আস্বাদন করে, তখন তাহার চক্ষু কর্ণ ও অপর ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক হয় না। তাঁহার সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ যে জীবাত্মাতে তাঁহাতে আকাশেরও ব্যবধান নাই, কেন না তাঁহারা উভয়েই আকাশের অতীত। সেই অমৃতের প্রিয় আবাস-স্থল যে পুণ্যাত্মার হৃদয় তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট, এমন আর কোথাও নাই, আকাশে নাই, পৃথিবীতে নাই সমুদ্রে নাই।"*

একজন খ্যাতনামা ঘোর বিষয়ী জমিদার এক দিন কথায় কথায় মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ঈশ্বর যে আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও দেখি?" তিনি উত্তর করিলেন "ঐ দেওয়াল যে ওখানে আছে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি?" সংশয়বাদী হাসিয়া বলিলেন "দেওয়াল যে ঐ রহিয়াছে, আমি দেখিতেছি, ইহা আর আমি বুঝাইব কি? আরে, ঈশ্বর আর দেওয়াল এ বুঝি সমান হইল?" মহর্ষি বলিলেন এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু—তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন।"

হায়! আমরা বিষয়ার্ণবে মগ্ন থাকিয়া সেই অন্তরতম পরমাত্মার দর্শন পাই না। বন্ধুগণ! এই সকল সাধু-ভক্তদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হও, তাঁহাদের আশ্বাস বচনে আশ্বস্ত হও, সাধনায় তৎপর হও অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিবে। ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁহাকে চায় সেই তাঁহাকে পায়।

প্রথম বয়স হইতেই মহর্ষি ঈশ্বরের জন্য এক গভীর অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম পিপাসায় কত সংস্কৃত কত ইংরাজী দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব সেই অভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচিল না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতে লাগিল। অনেক কঠোর সাধনার পর তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল—তিনি যা চান তাহা পাইলেন। তাঁহার আত্ম-জীবনীতে এই সময়কার আধ্যাত্মিক অবস্থা এইরূপে বর্ণিত আছে;—"এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম, জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা হইলেন এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা করি নাই তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আমার আশাতীত ফল লাভ করিলাম, পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম। হে নাথ, এখন তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আরো জাজ্বল্য হইয়া আমাকে দর্শন দেও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শুনাও। তোমার সৌন্দর্য্য নবতর রূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হউক। তুমি এখন আমার নিকটে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়াই

* ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

চলিয়া যাও, তোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না, তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও। ইহা বলিতে বলিতে অরুণ কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল। তাঁহাকে না পাইয়া মৃত দেহে শূন্য হৃদয়ে বিষাদ অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। এখন প্রেমরবির অভ্যুদয়ে আমার হৃদয়ে জীবন সঞ্চার হইল, বিষাদ-অন্ধকার চলিয়া গেল। ঈশ্বরকে পাইয়া জীবন স্রোত বেগে চলিল, প্রাণ বল পাইল। আমার সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। জানিলাম, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয় সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না!"

আত্মজীবনী—পৃঃ ৪৮, ৪৯।

আরো একটী গভীর তত্ত্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত, সে এই যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। পিতা পুত্রের সম্বন্ধ যেরূপ, সখায় সখায় যেরূপ সম্বন্ধ, আশ্রয় আশ্রিতের যে সম্বন্ধ, জীবাত্মা পরমাত্মার সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঈশ্বরের দ্বারস্থ হইবার জন্য কোন গুরু পুরোহিত বা অবতারের মত কোন মধ্যস্থের প্রয়োজন নাই; তিনি আমার আপন, আমার হৃদয়েশ্বর। এই সম্বন্ধ হইতে পরলোকতত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। যে মানব ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত রহিয়াছে সে মৃত্যুর অতীত শক্তিকে—সেই মৃত সঞ্জীবনী শক্তিকে দেখিতে পায় না। পরলোক তাহার নিকট অন্ধকার। অনন্ত জীবনে বিশ্বাস তাঁহারই জন্মে যিনি অনন্ত স্বরূপের সহিত যোগবন্ধন করেন। এখানেই এই যে যোগের সূত্রপাত, ইহার শেষ এখানেই নহে। ইহা শাশ্বত যোগ, ইহার ভঙ্গ নাই, অবসান নাই। যখন সাধক ঈশ্বরের সহিত এই প্রেম বন্ধন স্থাপন করেন তখন

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ

হৃদয়ের গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রেমবলে বুঝিতে পারি যে সেই প্রেমময়ের সহিত আমার যে বন্ধন তাহা দুদিনের তরে নয়, তাহা অনন্তকালের বন্ধন। সহস্র যুক্তি তর্কে যাহা না হয় এক ব্রহ্মযোগে তাহা সাধিত হয়। মহর্ষি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যানে বলিতেছেন—

"সেই অমৃতের আশ্রয়েই মনুষ্য অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। যতদিন আমাদের সংসারের অধীনতা, ততদিন আমরা মৃত্যুর পাশে বদ্ধ আছি। সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি—ঈশ্বরই অমৃত-নিকেতন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেই আমরা সংসারের পার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পাই" যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই; যেখানে অন্ধ যে সে অনন্ধ হয়, বিদ্ধ অবিদ্ধ হয়, উপতাপী অনুপতাপী হয়; যেখানে যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে"। এই সেই চির-প্রদীপ্ত ব্রহ্মলোক যাহার জন্য আমি আমার এই শেষজীবনে আকুল প্রাণে চাহিয়া আছি।

হে পিতা! আজ আমরা বন্ধু বান্ধব ভাই বোন মিলে তোমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে আর কি জানাব? তুমি তোমার পুণ্যধাম থেকে ক্ষীণপ্রাণ হীনবল যে আমরা আমাদের উপর দৃষ্টি রেখো। যখন আমরা জীবন-সংগ্রামে শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ি তখন যেন তোমাকে মনে করে নূতন উৎসাহ ও সাহস পাই। হে গুরুদেব! তোমার শিক্ষায় আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় সবল হোক্, আমাদের নীরস প্রাণ প্রেম-সলিলে সিক্ত হোক্। আমাদের হীনতা মলিনতা ঘুচিয়া যাক্। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সকল প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করে তোমার প্রদর্শিত পুণ্য পথে অপরাজিত চিত্তে বিচরণ করতে পারি। আর হে পিতা তাঁকে যেন ভুলে না যাই, যাঁকে পাবার জন্য তুমি কত সাধনা, কত তপস্যা করেছিলে, যাঁকে পেয়ে তুমি জ্ঞানতৃপ্ত প্রেমতৃপ্ত হয়ে অক্ষয় সম্পদ শাশ্বত শান্তি লাভ করলে। আমরাও যেন তোমার সেই প্রিয়তমের সহচর অনুচর হয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি এবং জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে তোমার চরণে গিয়া মিলিত হই।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা।

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারিদিকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি সে হচ্চে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক্, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্চে না; তাল সে যত দুরূহ তালই হোক্, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারিদিকেই গতি এবং স্ফূর্ত্তি, স্পন্দন এবং নর্ত্তন, অথচ সর্ব্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করচে, সূর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে কোন এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই—আমরা সকাল বেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে একথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেম্‌নি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য আছে; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য ত সহজ সামঞ্জস্য নয়—এ ত মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে সব শক্তির লীলা তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা—কেউবা পিছনের দিকে টানে কেউবা সামনের দিকে ঠেলে, কেউবা গুটিয়ে আনে, কেউবা ছড়িয়ে ফেলে, কেউবা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্চে, কেউবা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্ত্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। এই সমস্ত শক্তি অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে, তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত; কিন্তু এই সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখ্‌তে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্যে এই সামঞ্জস্যই হচ্চে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তং, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে সত্য সাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে—এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে; কখনই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরায় ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্তকাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্চে। "এষ সেতু বিধরণ লোকানামসম্ভেদায়।"

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্‌গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্ব্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্ব্বাণ শব্দটির অর্থ যে কি ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায় এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়াল সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়াল; সেইদিন থেকে প্রাচীন তপসাশ্রমের স্থলে আধুনিককালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠ্‌ল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে একরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না—বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখ্‌তেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস

ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চল্‌চে, তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক্ এই তাঁদের কথা ছিল, কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করে দিতে হয়।

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে এতবড় একটা বিচ্ছেদ কখনই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না! বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না, কী রাষ্ট্রতন্ত্রে, কী সমাজতন্ত্রে, কী ধর্ম্মতন্ত্রে!

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানা যে হৃদয় পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করে দিলে, অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল।

এখন আবার সকলে একেবারে উল্টো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে সাধনার সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগ্‌ল। তার আর সমস্তকেই খর্ব্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগ-চাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগ্‌ল এবং সেই রকম উপলব্ধি থেকে যে একটা নিরতিশয় ভাব-বিহ্বলতা জন্মায় সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে!

কিন্তু ভগবানকে এই রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনই মানুষ এমন কথা অনায়াসে বল্‌তে পারে যে, ভক্তিপূর্ব্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক্ না কেন তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ যেন, পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষ্যটা যাই হোক্, ভক্তির প্রবলতা দেখ্‌লেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়—কারণ প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই রকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয় সেখানে শক্তিপুঞ্জ একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে ত একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিক্‌কে স্ফীত করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে, তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চ্চায় মানুষ কখনই মনুষ্যত্ব লাভ করেনা এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না!

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ্য হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মত ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কা'কে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচার বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল;—জগদ্ব্যাপারের সর্ব্বত্রই একটা জ্ঞানের, ন্যায়ের, নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দ্দিকে ধূলিসাৎ হতে চল্‌ল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্ম্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্ম্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ

নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বল্লেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্ম্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করেনি, তার পরে যখন জ্ঞান বড় হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম্ম উভয়কে নির্ব্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াল তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্ম্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটী সম্পূর্ণ জুড়ে বসল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোট করে দিলে, এমন কি ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণ গুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্য্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তি সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার সর্ব্বাংশের ক্ষুধা একদিন না-জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্ম্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্ সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্ব্বসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্ম্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায় তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিষ জগতে অনেক আছে—কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয় যে সত্য চায়, সে ত ভুলতে চায়না, সে পেতে চায়। কাজেই সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরতেই হবে—তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিপদ ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে—কিন্তু উপায় নেই—তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসা মাত্র নয় কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়—এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে;—তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয় আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময় বলেছিল—ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাকে চেয়েছিলেন—এই জন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে, গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত্ত তিনি থামতে পারেননি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হননি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেই জন্যেই এদেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী!

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি একথা বুঝেছেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়—শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায় কেননা সমস্ত রসের সার তিনি—রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয়-দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন:—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্যপ্রকাশ করতে চায় তখন বার বার ফিরে ফিরে আসে কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা, মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে;—সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে একথা কাউকে বলে না যে, তুমি দুর্ব্বল, তোমার সাধ্য নেই, কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়,—আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে এতই নিবিড় করে দেখে যে সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না—পথ যত দীর্ঘ দুর্গম হোক্ না এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃত-ভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন—আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদ-বিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক্ থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক্ থেকে নয় এই জন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের

প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্ম্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের ও পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনো মতে তাঁর কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্চেন-তা ভাল করে জানবার পূর্ব্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এই জন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন, পরিমিত পদার্থের মত করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মত যাঁকে না-পাওয়া যায় না—যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব্ব করতে হয় না অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না—যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট নন, যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানিনে সেও তাঁকে জানেনা। এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্চে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন ভগবৎ-পিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল! অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্য্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্চে—সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্য্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখেছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুতঃ যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন তেমনি পারস্যের সৌন্দর্য্যকুঞ্জের বুল্‌বুল্ হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দ-প্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্য্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেম্‌নি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলি রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্ম্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটা মাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবার রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এই রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করেনি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারাই সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশ বাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্ম্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এই-জন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হোক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হোক্ নির্জ্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি।—তাঁর ব্রহ্ম একলার নয়, তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম;—নির্জ্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা, অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্ম্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্চে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা এ'কেই নির্দ্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। একথা মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ

করে এনেছিলুম; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর কর্ম্মের যেখানে যথার্থ বীর্য্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্যাতন স্বীকার করে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ করে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করিনি। দুর্ব্বলতা বশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্ব্বলতা এপর্য্যন্ত কেবলি বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন—তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রলয় ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্ব্বপ্রকার আঘাত এসে পড়েছিল, তারি মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করিছিলেন তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতি-দুর্গের যে রুদ্ধদ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে, আপনার ধর্ম্মকে সমাজকে আপনার আচার ব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আস্তে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়ের সঙ্কোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠ্‌চে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্যব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্চে, সেইখানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্চে, সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্চে এবং সেইখানেই প্রবলবেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্চি—এই রকম সময়েই যে সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জল করে তোলা যাতে করে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে, যে বিশ্লিষ্টতা এদেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্ম্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলচে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদ-কাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্য্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না, ঘরে বাইরে, শয়নে, আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্ম্মে, কি বিষয় কর্ম্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে সম্পন্ন করতেন—তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্য্যন্ত যাহা-কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার বা সৌন্দর্য্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটবড় এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে, নিয়মের মধ্যে বেঁধে, কাজের মধ্যে সম্পন্ন করে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান-পর্য্যন্ত দেখা গেছে তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোন বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি—সর্ব্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসী পর্ব্বতে গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম একদিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্ব্বত্যগৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বস্‌তেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করতেন—তেমনি আবার জ্ঞান আলোচনার সহায়-স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিন খানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কান্টের দর্শন ও গিবনের রোমের ইতিহাস ছিল;—তা ছাড়া এদেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্ম্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের যা কিছু পরিণতি ঘটচে সমস্তই মনে মনে পর্য্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্ব্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে;—গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্য-বোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্ব্বদা কি রকম জাগ্রত ছিল তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক ষ্ট্রীটে বাস করতেন—একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্কষ্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বল্লেন, দেখ আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্চি কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে

দেবেনা।—আমি বেশ বুঝতে পারলুম শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্ত্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল—সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণ চিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্য্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় করে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অচুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক্! তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্তকালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়চে, এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করচে। সকল শক্তি সকল কর্ম্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হোক্! কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্ব্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্ত্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায়—সেইখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে' বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকে;—আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্ব্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্ম্মসাধনায় ও কর্ম্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্ব্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে; সকল প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসঙ্গত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেল্চে; নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধি ও দুর্ব্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্ব্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি, সেই জন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিত্রে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সঙ্কোচমাত্র বোধ করিনে এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার চির-প্রচলিত আচার বিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেই জন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সঙ্কুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলি নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্ব্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্ব্বেই দুটি একটি করে ভক্ত বিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চম স্বরে আনন্দবার্ত্তা ঘোষণা করচে, আজ আমরা দেশের নব উদ্বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ম্ময় কল্যাণসূর্য্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা।

মহর্ষিদেবের চরিত্রের বিষয়ে যখন চিন্তা করি, তখন তাঁহার মৌলিকতা দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই। তাঁহার প্রথম মৌলিকতা এই, তিনি যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, তখন গুরূপদেশের সাহায্য বিনা তাহা লাভ করিলেন। সাধুসঙ্গে বসিয়া সদুপদেশ পাইয়া মানুষের মন পরিবর্ত্তিত হয় ইহা স্বাভাবিক। গুরূপদেশে কোনও নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব মানব-হৃদয়ে প্রতিভাত হয় ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু মহর্ষি কোন্ সাধুসঙ্গ করিয়া কোন্ গুরূপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন? তাঁহার আত্মচরিতে তিনি নিজেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে গুরূপদেশ ব্যতীত ঐ পরমতত্ত্ব স্বতই তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। ঐ আলোক অতর্কিত ভাবে তাঁহার চক্ষে আসিয়াছিল এবং তাঁহার জীবনকে

অধিকার করিয়াছিল। পরমাত্মা পরম পুরুষ তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এই তাঁহার প্রকৃতির অদ্ভুত রহস্য।

তাঁহার দ্বিতীয় মৌলিকতা এই—যে তিনি উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান লইলেন অথচ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের যে প্রধান লক্ষণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। সকলেই জানেন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈতবাদের সহিত জড়িত; আত্মা পরমাত্মার অভেদ-বুদ্ধির উপরেই তাহা স্থাপিত। এই উপনিষদ বা বেদান্তের উপরেই ভিত্তি স্থাপন করিয়া শঙ্কর অদ্বৈতবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। মহর্ষি উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান লইলেন কিন্তু অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলেন না।

তাঁহার তৃতীয় মৌলিকতা এই—যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লইলেন বটে কিন্তু অদ্বৈতবাদের ন্যায় আমাদের প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানের আর একটি লক্ষণ বর্জ্জন করিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান সমাজ-বিমুখ অর্থাৎ তাহা জনসমাজকে ও সামাজিক সম্বন্ধ সকলকে মোহজাল বলিয়া মনে করে। তাহা মানবকে বলে

> কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—
> সংসারোর মতীব বিচিত্রঃ।
> কস্য ত্বংবা কুত আয়াত—
> স্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।

অর্থাৎ হে ভাই তোমার আবার স্ত্রী কে, তোমার আবার পুত্র কে? এসংসার অতি বিচিত্র, তুমি কবে কোথা হইতে আসিয়াছ, তাহা একবার চিন্তা কর।

এইরূপে জ্ঞানমার্গ এদেশে সন্ন্যাসীর মার্গ হইয়াছে। মহর্ষি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলেন, অথচ সমাজ-বিমুখ হইলেন না, ব্রহ্মজ্ঞানকে গৃহ পরিবারে ও জন-সমাজে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। এ কেমন মৌলিকতা।

চতুর্থতঃ এদেশে চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, জ্ঞানপথাবলম্বিগণ ভক্তি পথাবলম্বিদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ভক্তগণ জ্ঞানীদিগকে গর্ব্বে স্ফীত ও পথভ্রান্ত মনে করেন; এবং ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই ধর্ম্মজীবনের চরিতার্থতা অন্বেষণ করেন। আবার কর্ম্মীগণ জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া বাহ্য ক্রিয়া কলাপে পরিতৃপ্ত থাকেন। কিন্তু মহর্ষিদেবের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম—তিন সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। তিনি জ্ঞানে উপনিষদের ঋষিদের অনুসারী ছিলেন, ভক্তিতে ভক্ত হাফেজের পক্ষপাতী ছিলেন, কর্ম্মে সাধন-নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ মানুষ ছিলেন। রবিবাবু এতৎ পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন তাহাতে ভক্তি ও ভাব এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা মনে রাখিবার মত কথা। এতদ্দেশে ভক্তি পথের সাধকগণ অনেক সময় ভাবুকতাকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভাবুকতা ভক্তি নহে। ভাবোচ্ছ্বাস ক্ষণিক—সাময়িক, তাহা মানবচরিত্রের উপরে থাকে, বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহার জোয়ার ও ভাঁটা আছে। ভক্তির জোয়ার ভাঁটা নাই তাহা অবিশ্রান্ত গতিতে আত্মার অন্তস্তম তলে প্রবাহিত থাকে। যে ভক্তির নামে ভাবুকতাকে দেখিতেছে, ভাবোচ্ছ্বাসের উপরে তাহার দৃষ্টি; ভক্তির গম্য ও আরাধ্য কে ও কি প্রকার তাহার সহিত তাহার তত সম্পর্ক নাই। আজ একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে লইয়া যে প্রকার ভাবোচ্ছাস হইতেছে, কল্য যদি ধড়াচুড়াধারী কৃষ্ণমূর্ত্তিকে লইয়া বা কালীমূর্ত্তিকে লইয়া সেরূপ হইতে পারে, তবে ঈশ্বরের বদলে ধড়াচূড়াধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি লইতে তার আপত্তি

নাই। মনে কর, একজন মাতাল সে নেশা চায়, সুরার মাদকতার প্রতি তার দৃষ্টি, সেই জন্যই সে সুরাকে চায়। তুমি যদি সুরার পরিবর্ত্তে অডিকলোঁ খাওয়াইয়া সেইরূপ মত্ততা উৎপন্ন করিতে পার, তবে যাক সুরা আসুক আর আডিকলোঁ, তাহাতে কি? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি ছিল, কিন্তু ভাবুকতাত্মক ভক্তি নহে, তাহা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে হৃদয়ের প্রসার, প্রীতি-জনিত একাগ্রতা। তাঁহার জ্ঞান ভক্তিকে প্রসব করিয়াছিল, ভক্তি নীতিকে উৎপন্ন করিয়াছিল।

তাঁহার এই নীতির মধ্যেও আবার একটু বিশেষত্ব ছিল। এ জগতে সচরাচর যে নীতি দেখা যায়, তাহা লৌকিক নীতি। জনসমাজের সুখ অসুখের প্রতি মানবের স্তুতি নিন্দার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে নীতির নিয়ম সকল নির্ণীত হয়। "ওরে অমন কাজ করিস না, লোকে বল্‌বে কি"? এই ভাব সে নীতির মূলে। সুতরাং এ এ নীতিতে উত্থান পতন আছে। দেখা যায় সমাজভেদে অবস্থাভেদে তাহার ব্যবস্থার তারতম্য আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নীতি এরূপ লৌকিক নীতি ছিল না। তাঁহার নীতি পারমার্থিক নীতি ছিল। তিনি পরমাত্মার সহিত বিশুদ্ধ প্রীতি যোগে যুক্ত হইয়া অধ্যাত্মযোগের সাহায্যে নীতির ব্যবস্থা সকল নির্দ্ধারণ করিতেন। যে কার্য্যে বা যে আচরণে বা যে কথনে তাঁর অধ্যাত্ম যোগের ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বিষের ন্যায় বর্জ্জন করিতেন। আর যাহাতে সেই যোগকে ঘনীভূত করিত, তাহাকে বরণীয় মনে করিতেন। এই তাঁহার এক মহত্ত্ব।

সর্ব্বশেষে আমরা তাঁহাতে আর একটী স্মরণীয় বিষয় দেখিয়াছিলাম, যাহাতে তাঁহার মৌলিকতাকে প্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় প্রাচ্যানুরাগে উদ্দীপ্ত ছিল। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের উক্তির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়াছি, আর কাহারও এরূপ দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না। যাহা কিছু এদেশীয়, যাহা কিছু হিন্দু তাহা তাঁহার হৃদয়ের প্রিয় ছিল, অথচ তাঁহার সেই প্রাচ্যানুরাগ প্রতীচ্য বিদ্বেষকে উৎপন্ন করে নাই। প্রতীচ্য দর্শন প্রতীচ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। তিনি নিজের অধীত যে সকল গ্রন্থ বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে দিয়া গিয়াছেন, গিয়া দেখুন তাহাতে ক্যান্ট, ফিক্‌টে, কুজান, স্পেন্সার মিল প্রভৃতি ইউরোপীয় মনস্তত্ব-বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিদিগের গ্রন্থাবলি রহিয়াছে। ঐ সমুদয় গ্রন্থের পার্শ্বে তাঁর নিজের পেনসিল লিখিত মন্তব্য রহিয়াছে। কি রূপ মনোযোগের সহিত তিনি সেগুলি পাঠ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাতে যাহা দেখিয়াছি, তাহার সকল কথা বলিবার সময় নাই। সংক্ষেপে বলি প্রতীচ্য বিদ্যাবিষয়ে তিনি আমাদের মধ্যে একজন পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন।

সংক্ষেপে আমার মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, আমি যাহাকে ধর্ম্ম-জীবন বলি, তাহার এরূপ পূর্ণ আদর্শ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম, ধন্য ব্রাহ্মসমাজ যে এমন আদর্শ উৎপন্ন করিয়া দেখাইতে পারিয়াছে।

নানা কথা।

(প্রাপ্ত)

মহর্ষির দীক্ষাদিন উপলক্ষে ৭ই পৌষ বোলপুর শান্তিনিকেতনে একটি উৎসব হইয়া থাকে। শান্তিনিকেতন

স্থানটি লুপ্‌লাইনের বোলপুর ষ্টেসন হইতে একমাইলের কিছু অধিক দূরে উচ্চভূমির উপর স্থাপিত। বৎসরের ভিতর, ঐ ৭ই পৌষের দিন এই আশ্রমটি একেবারে জনাকীর্ণ হইয়া উঠে। বহুপূর্ব্বে স্থানটি অতি নির্জ্জন ছিল; ইহার খোঁজ কেহ রাখিত না। পরে মহর্ষির সাধনক্ষেত্র হওয়ায় আজ শান্তিনিকেতন অনেকেরই নিকট সুপরিচিত শান্তিনিকেতনের সংলগ্ন আশ্রম-বিদ্যালয়ও সেদিন উৎসবানন্দে উল্লাসিত হইয়া উঠে। উৎসব উপলক্ষে এখানে একটি মেলার সমাগম হয় তাহা কেবল ঐ একদিনের জন্য। নিকট এবং দূর হইতে দোকানপাট্ লইয়া অনেক লোক একত্রিত হয়। ৬ই পৌষ হইতে শান্তিনিকেতনের সম্মুখের মাঠ দোকানীদের অস্থায়ী বিপনীরচনায় লোকসমাগমের সূচনা করিয়া দেয়। ৭ই পৌষ তাহা একেবারে জমিয়া উঠে। জন সাধারণের আমোদের জন্য প্রতি ৭ই পৌষের সন্ধ্যা-উপাসনার পর বিবিধ প্রকারের 'আতসবাজি পোড়ানো' হইয়া থাকে। এইরূপ 'বাজিপোড়ানো' দেখিবার সুযোগ নিকটবর্ত্তী বীরভূমবাসিগণ অতি অল্পই লাভ করিয়া থাকেন। তাই লোকেরা অধিকাংশই মেলা ও 'বাজিপোড়ানো' দেখিবার জন্যই কৌতুহলী হইয়া সমাগত হয়। ইহার ভিতরের উপলক্ষটির সহিত তাহারা বড় যোগদিতে পারে না।

উৎসব-উপলক্ষে বাহির হইতেও অনেক ভক্ত সমাগত হইয়া থাকেন। এবারকার উৎসবে বাঁকীপুর হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় ও শিলঙ হইতে জনৈকা ব্রাহ্ম মহিলা ও দুইজন ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়াছিলেন। এ'ছাড়া কলিকাতা হইতেও অনেক বন্ধু ও উপাসক আগমন করিয়াছিলেন। এবারকার উৎসবের একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

এবার ৭ই পৌষে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অন্যান্য দিন অপেক্ষা কিছু প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া উপাসনা মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। স্নানের পর সকলে মন্দিরের উপাসনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ছাত্রগণ সকলে যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল,—সকলে সুস্নাত সুশোভন ও সুন্দর। ক্রমে তাঁহারা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সকলের মুখেই পবিত্রতার আলো। আশ্রমলক্ষ্মী যেন সে দিন তাঁর সন্তানগুলির ললাটে তাঁহার পুণ্যহস্তের স্পর্শদান করিয়া তাহাদিগকে জগৎ-পিতার চরণে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অভ্যাগত ভদ্রলোক, অধ্যাপকগণ, বিদ্যার্থীরা এবং আরো কত লোক সেদিন একই উদ্দেশ্য লইয়া মন্দিরে দ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রাতের উপাসনায় যে সকল গান গীত হইবে তাহা ছাপান ছিল; তাহাই মন্দির-দ্বারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একখানি করিয়া দেওয়া হইল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিলেন। চারিদিকে কি গভীর শান্তির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। নির্ম্মল উষার আলোক তখন আশ্রমের প্রতি বৃক্ষ-চূড়ায় আসিয়া পড়িতেছিল। ভিতর এবং বাহির দুই-ই সে দিন প্রভাতে অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য এবং পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল।

মন্দিরের ভিতর স্থানাভাব হওয়ায় অনেকে বাহিরে বসিলেন। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ অর্চ্চনার পর উদ্বোধন করিলেন। তিনি যে অভয় বাণীতে উৎসবক্ষেত্রে সমগ্র মানবকে আহ্বান করিলেন তাহাতে মন নির্ভয় হইল। এবার উপাসনার সমস্ত সঙ্গীতগুলিই আশ্রম-বিদ্যালয়ের সুকণ্ঠ বালকবৃন্দের দ্বারা গীত হইয়াছিল। সঙ্গীতগুলি উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়কে গভীর তৃপ্তিদান করিয়া উপাসনায় চিত্তসমাধান করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

প্রথম সঙ্গীতের পর এবং স্বাধ্যায়ের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী হইতে একটি গান গাহিলেন। সঙ্গীতটি যেন উৎসব-উৎসকে একেবারে খুলিয়া দিল। ইহার পর আশ্রমের বালকবৃন্দ কয়েকটি মনোরম সঙ্গীত গান করিলেন। সেগুলি সমস্তই ঐ ভক্ত কবির নবরচিত। সঙ্গীতের পর রবীন্দ্রনাথ একটি লিখিত উপদেশ পাঠ করেন। "বাজে বাজে জীবন-বীণা বাজে"—এই জীবন-বীণার সুরে সেদিনকার প্রত্যেক উপাসকের হৃদয়তন্ত্রী কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। উপদেশ পাঠের পর বালকগণ সুমধুর কণ্ঠে শেষ কয়েকটি সঙ্গীত গান করিলেন। তৎপরে প্রাতঃকালের মত মন্দিরের কার্য্য শেষ হইল। সকলে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যথাযোগ্যকে নমস্কার ও আলিঙ্গনের দ্বারা উপাসনার উপসংহার করিলেন।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া দেখি বাহিরে লোক আর ধরে না। ভোরের বেলা হইতে জন সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেখি দোকান বসিয়াছে ও বাজির তাঁবু পড়িয়াছে। সম্মুখে একেবারে লোকে লোকারণ্য।

উদ্যানের সপ্তপর্ণ বৃক্ষটি আশ্রমের প্রাচীনতম বনস্পতি। যখন শান্তিনিকেতন জনশূন্য দিগন্তবিস্তৃত মাঠ মাত্র ছিল, যখন ইহার মধ্যবর্ত্তী পথ দস্যুদের লীলাভূমি ছিল, সে দিনে মহর্ষি এই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় এই বৃক্ষের নিম্নে আপনার ধ্যানাসন পাতিয়াছিলেন। তখন কোথায় মন্দির, কোথায়

উৎসব, কোথায় শান্তিনিকেতন, আর কোথায় এই ব্রহ্মবিদ্যালয়? কয়েক বৎসর হইল এই বৃক্ষের নিম্নে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদিকা রচিত হইয়াছে। বেদিকার সম্মুখে প্রস্তরে "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" খোদিত রহিয়াছে। এই-স্থানে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া কতদিন তিনি জগৎ পিতার সহিত যুক্তাত্মা হইয়া জীবনকে ধন্য করিয়াছিলেন। এই সেই মহাত্মার সাধনপীঠ। এখানেই দিনান্তে তিনি নিজের সমস্ত তপস্যা সম্মুখস্থ অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সহিত তাঁহার পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া দিতেন। আমরা সকলে সেই বেদিকার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলাম। অন্যান্যবারে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক পূজনীয় ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় আসিয়া এই স্থান পরিবেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন গাহিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এবার আর কীর্ত্তন হইল না কিন্তু আর একটি আনন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আশ্রম-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদিকা-সম্মুখে বসিয়া আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সে উপলক্ষে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেরই প্রাণে কর্ত্তব্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। উপদেশে রবীন্দ্রনাথ দীক্ষার্থীকে দীক্ষা গ্রহণের গুরুতর দায়ীত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মহর্ষির সাধনক্ষেত্রে তাঁহারই দীক্ষার দিনে দীক্ষা লাভ করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের আত্মা ধন্য হোক।

মেলার মধ্যে প্রতিবারই একটি যাত্রার দল অভিনয় করিয়া থাকে। ইহাতে বোলপুর এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক আকৃষ্ট হইয়া আইসে। আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দও তাহা শ্রবণ করে। যাত্রা-ভাঙিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। জলযোগাদির পর সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার মন্দিরে উপাসনা হয়। কিন্তু বাহিরের জনতা এমন প্রবলবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গোলমাল উৎপন্ন করে যে তাহাতে মন্দিরের কাঁচের দেওয়ালের নানা স্থান আঘাত লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মন্দিরের ভিতরের উপাসনাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই জনপ্রবাহকে আটকাইয়া রাখাটাও ভাল দেখায় না। এই সকল কারণে এবার সাধারণের জন্য মন্দিরে ও যাঁহারা অন্তরের সহিত উপাসনায় যোগ দিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য ছাতিমতলায় সন্ধ্যায় উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ছাতিমতলা পরিষ্কার করিয়া বেদির সম্মুখে সতরঞ্চ পাতিয়া ও গাছের ডালে ডালে বিচিত্র কাগজের জাপানীলণ্ঠন ঝুলাইয়া দেওয়ায় উপাসনার স্থানটি বড়ই মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানটি মেলার এক প্রান্তে বলিয়া তাহা মন্দির হইতে অপেক্ষাকৃত কোলাহলশূন্য ছিল। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা আরম্ভ করিলেন। এবেলাও ছাত্রেরাই গান করিয়াছিল ও গানের ছাপানো কাগজ দেওয়া হইয়াছিল। উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, মহর্ষির আদর্শটিকে তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় অতি হৃদয়গ্রাহী করিয়া ব্যক্ত করেন। মহর্ষির জীবনীতে প্রতিভাত সত্যকে তিনি এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। মহর্ষির জীবনে কর্ম্মে ও ভাবে ধ্যানে এবং অনুষ্ঠানে যে একটি সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত লাভ করা যায় তাহাও এই উপদেশে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সঙ্গীতের পর উপাসনা শেষ হইল। উঠিবার সময় মনের অবস্থা আলোচনা করিয়া বুঝিলাম কিছু লাভ করিয়াছি।

ইহার পর আতসবাজি পোড়ানো আরম্ভ হইল। বহুবিধ বাজি প্রস্তুত হইয়াছিল। এরূপ প্রতি বৎসরই হয়। একটি বাজিতে "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" উজ্জ্বল নীল অক্ষরে রচিত হইয়াছিল, সেটি অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল।

ইহার পর উৎসবের আড়ম্বর ফুরাইল। সকলে কলকোলাহলে ধীরে ধীরে গৃহের দিকে ফিরিয়া চলিল। আশ্রমপ্রান্তের পথ আলোকে একেবারে খচিত হইয়া উঠিল,—যেন আলোর মালা চলিয়াছে। তখন নক্ষত্র-খচিত নিশীথের অক্ষুব্ধ বিরাট্ শান্তি সকলের মস্তকে উৎসব দিবসের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া অস্ফুট-ধ্বনিতে স্বস্তিপাঠ করিতেছিল।

আশ্রমবিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র।

মাঘোৎসব।—বিগত ১১ই মাঘ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একাকী আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপাসকবৃন্দে সমাজগৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার অমূল্য উপদেশ এবার স্থানাভাব বশত পত্রিকায় প্রকাশিত হইল না। রাত্রের উপাসনাতেও শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় মুগ্ধ হন নাই এমন একজনও উপস্থিত ছিলেন না। তাহাও আগামী বারে প্রকাশিত হইবে। মহর্ষির বাটীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গনে প্রায় আড়াই হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। এ বৎসর প্রাতে ও রাত্রের সমুদয় সঙ্গীত রবি বাবুর রচিত। তৎসমুদায়ের স্বরলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পর দিন রবীন্দ্র বাবু আহুত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করেন। তাঁহার নামে সমাজগৃহের মধ্যে লোকের ইয়ত্তা ছিল না। রাস্তায় ফুটপাথ পর্য্যন্ত লোক দাঁড়াইয়াছিল। সে ব্যূহ ভেদ করিয়া সমাজগৃহে প্রবেশ করে কার সাধ্য। অনেককেই বিমুখ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। তাঁহার চিন্তাশীল সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্র বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় সমগ্র বঙ্গদেশ স্তম্ভিত সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।
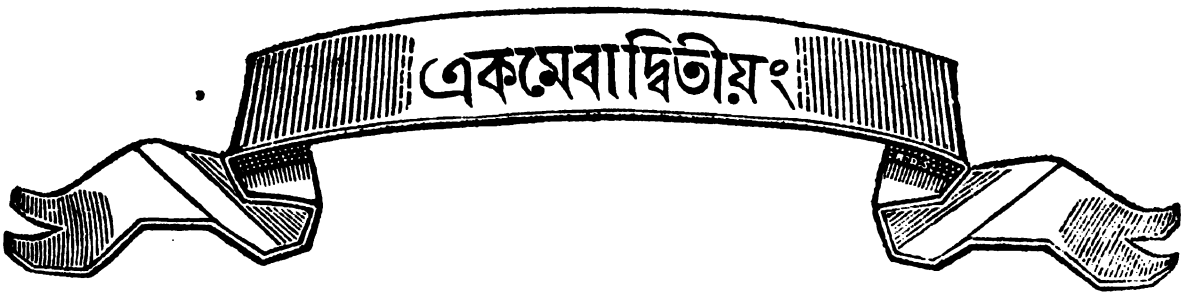
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশকল্প।

চতুর্থ ভাগ।

১৮৩২ শক।

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৭। সম্বৎ ১৯৬৭। কলিগতাব্দ ৫০১১। ১ চৈত্র, বুধবার।

মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সপ্তদশ কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ৮০১ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ৮০২ সংখ্যা।

আষাঢ় ৮০৩ সংখ্যা।

শ্রাবণ ৮০৪ সংখ্যা।

ভাদ্র ৮০৫ সংখ্যা।

আশ্বিন ৮০৬ সংখ্যা

কার্ত্তিক ৮০৭ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ৮০৮ সংখ্যা।

পৌষ ৮০৯ সংখ্যা।

মাঘ ৮১০ সংখ্যা।

ফাল্গুন ৮১১ সংখ্যা।

চৈত্র ৮১২ সংখ্যা।

৵০ অকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তদশ কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

একাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রাতঃকালের বক্তৃতা।

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্চে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বল্‌চে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে—দেখচি, যা কিছু সব নিয়মেই চল্‌চে এর মধ্যে আনন্দ কোথায়? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাস্‌চে।

সূর্য্যচন্দ্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠ্‌চে অস্ত যাচ্চে যে, মনে হচ্চে তারা যেন ভয়ে চল্‌চে পাছে এক পল-বিপলেরও ত্রুটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয় যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে ওর মধ্যেও পাগলামি কিছুই নেই—সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয়, সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাইনে বলে যাকে হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে দেখে আমরা চমকে উঠি তাকেও জোড় হাতে নিয়ম পালন করে চল্‌তে হয় একটুও পদস্খলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গূঢ় খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে"—তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে; বাতাসও মুক্ত নয়—"ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"—তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে কেবল যে অগ্নি চন্দ্রসূর্য্য চল্‌চে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাট্‌বার জন্যেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে বলে মনেও হয় না, সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চল্‌চে।

তবে ত দেখচি ভয়েই সমস্ত চল্‌চে কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন? যেখানে কারখানা ঘরে আগাগোড়া কল চল্‌চে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু ত আজ আনন্দের সুর উঠেছে এ কথা ত কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে ত মানুষ এমন করে ডাকে, বলে চল ভাই আনন্দ করবি চল্? এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয় কেন?

সে দেখ্‌তে পাচ্চে, নিয়মের কঠিন দণ্ড একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুট্‌তে দেখিনি? দেখিনি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য? দেখ্‌চিনে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা?

বিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরমরূপে প্রচার করচে না—একটি অনির্ব্বচনীয়ের পরিচয়

তাকে চারিদিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্চে। সেই জন্যেই, যে উপনিষৎ একবার বলেছেন, অমোঘ শাসনের ভয়ে যা কিছু সমস্ত চলেছে, তিনিই আবার বলেছেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জায়ন্তে" আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত জন্মাচ্চে। যিনি আনন্দস্বরূপ মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করচেন।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাঁধন মানে। কিন্তু যে লোকের নিজের মনের মধ্যে ভাবের উদ্বোধন হয়নি, সে বলে, এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখ্‌চি। সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেননা সেইটেই চোখে দেখা যায়—কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না—সে বলে রস কিছুই নেই সে মাথা নেড়ে বল্‌চে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু ঐ যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে—রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখ্‌তে পাচ্চেন। জগতের নিয়ম ত তাঁর কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্চে না, তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" জগতে তিনি ভয়কে দেখ্‌চেন না, আনন্দকেই দেখ্‌চেন সেই জন্যেই বল্‌চেন "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্ব্বত্র জান্‌তে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। এমনি করে জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন—তিনিই বলেছেন "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" এই মহদ্ভয়কে এই উদ্যত বজ্রকে যাঁরা জানেন তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয় কিন্তু সে যে আনন্দেরই বন্ধন—সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভুজবন্ধনের মত; তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুসি হয়ে গ্রহণ করে, কোনোটাকেই এড়াতে চায় না, কেননা সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, সেইখানেই তাকে বাঁধে, তাকে মারে, সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আকর্ষণে সত্যের সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্খলিত হয়ে পড়ে তখনি সে মাতার আলিঙ্গনভ্রষ্ট শিশুর মত কেঁদে উঠে বলে "মা মা হিংসীঃ" আমাকে আঘাত কোরোনা। সে বলে বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো, অন্তরে বাঁধো, বাহিরে বাঁধো, আমাকে আচ্ছন্ন করে, আবৃত করে বেঁধে রাখো, কোথাও কিছু ফাঁক রেখোনা—শক্ত করে ধর, তোমারই নিয়মের বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমার আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি—আমাকে পাপের মৃত্যুবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা কর।

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান ক'রে কেউ কেউ যেমন মাৎলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যারা কর্ম্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু এই কথা মনে রাখতে হবে নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কর্ম্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্ম্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্ম্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করচে, তাই যদি না হত তাহলে কখনই সে ইচ্ছা করে কর্ম্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম্ম করচে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুল্‌চে, ততই সে আপনার সুদূরবর্ত্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আস্‌চে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলি স্পষ্ট করে তুল্‌চে—মানুষ আপনার নানা কর্ম্মের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানাদিক থেকে দেখ্‌তে পাচ্চে।

এই দেখ্‌তে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মত ভয়ঙ্কর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের চেষ্টা। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকার গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্চে। আমাদের আত্মাও অনির্দ্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলি কর্ম্ম সৃষ্টি করচে। যে কর্ম্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয় তাকেও কেবলি সে তৈরি করে তুল্‌চে। কেননা সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ

থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখ্‌তে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্য্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য্য—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তিদান করে, সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করেনা। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্য্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে নানাবিধ কর্ম্মের ভিতরে কেবলি বন্ধনমুক্ত করে দিচ্চে। যতই তাই করচে, ততই আপনাকে মহৎ করে দেখ্‌তে পাচ্চে—ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে।

উপনিষৎ বলেছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্চে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্ব্বল মুহ্যমানভাবে বলেননা, জীবন দুঃখময় এবং কর্ম্ম কেবলি বন্ধন। দুর্ব্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্ব্বেই খসে যায়—তাঁরা তেমন নন্‌। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়চিনে। তাঁরা সংসারের মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখ দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্মকে উত্তরোত্তর উদ্ঘাটিত করে আপনাকে দেখে এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মত সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করচে—তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে;—তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্য্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তরবাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা করবে।

মানুষের মধ্যে এই যে জীবনের আনন্দ, এই যে কর্ম্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। একথা বল্‌তে পারব না এ আমাদের মোহ, একথা বল্‌তে পারব না যে এ'কে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্ম্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারবনা। ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্ম্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্ম্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্য দৃষ্টিতে দেখ। যদি তা দেখ তাহলে কর্ম্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে? তাহলে আমরা দেখ্‌তে পাব কর্ম্মের দুঃখকে মানুষ বহন করচে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য, কর্ম্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করচে, বহু ভার লাঘব করচে; কর্ম্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেল্‌চে অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম্ম করচে,—তার একদিকে দায় আছে, আর একদিকে সুখও আছে; কর্ম্ম একদিকে অভাবের তাড়নায়, আর এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এই জন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করচে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্ম্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করচে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে—নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে মারচে। কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠ্‌লনা; পশু পক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্চে তাতেই সে চুপ করে থাক্‌তে পারলে না,—কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। মানুষের মত কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে; এইখানে কতকাল থেকে সে কত ভাঙচে গড়চে, কত নিয়ম বাঁধ্‌চে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্চে, কত পাথর কাটচে কত পাথর গাঁথচে, কত ভাব্‌চে কত খুঁজ্‌চে কত কাঁদ্‌চে; এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড় বড় লড়াই লড়া হয়ে গেছে; এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে, এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়; এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায়নি নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে; এইখানেই মানুষ সেই মহত্তত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারিদিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক বড়, এই জন্যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তার আরাম হতে পারে কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়—সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না—এই জন্যই, তার বর্ত্তমানকে ভেদ করে বড় হবার জন্যই, এখনো সে যা হয়ে ওঠেনি তাই

করতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলি বারবার দুঃখ পেতে হচ্চে; সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব; এই কথা মনে রেখে মানুষ আপনার কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে নি; কেবলি তাকে প্রসারিত করেই চলেছে; অনেক সময় এতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পড়চে যে, কর্ম্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্চে, কর্ম্মের স্রোতে বাহিত আবর্জ্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক একটা কেন্দ্রের চারিদিকে ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত রচনা করচে, স্বার্থের আবর্ত্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত্ত; কিন্তু তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই, সঙ্কীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে; কারণ চিত্ত অচল অজড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠতে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম্ম করতে হবে, কর্ম্ম করে বেঁচে থাকতে হবে এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম্ম করা এবং বাঁচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণ হচ্চে এই, যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই; তাকে বাইরে আসতেই হবে। তার সত্য অন্তর এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাকতে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্নজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয় তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখনা কেন, শরীরকে ত নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয়; এক নিমেষও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই। তবু দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের কাজ করেও স্থির থাকতে পারে না। তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটিয়ে বেড়ায়! কেবলমাত্র ভিতরের রক্ত চলাচলেই তার তৃপ্তি নেই, নানাপ্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবলমাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্ব্বদাই তার চাই—কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে—দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ, সেই ব্রহ্মকে ত্যাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচিনে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যেদিকে ত্যাগ করব সেইদিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ— ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেননি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব বাইরের কর্ম্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব, কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না—কিম্বা একেবারে এর উল্টো কথাটাই বলি, এবং এই বলে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল একদিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি তাহলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখচি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য, সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভাল করে বিশ্বাসই করেনা। এতদূর পর্য্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলচে বিশ্বজগৎ কেবলি পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে, জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠচেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলচেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের এক দিকে ব্যাপ্তি আর একদিকে সমাপ্তি; একদিকে পরিণতি, আর একদিকে পরিপূর্ণতা; একদিকে ভাব আর একদিকে প্রকাশ—দুই একসঙ্গে, গান এবং গান গাওয়ার মত অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্চে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা, যে, গান কোন জায়গাতেই নেই কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে। কেননা, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখচি, কোনো সময়েইত সম্পূর্ণ গানটাকে একসঙ্গে দেখচিনে—কিন্তু তাই বলে কি এটা জানিনে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে?

এমনি করে কেবলমাত্র করে যাওয়া চলে যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্যজগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই; তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে এই পণ করে বসে আছে—তারা কেবলই করবে, কোথায় এসে থামবে না, এই তাদের জিদ্—জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না—সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানেনা।

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি।

শক্তির দিককে ব্যাপ্তির দিককে আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখ্‌ব তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখ্‌ব না এই আমাদের পণ। এই জন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনাপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থাণু হয়ে বসে আপনাকেই আপনি নিরীক্ষণ করতে চায়, আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধূলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও দুর্ব্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখিনি —আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে, তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ইতিহাস পুরাণ সমাজ সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক, আর কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁৎভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখিনে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের একদিকে নিয়ম, একদিকে আনন্দ। তার একদিকে ধ্বনিত হচ্চে ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, আর একদিকে ধ্বনিত হচ্চে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। একদিকে বন্ধনকে না মানলে অন্যদিকে মুক্তি পাবার জো নেই। ব্রহ্ম একদিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর একদিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনি মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতর? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বরতত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয় তখন সেই তারে গান বাজে, এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। একদিকে সে নিয়মের মধ্যে অবিচলিত ভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্যদিকে সে সঙ্গীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয়নি ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না—সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে পারলেই সে বদ্ধ থেকে এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বাণাতেও কর্ম্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুলতে পারি। কিন্তু তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে ব্যর্থতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা লাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বলছিলুম, কর্ম্মকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোল্‌বার সাধনাই হচ্চে সত্যের সাধনা, ধর্ম্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্চে—যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম্ম করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে—অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাকবে—অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মার গান, এই হচ্চে আত্মার মুক্তি। তখন কি আনন্দ যখন কর্ম্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে—কর্ম্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে—সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ,—তখন সংসারই ত আনন্দনিকেতন।

কর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে এ'কে কে অবজ্ঞা করতে চায়, সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানব মাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করচে কে মনে করে সেই সুবৃহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্ম্মের চরম সাধনা! ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনি শুনতে কি পাচ্চনা, ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জ্জনে আপনার কর্ম্মের বিজয় রথে—

চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্ব্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্চে; বনজঙ্গলের ঘনচ্ছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্য্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মত তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করচে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্চে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করচে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ করে ফেল্‌চে—তার চারদিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্ম্মের আনন্দলোক উদ্ঘাটিত হয়ে যাচ্চে। বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরতায় পথে মানবাত্মার এই যে বিজয় রথ অহোরাত্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বল্‌তে চাও তার কেউ সারথী নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্চেনা? এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথীর যথার্থ মিলন ঘটচে না? রথ চলেছে, শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্যোগও সেই সারথীর অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারচে না—মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুবদৃষ্টি প্রতিহত হচ্চে না;—আলোকে অন্ধকারে চলেছে রথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথীর—চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নাববার সময় মিলন, রথীর সঙ্গে সারথীর। ওরে কে সেই নিত্য মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়; তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চল্‌তে চায় না! কে বল্‌তে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিলব। কে বল্‌তে চায় এই সমস্তই মিথ্যে, এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্যবিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তরবাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা। যে লোক এ সমস্তকেই মিথ্যে বলে কত বড় মিথ্যে তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড় বৃহৎ সংসারকে এত বড় ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে! যে মনে করে যে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছিবে এমন সাধ্য তার আছে কি! তা নয়—ভীরু যে পালাতে যে চায় সে কোথাও তাঁকে পায় না—সাহস করে বলতে হবে এই যে তাঁকে পাচ্ছি, এই যে এখনি, এই যে এখানেই—বার বার বল্‌তে হবে আমার প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্চি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্চি; কর্ম্মের মধ্যে আমার যা কিছু বাধা, যা কিছু বেসুর; যা কিছু জড়তা, যা কিছু অব্যবস্থা সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসঙ্কোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্ম্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করচেন।

উপনিষদে "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেচেন? আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এব ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই এ কখনো হতেই পারে না—সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ, তিনি কর্ম্ম না হলে বাঁচবেন কি করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম্ম করতেই হবে যে কর্ম্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এই জন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ, এবং তিনি আত্মক্রীড়ঃ, তাঁর সকল কাজই হচ্চে পরমাত্মার মধ্যে; তাঁর খেলা, তাঁর স্নান আহার, তাঁর জীবিকা অর্জ্জন, তাঁর পরহিত সাধন সমস্তই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার, তিনি "ক্রিয়াবান," ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্ম্মে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলি কর্ম্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটবড় সকল কাজেই, সত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যের দ্বারা শৃঙ্খলার দ্বারা মঙ্গলের দ্বারা অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও ত আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করচেন—তিনি "বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।" তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করচেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন ত তিনি নিজেই। তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলি নানা আকারে দান করচেন। কাজ করচেন, তিনি কাজ করচেন—নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কি করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলি উৎসর্গ করচে, সেই ত তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ঐখানে—ঐখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তি যোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলি দান করতে হবে—বেদে তাঁকে "আত্মদা বলদা" বলেচে—তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্চেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্চেন যাতে করে আমরাও তাঁর মত আপনাকে দিতে পারি। সেই জন্যে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্চেন ঋষি তারই কাছে প্রার্থনা করচেন, সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজনটা মেটান, আমাদের সঙ্গে শুভবুদ্ধির যোগ সাধন করেন। অর্থাৎ শুধু এ হলে চলবে না যে, তাঁর শক্তিযোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন, আমাদের শুভবুদ্ধি দিন তাহলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব তাহলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভ বুদ্ধি হচ্চে সেই বুদ্ধি যাতে সকলের সার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের কর্ম্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভ-বুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম্ম কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম্ম নয়,—আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম্ম কিন্তু অভাব তাড়িতের কর্ম্ম নয়,—তখন আমাদের কর্ম্ম দশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্ত্তন নয়। তখন, যেমন আমরা দেখচি "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ" বিশ্বের সমস্ত কর্ম্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্চে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্চে তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি, তাই আমার সকল কর্ম্মই শান্তিময় কল্যাণময় আনন্দময়।

উপনিষৎ বলেন তাঁর "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ" তাঁর জ্ঞান, শক্তি এবং কর্ম্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমাশক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করচে—আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়; আনন্দ করতে যেদিন চাই সে আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেন না হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাইনে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই অগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তার্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়—আপনার সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাইনা। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিইনে বলে, দান করিনে বলে কর্ম্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদ, বিশ্বের কর্ম্মে তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা অগুনের মত তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মত তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক্, ফুলের গন্ধের মত তোমার মধ্যেই বিস্তার্ণ হতে থাক্। জীবনকে তার সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত ক্ষয় পূরণ, সমস্ত উত্থান পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালবাসতে পারি এমন বার্য্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণশক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিকে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই বলে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাচব, বীরের মত এ'কে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্ব্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্ম্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্ব্বত্র যেন তোমার জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করচে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে; যেখানেই জঙ্গাজঙ্গল গর্ত্তগাড়ীকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুল্‌চে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়চে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করচে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তের আনন্দ কেবলি কর্ম্মে রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করচে, সেখানে সে মহৎ সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্ব্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলি অভিশাপ দিচ্চে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্ম্মে মানুষের অনাস্থা সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্চে, সেই খানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ—সেইখানেই যত সঙ্কোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

হে বিশ্বকর্ম্মণ, আজ আমরা তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানাতে এসেচি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে

সন্ধান দিয়েছ—বিশ্ব সংসারে অসংখ্য জীবের চিত্তে দুঃখ-তাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমাসৃষ্টি চল্‌চে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে গৌরবান্বিত করেছ! সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবলবেগ বসন্তের উদ্দাম দক্ষিণ বাতাসের মত ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে আসুক, নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্ম্মরধ্বনিকে বহন করে—আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখাপল্লবকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক্—আমাদের অন্তরের নিদ্রোত্থিত শক্তি ফুলে ফলে কিশলয়ে অপর্য্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্যে কেঁদে উঠুক্! দেখতে দেখতে শতসহস্র কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহুতুলে আপনাকে এক-বার দিগ্বিদিকে ঘোষণা করুক্। মোহের আবরণকে উদ্‌ঘাটন কর, উদাসীনতার নিদ্রাকে অপসারিত করে দাও—এখনি এই মুহূর্ত্তে অনন্ত দেশকালে ধাবমান ঘূর্ণমান চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে তোমার নিত্যবিলাসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই, তারপরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম করে সংসারে মানবাত্মার সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে নানা দিক্ থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, দুঃখের ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্য্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করচে, যেখানে আমার নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোমহুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মত সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহা-নিক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিম্নলিখিত সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ললিত—আড়াঠেকা।

প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে
অলসরে ওরে জাগ জাগ।
শোনরে চিত্ত ভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে
অলসরে ওরে জাগ জাগ॥

বিভাস—কাওয়ালি।

ঘোর দুঃখে জাগিনু ঘন ঘোরা যামিনী
একেলা হায়রে, তোমার আশা হারায়ে।
ভোর হল নিশা, জাগে দশ দিশা,
আছি দ্বারে দাঁড়ায়ে
উদয় পথ পানে দুই বাহু বাড়ায়ে॥

ভৈরবী—একতালা।

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে,
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরাণ আমার পারিনে তাই পায়ে থুতে।
এত দিন ত ছিল না মোর কোনো ব্যথা,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা।
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়োনা গো দিয়োনা আর ধূলায় শুতে॥

রামকেলী—ঝাঁপতাল।

প্রভু, মুছাও আঁখিবারি,
কৃপাভিখারী তব দ্বারে।
ফিরায়োনা রেখোনা আর অন্ধ কারাগারে।
আজি আলোক-উৎসবে
একি অলোক সৌরভে
ভাসিল ধরা তব বিমল অমৃত রসধারে।
শ্যামল তৃণে পুষ্পবনে ফুটিল একি হাসি।
গগন জ্যোতিমগন হল তিমির ঘন নাশি।
এ অন্তরে শূন্য ঘরে
বিষাদ কেন কাঁদিয়া মরে,
আশার বাণী শুনাও, লহ আঁধার পরপারে॥

সরফর্দ্দা—একতালা।

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হয়েছে কি সাধ মিটায়ে তোমায় দেখি,
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব এ মোর নিবেদন।

ভৈরবী—কাহারবা।

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়ক বনে নয় বিজনে, নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।

গোপনে প্রেম রয় না ঘরে আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো ॥

ভৈরবী—তেওরা।

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানিহে জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরু পথে হারাল ধারা,
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

মিশ্র রামকেলী—দাদ্‌রা।

যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।
যদি আমার মনের মলিন কালী
মুছাও পুণ্য সলিল ঢালি
তোমার চন্দ্র সূর্য্য নূতন আলোয়
জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে।
আজো ফোটেনি মোর শোভার কুঁড়ি,
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি।
যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে
আমার হৃদয় জেগে উঠে
তবে মুখর হবে সকল আকাশ
আনন্দময় গানে রবে।

টোড়ি-ভৈরবী—কাহারবা।

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি ঐ যে বাহির পথে।
আয়রে ছুটে, টানতে হবে রসি,
ঘরের কোণে রইলি কেন বসি?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরে
ঠাঁই করে তুই নেরে কোনোমতে।

কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ
সে সব কথা ভুলতে হবে আজ।
টান্‌রে দিয়ে সকল চিত্ত কায়া,
টান্‌রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্‌রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বতে

ঐ যে চাকা ঘুরছেরে ঝঞ্ঝনি।
বুকের মাঝে শুনচকি সেই ধ্বনি!
রক্তে তোমার দুলচেনা কি প্রাণ,
গাইচে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যা বেগের মত
ছুটচে না কি বিপুল ভবিষ্যতে॥

একাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সায়ংকালের বক্তৃতা।

কয়েকদিন হল পল্লীগ্রামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম তোমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্বটি কি আমাকে বল্‌তে পার? একজন বল্লে, বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না। আর একজন বল্লে, "বলা যায় বৈ কি—কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমাদের এই ধর্ম্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন?" সে বল্লে, "যার পিপাসা হবে, সে গঙ্গার কাছে আপনি আস্‌বে।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তাই কি দেখ্‌তে পাচ্ছ? কেউ কি আসচে?" সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বল্লে "সবাই আস্‌বে! সবাইকে আস্‌তে হবে!"

আমি এই কথাভাব্‌লুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ ত মিথ্যা বলে নি। আস্‌চে সমস্ত মানুষই আস্‌চে! কেউ ত স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই ত সবাইকে চল্‌তে হচ্চে, আর যাবে কোথায়? আমরা প্রসন্নমনে হাস্‌তে পারি—পৃথিবী জুড়ে সবাই যাত্রা করেছে। আমরা কি মনে করচি সবাই কেবল নিজের উদর পূরণের অন্ন খুঁজচে, নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারদিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্চে? না, তা নয়। এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অন্নের জন্যে বস্ত্রের জন্যে, নিজের ছোট বড় কতশত দৈনিক আবশ্যকের জন্যে ছুটে বেড়াচ্চে—কিন্তু কেবল তার সেই আহ্নিক গতিতে নিজেকে প্রদক্ষিণ করা নয়—সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে জেনে এবং না জেনে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে মহাকাশে আর একটি কেন্দ্রের চারদিকে যাত্রা করে চলেছে—যে কেন্দ্রের সঙ্গে সে জ্যোতির্ম্ময় নাড়ির আকর্ষণে বিধৃত হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে সে আলোক পাচ্চে, যার সঙ্গে একটি অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য সূত্রে তার চিরদিনের মহাযোগ রয়েছে।

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কি সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন, এবং বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্চে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে—আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড় আপন, তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকেই বিশুদ্ধ করে প্রবল করে, পরিপূর্ণ করে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করচে! শিশুকাল থেকেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে শিক্ষিত ও সংযত করচে, এক একটি বড় বড় লক্ষ্যের চারদিকে সে আপনার ছোট ছোট সমস্ত বাসনাকে নিয়মিত করবার চেষ্টা করচে, এমন সকল আচার

অনুষ্ঠানের সে সৃষ্টি করচে যাতে তাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্চে যে, দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে তার সমাপ্তি নেই, সমাজ ব্যবহারের মধ্যেও তার অবসান নেই। সে এমন একটি বৃহৎ আপনাকে চাচ্চে যে আপনি তার বর্ত্তমানকে, তার চারদিককে, তার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোট নদীর ধারে এক সামান্য কুটীরে বসে এই আপনির খোঁজ করচে, এবং নিশ্চিন্ত হাস্যে বলচে, সবাইকেই আস্তে হবে এই আপনির খোঁজ করতে। কেন না, এ ত কোনো বিশেষ মতের, বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়, সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে, এ যে তারি ডাক। কলরবের ত অন্ত নেই—কত কল কারখানা, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, কত বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোলাহল আকাশকে মথিত করচে কিন্তু মানুষের ভিতর থেকে সেই সত্যের ডাককে কিছুতেই আচ্ছন্ন করতে পারচে না; মানুষের সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত অর্জ্জন বর্জ্জনের মাঝখানে সে রয়েছে; কত ভাষায় সে কথা কইচে, কত কালে কত দেশে কতরূপে কত ভাবে সমস্ত আশু প্রয়োজনের উপর সে জাগ্রত হয়ে আছে। কত তর্ক তাকে আঘাত করচে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করচে, কত বিকৃতি তাকে আক্রমণ করচে, কিন্তু সে বেঁচেই আছে—সে কেবলি বল্‌চে, তোমার আপনিকে পাও, আত্মানং বিদ্ধি।

এই আপনিকে মানুষ সহজে আপন করে তুল্‌তে পারচেনা, সেই জন্যে মানুষ সূত্রাচ্ছিন্ন মালার মত কেবলি খসে যাচ্চে, ধূলোয় ছড়িয়ে পড়চে। কিন্তু যে বিশ্বজগতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করচে সেই জগৎ ত মুহুর্মুহু এমন করে খসে পড়চে না, ছড়িয়ে পড়চে না।

অথচ এই জগৎটিত সহজ জিনিষ নয়। এর মধ্যে যে সকল বিরাট শক্তি কাজ করচে তাদের নিতান্ত নিরীহ বলা যায় না। আমাদের এতটুকু একটুখানি রাসয়নিক পরীক্ষাশালায় যখন সামান্য একটা টেবিলের উপর দু'চার কণা গ্যাসকে অল্প একটু বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের লীলা দেখ্‌তে যাই তখন শঙ্কিত হয়ে থাক্‌তে হয়, তাদের গলাগলি জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি যে কি অদ্ভুত এবং কি প্রচণ্ড তা দেখে বিস্মিত হই। বিশ্ব জুড়ে, আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত, এমন কত শত বাষ্প পদার্থ তাদের কত বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে কি কাণ্ড বাধিয়ে বেড়াচ্চে তা আমরা কল্পনা করতেও পারিনে। তার উপরে জগতের মূল শক্তিগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধ, আকর্ষণের উল্টো শক্তি বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুরাগের উল্টো শক্তি কেন্দ্রাতিগ। এই সমস্ত বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের প্রকাণ্ড লীলাভূমি এই যে জগৎ, এখানকার আলোতে আমরা অনায়াসে চোখ মেলচি, এখানকার বাতাসে অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্চি, এর জলে স্থলে অনায়াসে সঞ্চরণ করচি। যেমন আমাদের শরীরের ভিতরটাতে কত রকমের কত কি কাজ চল্‌চে তার ঠিকানা নেই কিন্তু আমরা সমস্তটাকে জড়িয়ে একটি অখণ্ড স্বাস্থ্যের মধ্যে এক করে জানচি—দেহটাকে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকযন্ত্র প্রভৃতির জোড়াতাড়া ব্যাপার বলে জানচিনে।

জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাত প্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ঙ্কর হোক্‌না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ জগৎটা আসলে যে কি তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই—এই সকল সূক্ষ্মতম মূল বস্তুর যোগবিয়োগেই জগৎ তৈরি হচ্চে। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই মূলবস্তুর দুর্গও আজ আর টেঁকে না। আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক এক পা এগচ্চে ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্চে,—সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠ্‌চে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যা একদিকে আমাদের ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর একদিকে নিতান্ত সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই হচ্চে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে শক্তিকে শক্তিরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জানতে হচ্চে না—আমরা তাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি,—জল স্থল তরু লতা পশু পক্ষী। জল মানে বাষ্পবিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়—জল মানে আমারই একটি আপন সামগ্রী; সে আমার চোখের জিনিষ, স্পর্শের জিনিষ; সে আমার স্নানের জিনিষ, পানের জিনিষ; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। বিশ্বজগৎ বল্‌তেও তাই;—স্বরূপত তার একটি বালুকণাও যে কি তা আমরা ধারণা করতে পারিনে—কিন্তু সম্বন্ধত সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন হয়ে ধরা দিয়েছে। এতই আপন হয়ে ধরা দিয়েছে, যে দুর্ব্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিন্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্ত মনে আপনার ধুলোখেলার ঘরের মত ব্যবহার করচে, কোথাও কিছু বাধ্‌চে না।

জড়-জগতে যেমন, মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কি তা কেমন করে বল্‌ব! পর্দ্দার উপর পর্দ্দা যতই তুলব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্ব্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব! সেই প্রাণ একদিকে যত বড় প্রকাণ্ড রহস্যই হোক্ না কেন, আর এক দিকে তাকে আমরা কি সহজেই বহন করচি—সে আমার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্ত্তে অগণ্য জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্চে, নূতন নূতন শাখা প্রশাখায় ক্রমাগতই দুর্ভেদ্য নির্জ্জনতাকে সজন করে তুল্‌চে—এই প্রাণের প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কতকাল ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে সূর্য্যালোকে উঠ্‌চে এবং সূর্য্যালোক থেকে অন্ধকারে নেবে পড়চে! এ কি তেজ, কি বেগ, কি নিশ্বাস, মানুষের মধ্যে আপনাকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত, নব নব বৈচিত্র্যে বিস্তীর্ণ করে দিচ্চে! যেখানে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে তার রহস্য চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত, সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই,—আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরন্তর গর্জ্জিত উন্মথিত হয়ে

উঠচে সেখানেও সে কেবল লেশমাত্র আমাদের গোচরে আছে, সমস্তটাকে একসঙ্গে আমরা দেখ্‌তে পাচ্চিনে। কিন্তু এখানেই সে আছে, এখনি সে আছে, আমার হয়ে আছে; তার সমস্ত অতীতকে আকর্ষণ করে', তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে বহন করে' সে আছে; সেই অদৃশ্য অথচ দৃশ্য, সেই এক অথচ বহু, সেই বদ্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট্ মানবপ্রাণ তার পৃথিবীজোড়া ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিশ্বাস প্রশ্বাস, শীত গ্রীষ্ম, হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন, শিরা-উপশিরার রক্তস্রোতের জোয়ার ভাঁটা নিয়ে দেশে দেশান্তরে বংশে বংশান্তরে বিরাজ করচে। এই অনির্ব্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও সদ্যোজাত শিশুর মধ্যেও আপন হ'য়ে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

তাই বল্‌ছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্রের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্ব্বচনীয় ক্রিয়া চল্‌চে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দিয়েছে, তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করচি তা নয়, তাদের ভালবাস্‌চি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাইনে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে ত এই রকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপ্‌নি, সেখানে সে এমন সহজে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুল্‌তে পারচে না। মানুষ আপনাকে এমন অখণ্ডভাবে সমগ্র করে' আপন করে লাভ কর্‌চে না। যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন, তাকে আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কি কঠিন হয়েছে।

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; তারি মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারচে না—চারিদিকে সে কেবল টুকরো টুকরো হয়ে ছিট্‌কে পড়চে। কিন্তু আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার—তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলি মনে হয় এটা পাইনি, ওটা পাইনি, ততক্ষণ যা কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেন না, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনো জিনিষকেই পাইনে; এমন কোনো আধার থাকে না, যার মধ্যে কোনো কিছুকে স্থিরভাবে ধরে রাখ্‌তে পারি। তখন আমরা বলি সবই মায়া—সবই ছায়ার মত চলে যাচ্চে মিলিয়ে যাচ্চে। কিন্তু আত্মাকে যখনি পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনি নিশ্চিত করে ধরতে পারি তখনি সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারিদিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাইনি তখন যা কিছু অসত্য ছিল, আপনাকে পাবামাত্রই সে সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে। আমার বাসনার কাছে প্রবৃত্তির কাছে যারা মরীচিকার মত ধরা দিচ্চে অথচ দিচ্চে না, কেবলি এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্চে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে; এই জন্য যে লোক আত্মাকে পেয়েছে, জলে স্থলে আকাশে তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ; কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধ্যে সমস্তকেই অমর সত্যরূপে পেয়েছে। সে কিছুকেই ছায়া বলে না, মায়া বলে না, কারণ জগতের সমস্ত পদার্থেরই সত্য ধরা দিয়েছে। সে নিজে সত্য হয়েছে, এই জন্য তার কাছে কোন সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্খলিত নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্চে আত্মবোধের, আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।

পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায়নি, প্রাণ পায়নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখ্‌তে পারত না—তখন তার সৌন্দর্য্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনি জগতের গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মাণিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেই রকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারিদিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাইনে কিছুই দিইনে; যখনি সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনি আমি সত্য যে কি তা জানি, তখনি আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোট বড় সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়—তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্ম্মের মধ্যেই একটি আত্মানন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে—তখনি আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুর আবর্ত্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান, তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এই আমার সকলের চেয়ে সত্য আপনাটিকে নিজের ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে—অসংখ্যের ভিড় ঠেলে টানাটানি কাটিয়ে এই আমার অত্যন্ত সহজ সমগ্রতাকে সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই অখণ্ড সামঞ্জস্যটি কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘটবে না, আমার ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠ্‌বে।

এই জন্যে মানুষের সামঞ্জস্য বিশ্বজগতের সামঞ্জস্যের মত সহজ নয়। মানুষের চেতনা আছে, বেদনা আছে বলেই নিজের ভিতরকার সমস্ত বিরুদ্ধতাকে সে একেবারে গোড়া থেকেই অনুভব করে—বেদনার পীড়ায় সেইগুলোই তার কাছে অত্যন্ত বড় হয়ে ওঠে—নিজের ভিতরকার এই সমস্ত বিরুদ্ধতার দুঃখ তার পক্ষে এত একান্ত যে, এতেই তার চিত্ত প্রতিহত হয়—কোনো একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে তার এই সকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখবেদনার একটি আনন্দপরিণাম আছে এটা সে সহজে দেখ্‌তে পায় না। আমরা একেবারে গোড়া থেকেই দেখ্‌তে পাচ্চি যাতেই আমার

সুখ তাতেই আমার মঙ্গল নয়, যাকে আমি মঙ্গল বলে জান্‌চি চারিদিক থেকে তার বাধা পাচ্চি, আমার শরীর যা দাবি করে আমার মনের দাবি সকল সময় তার সঙ্গে মেলে না, আমি একলা যা দাবি করি আমার সমাজের দাবির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে, আমার বর্ত্তমানের দাবি আমার ভবিষ্যতের দাবিকে অস্বীকার করতে চায়। অন্তরে বাহিরে এই সমস্ত দুঃসহ বাধাবিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্চে ;—অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্যশক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করচে ;—যাতে তার এই সমস্ত বিক্ষিপ্ততাকে মিলিয়ে এক করে দেবে সহজ করে দেবে তার প্রতি সে আপনার বিশ্বাসকে ও লক্ষ্যকে কেবলি স্থির রাখবার চেষ্টা করচে। মানুষ আপনার অন্তর বাহিরের এই প্রভূত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বৃহৎ ঐক্যসাধনের চেষ্টা প্রতিদিনই করচে,—সেই চেষ্টাই তার জ্ঞান-বিজ্ঞান সমাজ-সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, সেই চেষ্টাই তার ধর্ম্মকর্ম্ম পূজা-অর্চনা—সেই চেষ্টাই কেবল মানুষকে তার নিজের স্বভাব নিজের সত্য জানিয়ে দিচ্চে—সেই চেষ্টা খানিকটা সফল হচ্চে খানিকটা নিষ্ফল হচ্চে, বার বার ভাংচে বারবার গড়চে,—কিন্তু বারম্বার এই সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষ আপনার এই স্বাভাবিক ঐক্যচেষ্টার দ্বারাতেই আপনার ভিতরকার সেই এককে ক্রমশ সুস্পষ্ট করে দেখ্‌চে—এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপারেও সেই মহৎ একতার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠচে,—সেই এক যতই স্পষ্ট হচ্চে ততই মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে ভূমাকে আশ্রয় করচে।

তাই বল্‌ছিলুম, ঘুরে ফিরে মানুষ যা কিছু করচে—কখনো বা ভুল করে' কখনো বা ভুল ভেঙে—সমস্তর মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা। সে যাকেই চাক্ না সত্য করে চাচ্চে এই আপ্‌নাকে, জেনে চাচ্চে, না জেনে চাচ্চে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে বিরাট ভাবে একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে পেতে চাচ্চে। সে এক রকম করে বুঝতে পারচে কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়, নিরন্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে একটি বিশ্বসঙ্গীতকে প্রকাশ করবার জন্যেই বিরোধের সার্থকতা—সেই সঙ্গীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের ইতিহাসে মানুষ সেই তানটাকেই কেবল সাধচে, সুরের যতই স্খলন হোক্ তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্চে না। উপনিষদের বাণীর দ্বারা সে কেবলি বলচে "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" সেই এককে জান, সেই আত্মাকে। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ইহাই অমৃতের সেতু।

আপনার মধ্যে এই এককে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয়, যখন তার প্রবৃত্তি শান্ত হয় সংযত হয় তখন তার বুঝতে বাকি থাকে না এই তার এক কাকে খুঁজ্‌চে। তার প্রবৃত্তি খুঁজে মরে নানা বিষয়কে—কেন না নানা বিষয়কে নিয়েই সে বাঁচে, নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই তার সার্থকতা। কিন্তু যেটি হচ্চে মানুষের এক, মানুষের আপনি—সে স্বভাবতই একটি অসীম এককে, একটি অসীম আপনিকে খুঁজ্‌চে—আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তি লাভ করে। তাই উপনিষদ বলেন—"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করচেন—"তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ" তাঁকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে আপনার একের মধ্যে এক করে দেখেন, "তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং" তাঁদেরই সুখ নিত্য, আর কারো না।

আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা, এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তি তর্কের দৃষ্টি নয়। এ হচ্চে "দিবীব চক্ষুরাততং"—চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখ্‌তে পায় এ সেই রকম দেখা। আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্চে সে কোনো জিনিষকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেক্‌ট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মত করে দেখে না—সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখতে জানে। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে যায় তখন সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক করে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখতে পায়। সেই রকম করে সমগ্র করে দেখাই তার সহজ ধর্ম্ম। তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম আপনি। সেই পরম আপনিকে যদি আপন করেই না জানা যায়, তা হলে আর যেমন করেই জানা যাক্ তাঁকে জানাই হল না। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে না, ঠিক্ উল্টো।—জ্ঞান সহজেই তফাৎ করে জানে—আপন করে জানাবার শক্তি তার হাতে নেই।

উপনিষৎ বল্‌চেন—"এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা,"—এই দেবতা বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্ম্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করচেন—কিন্তু তিনিই মহাত্মা "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" মহান্ আপনরূপে পরম একরূপে সর্ব্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতৎ"—সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান—যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন "অমৃতাস্তে ভবন্তি" তাঁরাই অমৃত হন।

আমাদের চোখ যেমন একেবারে দেখে আমাদের হৃদয় তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে,—মধুরকে তার মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের জন্যে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম এককে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে অনন্তকালেও আমরা একতে পেতে পারিনে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্ত্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাই একেবারেই রসরূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর কিছুতে পাবার জো নেই—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আন-

অভয়ে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না।

এই সহজ বোধটি হচ্চে প্রকাশ—এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয়, জোড়া দেওয়া নয়—আলো যেমন একেবারে প্রকাশ হয় এ তেমনি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে তখন আলোর খোঁজে হাটে বাজারে ছুটতে হবে না, জ্ঞানীর দ্বারে ঘা মারতে হবে না—যা কিছু বাধা আছে সেইগুলো কেবল মোচন করতে হবে—দরজা খুলে দিতে হবে, তাহলেই আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে।

সেই জন্যেই এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা—আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও! মানুষের যা দুঃখ, সে অপ্রকাশের দুঃখ—যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনো তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্চেন না; তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে; এখনো তার মধ্যে বাধা বিরোধের সীমা নেই; এখনো সে আপনার প্রকৃতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারচে না, এখনো তার একভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্চে না, এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠচেনা; ভয় দুঃখ শোক অবসাদ অকৃতার্থতা এসে পড়চে, যা গিয়েছে তার জন্যে বেদনা, যা আসবে তার জন্য ভাবনা চিত্তকে মথিত করচে, আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌চে না; এই জন্যেই মানুষের প্রার্থনা;—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা কর। যেখানে সেই আবির আবির্ভাব সম্পূর্ণ নয় সেখানে প্রসন্নতা নেই; যে দেশে সেই আবির আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত সেই দেশ থেকে প্রসন্নতা চলে গেছে, যে গৃহে তাঁর আবির্ভাব প্রতিহত সেখানে ধন-ধান্য থাকিলেও শ্রী নেই, যে চিত্তে তাঁর প্রকাশ সমাচ্ছন্ন সে চিত্ত দীপ্তিহীন প্রতিষ্ঠাহীন, সে কেবল স্রোতের শৈবালের মত ভেসে বেড়াচ্চে। এই জন্যে যে কোনো প্রার্থনা নিয়েই মানুষ ঘুরে বেড়াক্ না কেন তার আসল প্রার্থনাটি হচ্চে, আবিরাবীর্ম্ম এধি, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক্। এই জন্যে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড় কান্না, পাপের কান্না; সে যে আপনারি সমস্তটাকে নিয়ে সেই পরম একের সুরে মেলাতে পারচে না, সেই অমিলের বেসুর সেই পাপ তাকে আঘাত করচে; মানুষের নানা ভাগ নানা দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্চে, তার একটা অংশ যখন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের আকার ধারণ করচে তখন সে নিজেকে সেই পরম একের শাসনে বিধৃত দেখতে পাচ্চে না, তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলচে মামাহিংসীঃ—আমাকে আর আঘাত কোরো না, আঘাত কোরো না, বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব, আমার সমস্ত পাপ দূর কর, তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও, তাহলেই আমায় আপনার মধ্যে আমার মিল হবে; সকলের মধ্যে আমার মিল হবে, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

মানুষের নানা জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, তাদের জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়, তাদের ইতিহাস বিচিত্র, তাদের সভ্যতা ভিন্ন রকমের কিন্তু যে জাতি যে রকম পরিণতিই পাক্‌না কেন সকলেই কোনো না কোনো আকারে আপনার চেয়ে বড় আপনাকে চাচ্চে। এমন একটি বড় যা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান করবে। যা সে পেয়েছে, যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্চে, যা তার কেনা বেচার সামগ্রী তা নিয়ে ত তাকে থাক্‌তেই হয়, সেই সঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখা শোনা খাওয়া পরার চেয়ে বেশি, যা নিজেকে অতিক্রম করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে দুঃসাধ্যের দিকে আহ্বান করে, যা তাকে ত্যাগ করতে বলে, যা তার পূজা গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাচ্চে, তাকেই আপনার সমস্ত সুখ দুঃখের চেয়ে বড় বলে স্বীকার করচে। কেন না মানুষ জান্‌চে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই দিকেই; তার প্রতিদিনের খাওয়া পরা আরাম বিরামের দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ দু হাত তুলে বল্‌চে, আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারচে যে, তার মনুষ্যত্ব তার প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে—তাকে মুক্ত করতে হবে, তাকে যুক্ত করতে হবে; সেই দিকে চেয়েই মানুষ একদিকে আপনার দীনতা আর একদিকে আপনার সুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চে এবং সেইদিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে—আবিরাবীর্ম্ম এধি, হে প্রকাশ তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও! প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ চায়—ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখ্‌তে চায়—তার পরম আপনকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ আর আহার বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের চেয়ে বেশি—এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণে, তার মনের মনে, এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।

মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কি সেটা তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্ব্বাঙ্গীনরূপে কোনো ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলি সুগম করে দিচ্চেন—সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে জাগাতে না পার্‌লেও তাঁরা মূল সুরটিকে কেবলি বিশুদ্ধ করে তুল্‌চেন—সেই সুরটি তাঁরা ধরিয়ে দিচ্চেন।

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের আপন সামগ্রী করে তোলেন। আমরা আকাশে সমুদ্রে পর্ব্বতে জ্যোতিষ্কলোকে, বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়ম-

তন্ত্রের মধ্যে, অসীমকে দেখি কিন্তু সেখানে আমরা অসীমকে আমার সমস্ত দিয়ে দেখ্‌তে পাইনে। মানুষের মধ্যে যখন অসীমের প্রকাশ দেখি তখন আমরা অসীমকে আমার সকল দিক দিয়েই দেখি, এবং যে দেখা সকলের চেয়ে অন্তরতম সেই দেখা দিয়ে দেখি। সেই দেখা হচ্চে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখতে পাওয়া। জগতের নিয়মের মধ্যে আমরা শক্তিকে দেখ্‌তে পাই—কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে দেখ্‌তে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়া আর কোথায় দেখ্‌ব? ভক্তের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে প্রকাশ করতে থাকে তখন যে অপরূপ পদার্থ দেখি জগতে সে আর কোথায় দেখ্‌তে পাব? অগ্নি, জল, বায়ু, সূর্য্য, তারা যত উজ্জ্বল যত প্রবল যত বৃহৎ হোক্ এই প্রকাশকে সে ত দেখাতে পারে না। তারা শক্তিকে দেখায় কিন্তু শক্তিকে দেখানর মধ্যে একটা বন্ধন একটা পরাভব আছে—তারা নিয়মকে রেখামাত্র লঙ্ঘন করতে পারে না—তারা যা' তাদের তাই হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই, কেন না তাদের লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। এমনতর জড়যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছার আনন্দ পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাকে আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন—এইখানে তাঁর থেকে তাকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন, সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেন না সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন—সেইখানেই সকলের চেয়ে বড় প্রকাশ—ইচ্ছার প্রকাশ প্রেমের প্রকাশ। সেখানে আমরা তাঁকে মানতেও পারি, না মানতেও পারি, সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি। সেখানে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করব, প্রীতির দ্বারা তাঁর প্রেমকে স্বীকার করব সেই একটি মস্ত অপেক্ষা, একটি মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্ব্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেন না, এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে।

এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য অন্যায় পাপমলিনতার অবকাশ ঘটেছে—কেন না, এইখান থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এইখানে মানুষ এতদূর পর্য্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাকৃতেন তবে এমনটি ঘট্‌তে পারত না—বস্তুত সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন—সে জায়গা তিনি মানুষকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা নয়—কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চল্‌তে শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন এও সেই রকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটুকুতে তিনি আছেন অথচ নেই। এই জন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করচি আঘাত পাচ্চি, ধূলায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠ্‌চে সেখানে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই, সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে—আবিরাবীর্ম্মএধি—হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক! বৈদিক ঋষির ভাষার এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চল্‌তে চল্‌তে শোনা যায়—এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষর বোধ হয় নি—সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সারি গান,—

"মাঝি, তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না!" তোমার হাল তুমি ধর, এই তোমার জায়গায় তুমি এস, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না! আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখ না—হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক!

এত বাধা বিরোধ এত অসত্য এত জড়তা এত পাপ কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। জড়জগতে তাঁর প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয়—কারণ, বাধা না হলে প্রকাশ হইতে পারে না;—জড়জগতে তাঁর নিয়মই তাঁর শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে প্রকাশ করে তুল্‌চে—এই নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্তজগতে যেখানে তাঁর প্রেমের মিলনকে তিনি প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের বাধাকে তিনি স্বীকার করেছেন, সে হচ্চে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। এই বাধার ভিতরে দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়—যখন ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ মিলে যায় তখন ভক্তের মধ্যে ভগবানের এমন একটি আবির্ভাব হয় যা আর কোথাও হতে পারে না।

এই জন্যই আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে কীর্ত্তন করেছে যা অন্য দেশে উচ্চারণ করতে লোকে সঙ্কোচ বোধ করে। যিনি আনন্দময়, আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ—তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে; এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয়—এখানে জোর খাটে না;—রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না! প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এই জন্যে ভক্ত যে দিন আপনার অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন দেয়, ইচ্ছা করে' আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয় সেই দিন মানুষের মধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্চেন। সেই জন্যেই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই তাঁর সৌন্দর্য্যের লিপি এসে পৌঁচচ্ছে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়চে—এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্চে। সেই প্রকাশ তিনি চ'চ্চেন, সেই জন্যেই আমাদের চিত্তও সকল বিস্মৃতি সকল অসাড়তার মধ্যেও গভীরতর ভাবে সেই প্রকাশকে চাচ্চে—বলচে আবিরাবীর্ম্মএধি!

আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রের এই স্পর্দ্ধার কথা, অর্থাৎ অনন্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা, আজ কাল অন্য দেশের অন্য ভাবাতেও আভাস দিচ্চে। সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই কথাই দেখ্‌লুম—তিনি ভগবানকে ডেকে বলচেন—

Thou hast need of thy meanest creature ;
thou hast need of what once was thine
The thirst that consumes my spirit
is the thirst of thy heart for mine.

তিনি বল্‌চেন, তোমার দীনতম জীবটিকেও তোমার প্রয়োজন আছে; সে যে একদিন তোমাতেই ছিল, আবার তুমি তাকে তোমারই করে নিতে চাও; আমার চিত্তকে যে তৃষায় দগ্ধ করচে—সে যে তোমারই তৃষা, আমার জন্যে তোমার হৃদয়ের তৃষা।

পশ্চিম হিন্দুস্থানের পুরাকালের এক সাধক কবি—তাঁর নাম জ্ঞানদাস বঘেলি—তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন—আমার এক বন্ধু তার বাংলা অনুবাদ করেছেন—

অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়
বহ প্রভু অসীম ভাষায়,
(তাই দীননাথ) আমি ক্ষুধিত আমি তৃষিত
তাইতো আমি দীন।

আমার জন্যে তাঁরই যে তৃষা, তাই তাঁর জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্চে। তাঁর অসীম তৃষাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করচেন—সেই ভাষাই ত উষার আলোকে নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার ত আর কোনোই কাজ নেই সে ত কেবলি হৃদয়ের প্রতি হৃদয়-মহাসমুদ্রের ডাক। সে কবি বলরাম দাসের ভাষায় বল্‌চে—"তোমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির" —তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে—সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এস, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এস—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূর্ণ হোক!—এই একটি বিরহবেদনা অনন্তের মধ্যে রয়েছে, সেই জন্যেই আমার মধ্যেও আছে।

I have come from thee—why I know not ;
but thou art, O God ! what thou art ;
And the round of enternal being is the
pulse of thy beating heart.

আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি, কেন যে তা জানিনে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ; এই যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগযুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা এই হচ্চে তোমার অসীম হৃদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন।

অনন্তের মধ্যে এই যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বকাব্যকে রচনা করে তুল্‌চে—কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বল্‌চেন এই বেদনা তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ করব—এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার; তাই কবি বল্‌চেন, আমি যে দুঃখ পাচ্চি তাতে তুমি লজ্জা কোরো না, প্রভু!

প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাছে লাজ কি স্বামী!
তোমার সকল ব্যথার ব্যথী আমার
কোরো নিশিদিন!
নিদ্রা নাহি চক্ষে তব,
আমিই কেন ঘুমিয়ে রব!
বিশ্ব তোমার বিরাট দেহ
আমিও বিশ্বে লীন।

ভোগের সুখ ত আমি চাইনে—যারা দাসী তাদের সেই সুখের বেতন দিয়ো,—আমি যে তোমার পত্নী—আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার তোমার সঙ্গে বহন করব; সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই দুঃখকে উত্তীর্ণ হব—আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে। সেই জন্যেই, আমি বল্‌চিনে আমাকে সুখ দাও—আমি বল্‌চি, আবিরাবীর্ম্মএধি—হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও!

আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী,
ভোগের দাসী নহি।
আমার কাছে লাজ কি স্বামী
নিষ্কপটে কহি।
আমায় প্রভু দেখাইয়োনা
সুখের প্রলোভন,
তোমার সাথে দুঃখ বহি
সেই ত পরম ধন।
ভোগের দাসী তোমার নহি
তাই ত ভুলাও নাকো,
মিথ্যা সুখে মিথ্যা মানে
দূরে ফেলাও নাকো।
পতিব্রতা সতী আমি
তাই ত তোমার ঘরে
হে ভিখারী, সব দারিদ্র্য
আমার সেবা করে!
সুখের ভৃত্য নই তব, তাই
পাইনা সুখের দান,—
আমি তোমার প্রেমের পত্নী
এই ত আমার মান॥

মানুষ যখন প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে চাবার জন্যে সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে সুখকে সুখই বলে না—তখন সে বলে "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং" যা ভূমা তাই সুখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায়—তখন আর আরামকে চাইলে চলবে না, স্বার্থকে চাইলে চলবে না, তখন আর কোণে লুকোবার জো নেই তখন কেবল আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না—তখন নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, তখন কর্ম্মের আর অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই—তখন ভক্ত বিশ্ববোধের মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে।

ভক্তের জীবনের মধ্যে যখন সেই প্রকাশকে আমরা দেখি তখন কি দেখি? দেখি, সে তর্কবিতর্ক নয়, সে তত্ত্বজ্ঞানের টীকাভাষ্য বাদপ্রতিবাদ নয়—সে বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়—সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় যাবার দরকার হয় না—সেও তেমনি; ভক্তের সমস্ত জীবনটিকে এক করে মিলিয়ে নিয়ে অসীম সেখানে একেবারে সহজরূপে দেখা দেন। তখন ভক্তের জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আর বিরুদ্ধতা দেখতে পাইনে—তার আগাগোড়াই সেই একের মধ্যে সুন্দর হয়ে মহৎ হয়ে শক্তিশালী হয়ে

মেলে। জ্ঞান মেলে, ভক্তি মেলে, কর্ম্ম মেলে; বাহির মেলে, অন্তর মেলে; কেবল যে সুখ মেলে তা নয়, দুঃখও মেলে; কেবল যে জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে; কেবল যে বন্ধু মেলে তা নয়, শত্রুও মেলে; সমস্তই আনন্দে মিলে যায়; রাগিণীতে মিলে ওঠে; তখন জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা সুডোল হয়ে নিটোল অবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই অনির্ব্বচনীয় রূপ হচ্চে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপে সুখ এবং দুঃখ দুই-ই সুন্দর, ত্যাগ এবং ভোগ দুই-ই পবিত্র, ক্ষতি এবং লাভ দুই-ই সার্থক;—এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলির আঘাতের মত, মধুর সুরে বাজতে থাকে;—এই প্রেমের মৃদুতাও যেমন সুকুমার, বীরত্বও তেমনি সুকঠিন; এই প্রেমে, দূরকে এবং নিকটকে, আত্মীয়কে এবং পরকে, জীবন-সমুদ্রের এপারকে এবং ওপারকে প্রবল মাধুর্য্যে এক করে দিয়ে, দিগদিগন্তরের ব্যবধানকে আপন বিপুল সুন্দর হাস্যের ছটায় পরাভূত করে দিয়ে ঊষার মত উদিত হয়; অসীম তখন মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে, তার মনের মানুষ হয়ে;—তখন অসীমে সসীমে যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ কেবলি অমৃতে ভরে ভরে উঠতে থাকে, সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে মিলনের পারিজাত আপনার পাপড়ি একটির পর একটি ক'রে বিকশিত করতে থাকে—তখন জগতের সকল প্রকাশ, সকল আকাশের সকল তারা, সকল ঋতুর সকল ফুল, সেই প্রকাশের উৎসবে বাঁশি বাজাবার জন্যে ছুটে আসে,—তখন হে রুদ্র, হে চিরদিনের পরম দুঃখ, হে চিরজীবনের বিচ্ছেদবেদনা, তোমার এ কী মূর্ত্তি! এ কী দক্ষিণং মুখং! তখন তুমি নিত্য পরিত্রাণ করচ, সসীমতার নিত্য দুঃখ হতে নিত্য বিচ্ছেদ হতে তুমি নিত্যই পরিত্রাণ করে চলেছ এই গূঢ় কথা আর গোপন থাকে না! তখন ভক্তের উদ্‌ঘাটিত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে মানব-লোকে তোমার সিংহদ্বার খুলে যায়—ছুটে আসে সমস্ত বালক বৃদ্ধ—যারা মূঢ় তারাও বাধা পায় না—যারা পতিত তারাও নিমন্ত্রণ পায়—লোকাচারের কৃত্রিম শাস্ত্রবিধি টলমল্ করতে থাকে এবং শ্রেণীভেদের নিষ্ঠুর পাষাণ-প্রাচীর করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে। তোমার বিশ্বজগৎ আকাশে এই কথাটা বলে বেড়াচ্চে যে, "আমি তোমার", এই কথা বলে' সে নতশিরে তোমার নিয়ম পালন করে চল্‌চে—মানুষ তার চেয়ে ঢের বড় কথা বলবার জন্য অনন্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—সে বল্‌তে চায় "তুমি আমার";—কেবল তোমার মধ্যে আমার স্থান তা নয়, আমার মধ্যেও তোমার স্থান; তুমি আমার প্রেমিক, আমি তোমার প্রেমিক;—আমার ইচ্ছায় আমি তোমার ইচ্ছাকে স্থান দেব, আমার আনন্দে আমি তোমার আনন্দকে গ্রহণ করব এই জন্যেই আমার এত দুঃখ, এত বেদনা, এত আয়োজন; এ দুঃখ তোমার জগতে আর কারো নেই; নিজের অন্তর বাহিরের সঙ্গে দিনরাত্রি লড়াই করতে করতে এ কথা আর কেউ বল্‌চে না আবিরাবীর্ম্ম এধি—তোমার বিচ্ছেদবেদনা বহন করে জগতে আর কেউ এমন করে কাঁদ্‌চেনা যে, মামাহিংসীঃ; তোমার পশু পক্ষীরা বল্‌চে আমার ক্ষুধা দূর কর, আমার শীত দূর কর, আমার তাপ দূর কর; আমরাই বলচি—বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—আমার সমস্ত পাপ দূর কর। কেন বলচি? নইলে, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হয় না। সেই মিলন না হওয়ার যে দুঃখ সে দুঃখ কেবল আমার নয়, সে দুঃখ অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই জন্যে, মানুষ যে দিকেই ঘুরুক্ যাই করুক্ তার সকল চেষ্টার মধ্যেই সে চিরদিন এই সাধনার মন্ত্রটি বহন করে নিয়ে চলেছে, আবিরাবীর্ম্ম এধি, এ তার কিছুতেই ভোলবার নয়—আরাম ঐশ্বর্য্যের পুষ্পশয্যার মধ্যে শুয়েও সে ভুল্‌তে পারে না, দুঃখ যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েও সে ভুল্‌তে পারে না। প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি আমার হও, আমার সমস্তকে অধিকার করে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত সুখ দুঃখের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত পাপকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে তুমি আমার হও,—সমস্ত অসংখ্য লোকলোকান্তর যুগযুগান্তরের উপরে নিস্তব্ধ বিরাজমান যে পরম এক তুমি, সেই মহা এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও, সেই এক তুমি পিতানোসি, আমার পিতা, সেই এক তুমি পিতা নো বোধি, আমার বোধের মধ্যে আমার পিতা হও, আমার প্রবৃত্তির মধ্যে প্রভু হও, আমার প্রেমের মধ্যে প্রিয়তম হও, এই প্রার্থনা জানবার যে গৌরব মানুষ আপনার অন্তরাত্মার মধ্যে বহন করেছে, এই প্রার্থনা সফল করবার যে গৌরব আপন ভক্ত-পরম্পরার মধ্য দিয়ে কত কাল হতে লাভ করে এসেছে—মানুষের সেই শ্রেষ্ঠতম, গভীরতম চিরন্তন গৌরবের উৎসব আজ এই সন্ধ্যাবেলায়, এই লোকালয়ের প্রান্তে, অদ্যকার পৃথিবীর নানা জন্মমৃত্যু, হাসিকান্না, কাজকর্ম্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনটিতে;—মানুষের সেই গৌরবের আনন্দধ্বনিকে আলোকে, সঙ্গীতে, পুষ্পমালায়, স্তবগানে উদ্‌ঘোষিত করবার এই উৎসব বিশ্বের মধ্যে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, মানুষের ইতিহাসে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং এই কথা জান্‌তে এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি—তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা নয়—আনন্দের দ্বারা—শিশু যেমন সহজবোধে তার পিতামাতাকে জানে এবং জানায় সেই রকম পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের দ্বারা। হে উৎসবের অধিদেবতা, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই উৎসবকে সফল কর, এই উৎসবের মধ্যে, হে আবিঃ, তুমি আবির্ভূত হও, আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্তাকাশে তোমার দক্ষিণমুখ প্রকাশিত হোক্, প্রতি দিন আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জেনে যে দুঃখ পেয়েছি, সেই বোধ হতে সেই দুঃখ হতে এখনি আমাদের পরিত্রাণ কর—সমস্ত লোভ ক্ষোভের ঊর্দ্ধে ভূমার মধ্যে 'আত্মাকে উপলব্ধি করে' বিশ্বমানবের বিরাট্ সাধনমন্দিরে আজ এখনি তোমাকে নত হয়ে নমস্কার করি—নমস্তেঽস্তু—তোমাতে আমাদের নমস্কার সত্য হোক্, নমস্কার সত্য হোক্!

নিম্নলিখিত সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সোহিনী—সুরফাঁক্তা।

প্রথম আদি তব শক্তি
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে।
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে।
তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরয চন্দ্র তারা
প্রাণ তরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদি কবি, কবি গুরু তুমি হে
মন্ত্র তোমার মন্ত্রিত সব ভুবনে॥

গোঁড়—ঝাঁপতাল।

হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা
হে বলদাতা মহাকালরথসারথি।
তব নাম জপমালা গাঁথে রবি শশী তারা
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবা রাতি॥

কেদারা—কাওয়ালী।

ডাকে বার বার ডাকে
শোনরে দুয়ারে দুয়ারে
আঁধারে আলোকে।
কত সুখ দুঃখ শোকে—
কত মরণে জীবনলোকে
ডাকে বজ্রভয়ঙ্কর রবে,
সুধা সঙ্গীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে॥

হাম্বীর—একতালা।

জাগ নির্ম্মল নেত্রে রাত্রির পর পারে,
জাগ অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে।
জাগ ভক্তির তীর্থে পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগ উন্মুখ চিত্তে জাগ অম্লান প্রাণে,
জাগ নন্দন নৃত্যে সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগ স্বার্থের প্রান্তে প্রেম মন্দির দ্বারে।
জাগ উজ্জ্বল পুণ্যে জাগ নিশ্চল আশে,
জাগ নিঃসীম শূন্যে পূর্ণের বাহু পাশে।
জাগ নির্ভয় ধামে, জাগ সংগ্রাম সাজে,
জাগ ব্রহ্মের নামে জাগ কল্যাণ কাজে,
জাগ দুর্গমযাত্রী দুঃখের অভিসারে,
জাগ স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দির দ্বারে॥

কামোদ—একতালা।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে;
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল;
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।
পূজাগৌরব পুণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশী সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙা মন্দির দ্বারে॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে
জীর্ণ ভবনে শূন্য জীবনে;
হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে।
গহন আঁধার কবে পুলকে পূর্ণ হবে
ওহে আনন্দময় তোমার বীণা রবে,
পশিবে পরাণে তব সুগন্ধ বসন্ত পবনে॥

ইমন কল্যাণ—একতালা।

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান॥
আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান॥
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টি খানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্রতর বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান॥

কেদারা—একতালা।

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চির পথের সঙ্গী আমার চির জীবন হে॥
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার জীবন মরণ হে॥
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার,
অন্ত বিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে॥

ছায়ানট—একতালা।

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥

কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥
তোমায় আমায় মিলন হয়ে সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে
তোমার আলোর নাই ত ছায়া আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥

মিশ্র জয়জয়ন্তী—দাদ্‌রা।

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে॥
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা
আমার হিয়ায় চলচে রসের খেলা
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে॥
তাই ত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরচ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।
তাইত প্রভু যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করিনে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু'হাত ধরিনে॥
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে যেথায় এলে নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে॥
ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাইনা যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ করে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরিনে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াইনেত তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনে॥

বাউলের সুর—দাদ্‌রা।

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে?
সোনার ঘটে সূর্য্য তারা নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।

যেথায় তুমি বস দানের আসনে
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে?
নিত্য নূতন রসে ঢেলে আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে—
সেথা কি ডাক পড়বেনা গো জীবনে॥

কীর্ত্তনের সুর—ঠুংরী।

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখোনা ঢাকি
এসেছি তোমারে হে নাথ পরাতে রাখি॥
যদি বাঁধি তোমার হাতে প'ড়ব বাঁধা সবার সাথে
যেখানে যে আছে কেহই রবে না বাকি॥
আজি যেন ভেদ নাহি রয় আপন পরে
তোমায় যেন এক দেখিহে বাহিরে ঘরে।
তোমা সাথে যে বিচ্ছেদে ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই তোমারে ডাকি॥

নানাকথা।

বাবরের কবিতা।—মোগল বাদসাহ বাবরের রচিত কবিতা পুস্তক আছে। উক্ত হস্তলিখিত পুস্তক খানি রামনগরের নবাবের সম্পত্তি। এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে উক্ত কবিতাগুলি প্রকাশিত হইতেছে। বাবরের প্রকৃত নাম উচ্চারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কাহারও কাহারও মতে তাঁহার নামের প্রকৃত উচ্চারণ বাবুর (Babur)। উক্ত হস্তলিপির আদ্যোপান্ত না হউক কোন কোন অংশে বাবরের নিজের হস্তাক্ষর রহিয়াছে। উক্ত হস্তলিপির প্রতি পত্রের ফোটো উক্ত পত্রিকায় স্থান পাইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষদিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ শুক্রবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায়, সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার পরে মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।